অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অনুবাদ করেছেন

সি গ্‌ নে ট প্রে স

কলিকাতা
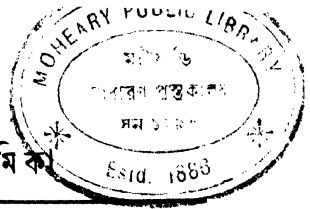
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

লিখি—নয়, কেন লিখবো এই প্রশ্ন এক দিন নাড়া দিয়েছিলো কে, তার লেখকসমাজকে। আমি লিখি, কেননা আমি বলতে জানাতে চাই। আমি যেমন করে দেখি তেমন করে চাই দেখাতে, করে বুঝি তেমন করে চাই বোঝাতে, যেমন করে অনুভব করি করে আমি ছাড়া আর কে অনুভব করলো। আমার হাসি-কান্নায়, মিলনে-বিরহে, আমার আশা-নিরাশায় খুঁজে বেড়াও তোমার কান্নার, তোমার মিলন-বিরহের, তোমার আশা-নিরাশার প্রতি- আমার চোখে দেখ পৃথিবীকে, আমার রক্তে আস্বাদ করো তার নর উত্তাপ, আমার অশ্রুতে জীবনের তিক্ততা।

প্রশ্ন উঠলো, আমি কে? আমি কি সমাজের বাইরেকার কেউ? কি একা? অসম্পৃক্ত? আমাকে খেতে দিচ্ছে কে? আমার অন্নের পূর্ণতার মাঝে কি চাষার ক্ষুধার স্বাদ নেই? আমাকে পরতে দিচ্ছে কে? আমার কাপড়ের সুতোয় স্পর্শ করবো না কি শ্রমিকের রিক্ততা? কে আমাকে জোগাচ্ছে আরাম, অবকাশ, অব্যাহতি? সুদূর শৃংখলে কার সঙ্গে আমি জড়িত, গ্রথিত, আবেষ্টিত? যারা সারা দিন আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা কাঁধে করে ধরে আছে সমাজের পায়া, তাদেরকে রাখবো দূরে ঠেলে, অপাঙক্তেয় করে? জানবো না তাদের, টানবো না তাদের? পালিয়ে বেড়াবো তাদের থেকে? জানি না চিনি না এই অবমাননাকর ওজুহাত দেখিয়ে সরে পড়বো পাশ কাটিয়ে? উপর তলায় দাঁড়িয়ে নিচেকার রাস্তায় জীবনের জনস্রোত দেখবো? শুধু নিজের কথাই বলবো, এক ছেড়ে দশের কথা বলবো না, দেশের কথা? মনে-মনে গর্ব করবো আমার আনন্দটাই বড়ো, আমার দুঃখটাই মহান, আমার

ব্যর্থতাটাই দেখবার মতো ? আর, আমার ধারে পারে যে সব দমিত নমিত অবমানিত জীবন ভিড় করে আছে. মূক ও মূর্খ, লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত, তাদের সুখটা স্থূল, দুঃখটা নির্বোধ ও ব্যর্থতাটা অকিঞ্চিৎকর, রোমাঞ্চ-হীন ? পিপাসায় জলই যখন খাওয়াতে হবে তখন মাটির খুরিতে না খাইয়ে সোনার গেলাসে খাওয়ালে দোষ কী ! এই কি আমার যুক্তি ?

না। রাশিয়া প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো : না। খুরি-গেলাসের কথা পরে হবে, দেখ এ সত্যি জল কিনা, সুস্থ ও সবল জল, না, এ মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক নোনতা-নোনতা ঘোল, ফিকে আর ফাঁকি। জলের রূপ বা স্বাদ দেখে দরকার নেই, তা-ঘোলা কি কাদাটে, তার পিপাসাহরণের গুণ থাকলেই সে জল, আমার, তোমার, সকলের।

স্পষ্টাস্পষ্টি বললো রাশিয়া, তুমি সমাজের লোক, বলতে হবে তোমাকে সমাজের কথা, সকলের কথা। দেখতে হবে, দেখাতে হবে তোমাকে নিজের চোখ দিয়ে নয়, সকলের চোখ দিয়ে। আগে ছিলো তোমার একটিমাত্র দিক, তোমার নিজের দিক, এখন তোমার দশ দিক, দশের দিক। উকিল যেমন তার মক্কেলের কথাই বলে নিজের ভাষায়, তেমনি তোমার প্রতিভাকে যে প্রতিনিধি করেছে সেই সমাজের কথাই তোমার সওয়ালের কথা। কখনোই তুমি একার জন্যে নও, তেমনি, মনে রেখো, তোমার সাহিত্যও সকলের জন্যে, সকলের নিয়োজনে। তোমাকে জানতে হবে যা-কিছু তুচ্ছ, ত্যক্ত ও তিক্ত, তোমাকে টানতে হবে, টেনে তুলতে হবে যা কিছু ভগ্ন, রুগ্ন ও পঙ্গু। জীবনের যা তুমি ব্যাখ্যা করবে তা সমাজের পক্ষ থেকে। চলবে না আর তোমার নিরপেক্ষতার কৌলীন্য। গায়ে গা লাগাতে হবে, দলে-দঙ্গলে ভিড়তে হবে, বেরুতে হবে জলে-জঙ্গলে। তোমার যা বাণী তা সমাজতন্ত্রের বাণী। তোমার ব্যক্তিত্ববোধের বদলে চাই এখন সামাজিকত্বের চৈতন্য।

আরো বললে রাশিয়া। বললে, তোমার কাজের শেষ লেখাতে নয়,

শেখাতে। তোমার কলম হচ্ছে অস্ত্র, প্রহরণ। শুধু তোমার কল্পনা চুলকোবার জন্যে নয়, খোঁচা মেরে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে। কাটতে হবে তোমাকে খাল, খুঁড়তে হবে তোমাকে খনি। তোমার জীবনে যেমন উদ্দেশ্য আছে, তেমনি সাহিত্যেও থাকবে সেই উদ্দেশ্য। সূর্য শুধু অন্ধকারের উচ্ছেদ করে না, আনে প্রাণস্রোত, শ্যামল সমুচ্ছ্বাস। শুধু দগ্ধ করে না, পূর্ণ করে। তাই সাহিত্যকে লাগাতে হবে শোভনের কাজে নয়, গঠনের কাজে, অঘটন-প্রকটনের কাজে, বিকাশে-বিলাসে নয়, স্থাপনে বিন্যাসে, একচ্ছত্র সমাজতন্ত্রের প্রচারে-প্রসারে। সাহিত্যকে হতে হবে সজ্ঞান, সত্যসন্ধ। উদ্দেশ্যপ্রেরিত।

রাশিয়ার পঞ্চবর্ষ কল্পনায় সাহিত্যের এই হলো সংজ্ঞানির্ধার। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে রাশিয়ার সাহিত্যে তুমুল তোলপাড় হয়ে গেলো। তৈরি হলো জনগণের সাহিত্য, শ্রমজীবীর সাহিত্য—সমাজ-তান্ত্রিকতার জয়গান। পঞ্চবর্ষ কল্পনায় বেরুলো বোরিস পিলনিয়াকের "কাস্পিয়ানগামিনী ভলগা", লেওনফের "সট", মিকায়েল সোলোখফের "ভাঙামাটি", ভ্যালেনটিন কাতাইফের "হে সময় অগ্রগামী।" পিলনিয়াকের বই নদীর উপরে বিরাট এক বাঁধ তৈরির ইতিহাস, লেওনফের বইয়ে বিরাট এক কাগজের কলের কাহিনী, সোলোখফের বইয়ে চাষাদের একীভবনের ইতিহাস, হাল কসাক-রাশিয়ার খুঁটিনাটি হুবহু বিবরণ, কাতাইয়েফের বইয়ে কয়লা ও কেমিকেল কারখানার কোলাহল—জেমস জয়সের "ইউলিসিসের" মতো চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা—শুধু তৈরি করার, গেঁথে তোলার, বৃত্ত পূর্ণ করার বৃত্তান্ত।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা—এই হলো সোভিয়েট সাহিত্যের সুর। সম্পত্তির পৃথিবীকে ধ্বংস করে নিঃস্বত্ব একত্বের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। আর মনোবিকলন নয়, নয় শুধু কলানুশীলন, ছক-কাটা জ্যামিতিক প্লট, চাই এখন জনস্রোত, জীবনস্রোত, বিরাট নির্মাণশালায় অসংখ্যেয় কর্মীর সম্মিলন, প্রাণবান

চিন্তার সঙ্গে স্ফূর্তিমান কর্মের সংঘট্ট।

তার পরে দেখতে পাই ব্রুনো ইয়াসেনস্কির "চামড়া-বদলানো মানুষ"। ইয়াসেনস্কি একজন পোল-জার্মান কমিউনিস্ট, রাশিয়া-প্রবাসী। ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক কি করে বুর্জোয়া থেকে কমিউনিস্ট হলো, নাম দেখেই বোঝা যায়, এ বইয়ে তারই গল্প। আভডেয়ানকো-র "ভালোবাসি" এক শ্রমিকের আনন্দবর্ণনা, তার কাজকে তার জীবনকে সে কী অখণ্ড ভালোবাসে তারই সোভিয়েট উল্লাস। জোস্‌চেনকোর "এক জীবনের গল্প" ও পগোডিনের "অভিজাত-মণ্ডলী" খাঁটি সোভিয়েট। দু' জনেরই বিষয় হচ্ছে শ্বেতসাগরের উপর খাল কাটার কাহিনী, স্টালিন-খাল, কি করে হেয়তম অপরাধীরাও সেই কাজে লেগে কাজের আনন্দে নবজীবন পাচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে তাদের পাপের ভার, অতীতের বোঝা। পগোডিনের নায়ক হচ্ছে এক দুর্দান্ত গুণ্ডা, জোস্‌চেনকোর নায়ক এক সামান্য সাধারণ কয়েদী। এই নব জীবনের স্বীকৃতিই হচ্ছে সোভিয়েট সাহিত্যের মূলমন্ত্র। শুধু কল-কারখানা নয়, জীবনায়ন, জন্মান্তরীণতা।

যারা পারেনি সুরে সুর মেলাতে রাশিয়া তাদেরকে ক্ষমা করেনি। তাদের রচনা শুধু ব্যর্থ ভাবেনি, ক্ষতিকর ভেবেছে। যেমন জামিয়াটিনের "আমরা"। এইচ. জি. ওয়েলসের বৈজ্ঞানিক রোমাঞ্চের ধরনে লেখা, এর সঙ্গে মিল আছে বা আলডুস হাক্সলির "ব্রেভ নিউ ওআর্লড্" যদিও হাক্সলির বইর দশ বছর আগে বেরিয়েছে "আমরা"। "আমরা"-তে ষড়বিংশ শতাব্দীর কাল্পনিক জগৎ বা একরাষ্ট্রের মহিমা-কীর্তন—কোথাও যেন বা প্রচ্ছন্ন-প্রখর বিদ্রূপ। সবাই পরছে এক পোশাক, নীল-ধূসর কুর্তা (তখনো রঙিন শার্ট পরার রেওয়াজ হয়নি) কারুর নাম নেই, নম্বর দিয়ে নিদর্শন—নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম, নির্দিষ্ট সময়ে প্রেম। এ বইয়ের শুধু প্রচার নয়, প্রকাশ পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে

াশিয়ায়, পাওয়া যায় শুধু তার ইংরাজি আর ফরাসি অনুবাদ। তুই ম্বর, পিলনিয়াকের "মেহোগেনি" (১৯২৯, বার্লিন)। এ বইয়ে সে বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিলো আর এই ভাবালুতার জন্যেই বই নিষিদ্ধ হলো াশিয়ায়। এবং তারি ক্ষতিপূরণ করবার জন্যে, বিপ্লবের দীক্ষা নিয়ে, লিখলো সে "কাস্পিয়ানগামিনী ভলগা"। তিন নম্বর, নিষিদ্ধ হলো বুদান্‌সেফের "মনোবেদনা"। অপরাধ, লেখক রাজনীতি ম্বন্ধে উদাসীন, নিরপেক্ষ। লেখক একাকী থাকতে পারবে না, তাকে দল নিতে হবে। বুদান্‌সেফের বিষয় সেই চিরন্তন বিষয়, যুগোপযোগী নয়, সেই কারণেই ঠাঁই হলো না তার। তার বইর নায়ক একজন যুবক বৈজ্ঞানিক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করলো। হয়ে পড়লো গম্ভীর, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। জীবনের কী অর্থ বা আগাগোড়াই সে নিরর্থক কিনা এই চিন্তায় সে আমগ্ন। এই জীবন-মৃত্যুর ধূসর সমস্যায় তুলছে সেই বৈজ্ঞানিক। এমন বিষয় চলবে না আর রাশিয়ায়। ভাবলে চলবে না, কাজে লাগাতে হবে। মৃত্যু নয়, গাওয়াতে হবে জীবনের জয়গান। বিষাদ-অবসাদ নয়, প্রাণধারণের দিনযাপনের স্ফূর্তি। চার নম্বর, বুলগাকফের "শ্বেতপ্রহরী"। এ বইয়ে কমিউনিস্টদের কথা নেই, "হোয়াইট"দের কথা, এবং দস্তুরমতো দরদ দিয়ে লেখা। তাই সেটা সোভিয়েট সমালোচকের মর্মশূল। সোভিয়েটের যারা শত্রু তাদেরকেই আঁকা হয়েছে বীর বলে, সাধু বলে, নিঃস্বার্থ বলে। কিন্তু, আশ্চর্য, বইটা তবু রাশিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো কাহিনীর মধ্যে রোমাঞ্চকরতার ঝাঁজ থাকার জন্যে। "টারবিনের দিন" নামে নাট্যাকার পেয়েছিলো বইটা। আর, সে-নাটক সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিলো যে গভর্নমেণ্টকে বন্ধ করে দিতে হয়েছিলো অভিনয়।

১৯৩২ সালে সরকারী কড়াকড়ি অনেক শিথিল হয়ে এলো, কেননা

হুকুম-হুমকির ভয় না করেই সব লেখকেরাই লিখতে লাগলো তখন সমাজবোধের দিক থেকে, একীভবনের প্রেরণায়। আলাদা যে "শ্রমিক-সাহিত্যিক সংঘ" ছিলো, উঠে গেলো, সবাই এসে নির্বিশেষে মিললো এক পতাকার নিচে, এক সমাজের সেবায় আর আরাধনায়। এই সর্বজনীন সংসর্গে ও সাহচর্যে গড়ে উঠলো সত্যিকারের সাহিত্য, সহিতত্ব —একের সহিত আরেকের অভেদ।

সোভিয়েট রাশিয়াকে এক সঙ্গে বহু দর্পণের ভিতর দিয়ে ও বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার জন্যে এই গল্পগুলি আমি সংকলন করেছি—বারোটি বিখ্যাত লেখকের বারোটি বিশিষ্ট গল্প।

অ্যালেকসাই টলস্টয় (জন্ম ১৮৮২) সোভিয়েট লেখক হন ১৯২২ সালে, কিন্তু পঞ্চবর্ষ কল্পনায় তাঁর দান মোটেই মূল্যবান হয়নি। তাঁর "কালো সোনা" যদিও তেলের কারখানা নিয়ে লেখা, বর্ণনার গুণে পারেনি উতরোতে। তাঁর "নরকের পথে"-তে বিপ্লবের আলোতে জীবনের ব্যাখ্যা, তাঁর "নীল শহরে" নির্মাণ-প্রমাণের চেয়েও জীবন বড়ো তারই প্রতিপাদন। টলস্টয়ের লেখায় এই জীবনপ্রাধান্যই সবলে উচ্চারিত। তাঁর "কাল সাপ" গল্পে এই জীবনেরই জয়স্তব, জীবনেরই পরাজয়-বেদনা।

বোরিস পিলনিয়াক (জন্ম ১৮৯৪), আংশিক ভাবে জার্মান, কমিউনিস্ট নন পুরোপুরি, যদিও "কাস্পিয়ানগামিনী ভলগা" তাঁকে বিপ্লবের নিশান ধরিয়েছে। তাঁর মতো বর্ণনার তেজ ও শব্দের তীক্ষ্ণতা রাশিয়ান সাহিত্যে অনন্যসুলভ। তাঁর "রিক্ত বৎসর" বিপ্লবপরবর্তী রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের ছবি।

ভ্যালেনটিন কাতাইয়েফের জন্ম ১৮৯৭ সালে। যদিও এক জন পাকা কমিউনিস্ট লেখক, জীবন যে সুন্দর ও উপভোগ্য ও তার যে আছে নিজের অর্থ নিজের রহস্য এ কথা কিছুতেই পারেননি ভুলতে। প্রেম

যে তবু সাধনার জিনিস, পরীক্ষা-প্রতীক্ষার ব্যাপার, এ ছবিই ঝিলকিয়ে উঠেছে তাঁর "ছোরা"তে।

ভ্‌সেভলড ইভানফের জন্ম সাইরেরিয়ায়, ১৮৯৫ সালে। সার্কাসে ভাঁড়ের পর্যন্ত কাজ করেছেন। ১৯১৬ সালে প্রথম গল্প লেখেন, পাঠান গোর্কির কাছে। গোর্কি জবাব দেন, আরো লেখাপড়া শিখে তবে গল্পে হাত দাও। গ্রাম্য বর্বর চরিত্র নিয়েই তাঁর বেশি কারবার, স্থূল ও প্রবলের মধ্য দিয়ে জীবনের আদিম রহস্য উন্মোচন। তাঁর "শিশু" কোমল স্নেহেরই বন্য বিকৃত রূপায়ন।

অ্যালেকজাণ্ডর নেভিয়েরফ (১৮৮৫-১৯২৩) চাষার ছেলে, মাস্টার, ১৯২১ সালে "প্রাচুর্যের দেশ" লিখে বিখ্যাত হন। তাঁর "অকেজো আনড্রন" এই চাষারই গল্প, চাষারই স্বপ্ন ও প্রয়াসের পরিণাম।

মিকায়েল জোসচেনকো (জন্ম ১৮৯৫) লাল সৈন্য। সব চেয়ে জনপ্রিয় গল্পলেখক। সাহিত্য দিয়ে জীবনের শোধন ও উৎকর্ষসাধনের দিকে মনোযোগ। তাঁর "নিরক্ষরা"তে সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-আন্দোলনের একটা আভাস আওয়া যায়। মানুষের ক্ষুদ্রতা ও স্থূলতা ও একের কাছে অপরের দুর্বোধ্যতা এই তাঁর প্রিয় বিষয়, এবং যদিও তিনি নৈরাশ্যবাদী, তবুও সব চেয়ে হাস্য-উচ্ছল তাঁর লেখা।

লেওনিড লেওনফ (জন্ম ১৮৯৯) প্রথমে কমিউনিস্টের দলে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস "ব্যাজার" (১৯২৫) চেনালো তাঁকে নতুন আন্দোলনের অগ্রদূত বলে। আবেগময় ভাব ও কারুকার্যময় ভাষা বর্জন করে চলে এলেন তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংঘর্ষ—এই লেওনফের আসল বিষয়। পঞ্চবর্ষ কল্পনায় তাঁর দান "সট" ও "স্কুটারেভস্কি"। প্রোফেসর স্কুটারেভস্কি কি করে সন্দেহের দোলায়মানতা ছেড়ে চলে এলো বিশ্বাসের শক্ত মাটিতে দ্বিতীয় উপন্যাসে তারই উদ্‌ঘাটন।

কনস্টানটিন ফেডিন (জন্ম ১৮৯২) প্রথম উপন্যাস "শহর ও বছর" লিখে দলে আসেন। বিপ্লবের শুধু ছবিই আঁকেননি, হেতু নির্ণয় করেছেন। নতুনের কাছে পুরোনোর পরাজয়, পুরোনোর কণ্ঠে নতুনের স্বীকৃতি—এবং এরি মাঝে জীবনের যে অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে, এই ফেডিনের চিত্রিতব্য বিষয়। তাঁর আধুনিকতম উপন্যাস "ইউরোপের লুট" পঞ্চ বার্ষিক কল্পনায় তাঁর অমূল্য উপহার। ধ্বংসগ্রস্ত ধনতন্ত্র ও মজ্জমান মধ্যবিত্ততা—এই নিয়ে সেই বিরাট উপন্যাস, যার প্রথম খণ্ড মোটে বেরিয়েছে। তাঁর "নারোভচাটের ইতিকথা" গল্পে নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্ব ও তার মাঝে অন্তর্লীন ব্যক্তিত্ববোধের বেদনা! পাকা কমিউনিস্ট হয়েও হৃদয়কে ফেডিন একেবারে বাদ দিতে পারেননি। রগফ, যার চোখ দিয়ে দেখছেন তিনি বিনাশোন্মুখ ইউরোপকে, সেও তার গোপন-গহন হৃদয় নিয়ে ব্যস্ত। গোঁড়া কমিউনিস্ট সমালোচকেরা এই হৃদয়প্রবণতার জন্যে ফেডিনকেও ক্ষমা করেনি।

১৮৯৪ সালে ওডেসায় ইজাক বাবেলের জন্ম। ১৯১৩ সাল থেকে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু। যদিও তাঁর প্রথম দুটো গল্প গোর্কি ছাপিয়েছিলেন তাঁর "লেটপিস্" কাগজে, পরের লেখাগুলোকে তিনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সাত বছর গা-ঢাকা দিলেন, পোলাণ্ডের যুদ্ধে আর জার্নালিজমে। ১৯২৩-২৪ সালে কতগুলি গল্প লিখলেন—তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যা "লাল ঘোড়সৈন্য" নামে বেরুলো ১৯২৬ সালে। লুট, ধ্বংস, হত্যা, নির্বোধ নির্জ্জান নিষ্ঠুরতার ছবিই তাঁর কলমে খেলে বেশি। তাঁর "চিঠি" এই নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক।

নিকোলাই টিখনফ আসলে কবি, বিপ্লবের আর যুদ্ধের, আর সেই বিপ্লবলিপ্ত, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষের। জলবিন্দুর মাঝে বন্যা, দলিত বৃক্ষশাখার মাঝে ব্যাকুল বিস্তীর্ণ অরণ্যের সংবাদ সেই কবিতায়। কবিতা ছেড়ে সম্প্রতি তিনি গদ্য ধরেছেন, আর সেই গদ্যে তাঁর "ফ্রিট্স্" কী উপাদেয়

গল্প হয়েছে, তা না পড়লে বোঝা যাবে না। টিখনফ কত দূর অগ্রসর আধুনিক তা এই জার্মান ঘোড়ার গল্পেই প্রকাশিত।

লেও ভাইসেনবের্গ অতিখ্যাত লেখক নন, কিন্তু তাঁর "ঘুম ভাঙানো ঘড়ি" স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কব্যাপারে সত্যিকারের সোভিয়েট গল্প। সঙ্গ ও সাহচর্য, স্বার্থপর ও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের চেয়েও উচ্চতর এই আনন্দ-অনুভবে সমস্ত গল্পটি উজ্জ্বল। আর কনস্টানটিন পাউসটফস্কির "তামার থালা" শ্রমের প্রতি, প্রতিভার প্রতি নতুনতরো মূল্য আরোপন।

জীবন ও আর্টের মাঝে কোথায় সূক্ষ্ম সীমা রেখা সে সম্বন্ধে আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যিকেরা সব সময়ে সচেতন নন, রূপ ও রীতির চেয়ে বক্তব্য বিষয় নিয়েই তাঁরা বেশি ব্যস্ত, তাই তাঁরা গোর্কির শাসনে এখন দৃষ্টি ফিরিয়েছেন পুরাকালিক লেখকদের দিকে, টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির দিকে, গোগোল ও শেখভ, বুনিন ও টুর্গেনিভের দিকে। তাই এখন তাঁদের লেখায় সমাজধর্মবোধের সঙ্গে মিশছে এসে শিল্পীর গঠনসৌষ্ঠব-বোধ। রাজনীতির সঙ্গে মিশছে এসে জীবননীতি। সোনার সঙ্গে সোহাগা।

এ-ই রাশিয়ান সাহিত্যের বড়ো দান। কেন আমি লিখবো তার নির্দেশ-নির্ধার। আমি ব্যক্তির জন্যে লিখবো না, যখনকার যা সমাজ, সেই সমাজের জন্যে লিখবো—আর যা সম্যক আজ, তাই সমাজ। আমার প্রতিভা আনবে তাতে আমার দৃষ্টির স্বকীয়তা, কিন্তু দেখবো আমি সমাজের দিক দিয়ে। আমার মনে যদি কিছু বিদ্রোহ থাকে দেখতে হবে তা সামাজিক মনের বিদ্রোহ কিনা। মোট কথা, আমার ভঙ্গীটা সমাজ-মনোভঙ্গীর থেকে আলাদা হবে না। আমি বাজাবো আমার নিজের বাজনা, কিন্তু পৃথক হয়েও সে সামাজিক ঐকতানে সুর মেলাবে।

১লা মে, ১৯৪৪

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

আলেক্সাই টলস্টয়

কালসাপ

১

পরনে সুতোর পাতলা ড্রেসিং-গাউন, চুলগুলো এলোমেলো আর মুখখানা অন্ধকার—অলগা রান্নাঘরে এসে ঢুকতেই সবাই চুপ করে গেলো। শুধু চাপা রাগে প্যারাফিন-বোঝাই স্টোভগুলো লাগলো জ্বলতে। যেন অকথিত কি-এক বিপদের বার্তাবহ এই অলগা।

বাসিন্দেদের মধ্যে কে একজন বলেছিলো তাকে লক্ষ্য করে: 'ও মাগী যেন ওঁচানো বন্দুক। যতই দূরে থাকে ততই মঙ্গল।'

মগ ও টুথ-ব্রাশ হাতে নিয়ে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে অলগা কলতলায় গেলো; কল ছেড়ে দিয়ে ছোট ঘন চুলের বোঝা নিয়ে বসলো তার নিচে। যখন মেয়েরা ছাড়া আর কেউ নেই রান্নাঘরে, কাঁধ থেকে খসিয়ে দিলো তার ড্রেসিং-গাউন, ধুলো তার ঘাড়, ধুলো তার সম্পূর্ণ-হয়ে-গড়ে-না-ওঠা ছোট-ছোট দুটি স্তন। দাঁড়ালো একটা টুলের উপর, ধুলো তার সবল সুডৌল দুটি পা। তার উরুতের উপর দেখা গেলো লম্বা একটা দাগ, কাঁধের ফলার ঠিক উপরে ছোট একটা গর্ত—গুলি বেরুবার চিহ্ন—আর ডান বাহুর উপরে নীল একটি উল্কি। তার শরীরটি হাল্কা আর ছিপছিপে, রঙ স্বর্ণাভ গোধূলির মতো।

মস্কোর ঘিঞ্জি পাড়ায় এই ফ্ল্যাট, মেয়ে-পুরুষে ঠাসা। বেশির ভাগ মেয়েরাই দেখেছে এই চিহ্নগুলো। মেরিয়া আফানাসিয়েভনা, দরজির দোকানে যে কাজ করে আর অলগাকে যে ঘৃণা করে আপ্রাণ, ডাকতো তাকে 'দাগী'

বলে। রোসা বেসিকোভিচ, সম্প্রতি যে বেকার, আর যার স্বামী সাইবেরিয়ায়, অলগাকে দেখে প্রায় মূর্ছা যাবার দাখিল। আর, সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা, চকচকে দেখাবার জন্যে ডাক-নাম যার 'ডলি', অলগার নিকটায়মান পায়ের শব্দ শুনলেই দে-দৌড়, রইলো পড়ে তার স্টোভ, রইলো পড়ে তার রান্না। এটা তার ভাগ্য বলতে হবে যে মেরিয়া আফানাসিয়েভনা আর রোসা বেসিকোভিচ ডলিকে দেখতো নেক-নজরে, নইলে তার সকালবেলাকার 'পরিজ' কোনো দিনই আর সেদ্ধ হত না।

স্নান করে অলগা তার কালো 'বুনো' চোখে তাকালো একবার মেয়েদের দিকে, তারপর চলে গেলো তার ঘরে, বারান্দার শেষপ্রান্তে। তার স্টোভ নেই, সকালবেলার রান্না তার কী করে হয় কেউ ভেবে পায় না। ভ্‌ল্যাডিমির পনিজোফ্‌স্কি, আগে যে ছিলো একজন সামরিক কর্মচারী, এখন এক পুরোনো জিনিসের দোকানে মাল এগিয়ে দেয়, বলে, অলগা সকালে চা খায় না, খায় ফরাসী মদ, তাও একশোর মধ্যে ষাট যার অনুপাত। অলগা সম্বন্ধে এমন অপবাদও যেন সম্ভব। হয়তো তারও স্টোভ ছিলো, কিন্তু যেমন সে বেয়াড়া, হয়তো জ্বালাতো তার নিজের ঘরে, যদ্দিন না হাউস-কমিটি তা বাতিল করে দেয়। কমিটির সভাপতি কমরেড জুরাভলেফ্‌ তাকে শাসিয়েছিলো নালিশ করবে বলে, যদি সে এমন আগুনে-কাণ্ড করে নিজেকে পুড়িয়ে বসে। অলগা তার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলো সেই জ্বলন্ত স্টোভ আর এমন চোস্ত ভাষা তাকে শুনিয়েছিলো যা সে তার জীবনে, এমন কি কোনো ছুটির দিনের রাস্তায়ও, শোনেনি। স্টোভটাকে জুরাভলেফ্‌ এড়িয়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু সেটা আর আস্ত ছিলো না।

সাড়ে ন'টার সময় অলগা বেরোয় বাড়ি থেকে। হয়তো রাস্তায় দুখানা স্যাণ্ডউইচ কেনে, আপিসেই চা খায়। ঠিক নেই, ফিরে আসে কখন। তার ঘরে আসে না কোনো পুরুষ, বন্ধু কিম্বা অতিথি।

দরজায় চাবির ফুটোর ভিতর দিয়ে তাকিয়ে কিছুই তেমন দেখা যায় না তার বন্ধ ঘরে। শূন্য দেয়াল, সামান্য একটা পোস্টকার্ডের ছবিও তাতে টাঙানো নেই, শুধু তার বিছানার উপরে ঝুলছে একটা রিভলবার। শুধু পাঁচ পদ আসবাব : দুটো চেয়ার, একটা দেরাজ, একটা লোহার খাট, আর জানলার কাছে একটা টেবিল। কখনো-কখনো পরিষ্কার থাকে ঘর, পাখিগুলি তোলা, ছোট একটি আয়না, দেরাজের উপর দুটো তেল কি জলের বোতল, একটি চিরুনি। টেবিলের উপর কয়েকখানা বই, কখনো বা কালির বোতলের মুখে একটি ফুল আটকানো। অন্য সময়, একটা সে বন্য বিশৃঙ্খলা—বিছানাটা দেখে মনে হয় কে যেন এ-পাশ ও-পাশ করে প্রলাপ বকেছে সমস্ত রাত ; মেঝের উপর রাশি-রাশি সিগারেটের পোড়া টুকরো আর মধ্যখানে রাতের ময়লার পাত্রটা।

'ভাবতে পারো, এ সব কোনো মেয়ের কাণ্ড?' রোসা বেসিকোভিচ বলে ঝাপসা গলায় : 'এমন ভাব, ও যেন মেয়ে নয়, যুদ্ধ-খালাস সৈন্য।'

স্টেট মেডিক্যাল স্টোরের পিটর মর্‌স্‌, বিয়ে না করে থাকাটাই যে অভ্যেস করে নিয়েছে, মন্ত্রণা দিয়েছিলো এক দিন, যে, দরজার ফুটো দিয়ে আয়ডোফর্ম ঢুকিয়ে অলগাকে একেবারে ধোঁয়া করে দেয়া যাক। 'হাওয়াতে আয়ডোফর্ম মিশে গেলে সাধ্য নেই কেউ নিশ্বাস নেয়।' কিন্তু কার আছে অমন বুকের পাটা।

সকলের দৈনিক খোসগল্পের খোরাক এই অলগা, সকলের জিভের চুলকানি। যদি না থাকতো অলগা, তবে এখানকার বসবাস বিস্বাদ হয়ে যেত। তবু কেউ দেখতে চায়নি তার জীবনের অতলে। তার প্রতি সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভার যে কেন ভয় তাও থেকে গেছে একটা রহস্য।

বাসিন্দেরা মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে ডলিকে। সে শুধু মাথা নাড়ে, আলগা-আলগা উত্তর দেয়, যত সব আজেবাজে কথা। তার নাকটা ছোট ছিলো, কিন্তু যদি আরেকটু তোলা কিম্বা হেলা থাকতো, হতে পারতো সে

সিনেমার তারকা। রোসা বেসিকোভিচ তাকে সান্ত্বনা দেয়: 'যদি প্যারিসে থাকতে, তোমার নাকের ছাঁদ বদলে দিত। কিন্তু যাবে কি করে প্যারিসে?' শুনে সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা একটু হাসে, তার গাল দুটোতে লালের একটু আভা পড়ে আর নীল চোখে স্বপ্নালু লোভের কুয়াসা আসে ঘনিয়ে।...পিটর মর্‌সের ধারণা: 'মেয়েটা সুন্দর বটে, কিন্তু বোকা।' এটা সত্য নয়। বোকা দেখানোটাই ডলির কায়দা, কিন্তু আসলে উনিশ বছর বয়সেই তলে-তলে তার কেজো বুদ্ধি বেশ পাকা ও চনচনে। খেটে-খেটে যারা শ্রান্ত, কিম্বা বড়-বড় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব যাদের হাতে, সেই সব প্রৌঢ়দের তাকে বড্ড পছন্দ। যেন জীবনের কোন বিস্মৃত তল থেকে আহৃত একটি স্মিত স্নেহ ভাসে তার মুখের উপর। হাঁটুর উপর এসে সে বসবে আর দুলবে মৃদু-মৃদু, ভুলিয়ে দেবে শহরের এই শব্দ আর গন্ধ, অঙ্কের সার আর কাগজের খসখস—ও যেন তেমনি! নাকের ডগাটা মুছে পিঠ সোজা করে আঁট হয়ে যখন বসে সে তার টাইপ-রাইটার নিয়ে মাহর্কা ট্রাস্ট আফিসের অন্ধকার ঘরে, দেওয়ালের কাগজ যার নোংরা হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ বসন্ত ফুলন্ত হয়ে ওঠে। জানে সে সবই, জানে সে তার নির্দোষিতা, তবু তাকেও যে অলগা ঘৃণা করে তার মাঝে কি কোনো রহস্যই নেই?

এক রবিবার, ঠিক যেমন সাড়ে-আটটায় তেমনি, বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরের দরজা নড়ে উঠলো শব্দ করে, আর সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা নিচু গলায় উঠলো চেঁচিয়ে, তার হাত থেকে পড়ে গেলো চায়ের প্লেট আর সে ছুটে বেরিয়ে গেলো রান্নাঘর ছেড়ে। শুনতে পাওয়া গেলো তার ঘর বন্ধ করার আওয়াজ। অলগা ঢুকলো এসে রান্নাঘরে। আঁট করে বোজানো দুই ঠোঁটের কিনারে ছোট দুটো রেখা, পাতলা ভুরু দুটো কুঞ্চিত করে টানা, মুখে অসুস্থতার ছাপ। বোলতার মতো সরু কোমরে আঁট করে

তোয়ালে জড়ানো। চোখের পাতা তুলেও ধরলো না কারু দিকে, সটান কল খুলে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে গা ধুতে লাগলো। 'তোমার পর কে এসব মুছবে শুনি? ঘাড় চেপে ধরে মুখ দিয়ে রগড়ানো যায় তা হলে ঠিক হয়।' মেরিয়া আফানাসিয়েভনার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো বটে বলতে, কিন্তু চেপে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলে।

চুল মুছে অলগা তার কালো চোখে তাকালো একবার রান্নাঘরের দিকে। এসেছে মেয়েরা, পিছনের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে পিটর মর্‌স্‌, হাতে এক তাল রুটি, এক বোতল দুধ আর একটা কুৎসিত কুকুর, যেটা সব সময়েই কেবল কাঁপে। মর্‌সের শুকনো ঠোঁট বিষাক্ত হাসিতে কুঁচকোনো, তার জঙ্গুলে দাড়ি আর বঁড়শি-বাঁকা নাকে তাকে মনে হচ্ছে একটা পাখি বলে। তার মুখের ভাবখানা হচ্ছে এই: 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে—' দুঃসংবাদ শোনাতে তার খুব ফুর্তি। সকালবেলায় বাজারে যাবার সেই ময়লা পায়জামা-প্যাণ্ট তার পরনে।

অলগা একটা শব্দ করে উঠলো যেটা কর্কশ কান্না আর বিষাক্ত হাসির মাঝখানে।

'শয়তানি!' কাকে বললো, কী ভেবে বললো কে বলবে। তোয়ালেটা কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে গেলো। পিটর মর্‌সের হলদেটে মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি

'হাউস-ম্যানেজার হঠাৎ ঘর-দোর পরিষ্কার রাখার দিকে নজর দিয়েছেন, খুব টানছেন নিশ্চয়ই আজকাল। এখন সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে এই সাব্যস্ত করতে চাইছেন যে আমার কুকুরই সিঁড়ি নোংরা করেছে। ফের করলে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি যত বলছি, ও আমার কুকুরের কাজ নয়, উনিও ততই চেঁচাচ্ছেন, এ আমার কুকুরেরই কীর্তি। কেউ কোনো কাজ করছি না, উনি ঝাঁট দেওয়াচ্ছেন না সিঁড়ি, আমিও বেরুচ্ছি না আমার কাজে—কী ঘোরতর রাশিয়ান আমরা।'

শোনা গেল তখুনি একটা দোর দেয়ার শব্দ, বারান্দার প্রান্তে একটা আর্তনাদ : 'শয়তান !' রান্নাঘরে মেয়েরা তাকালো পরস্পরের দিকে। পিটর মর্‌স্‌ তার ঘরে গেলো, চা খাবে, পায়জামা-প্যাণ্ট খুলে পরবে রবিবারের ট্রাউজার্স। রান্নাঘরের ঘড়ির কাঁটা নটার দিকে।

নটার সময় কে-একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে ঢুকলো এসে জেলা-সৈন্যের আপিসে। মুকুটের মতো ছোট বাদামী টুপি চোখের উপর দিয়ে টানা, ওভারকোটের উঁচু কলার তুলে ঘাড় আর চিবুক ঢুকোনো, আর যেটুকু মুখ দেখা যাচ্ছে অনাবৃত, তাতে পাউডারের প্রলেপ। সৈন্য-বিভাগের যিনি প্রধান, তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে, দেখলেন মুখে তার পাউডার নয়, বিবর্ণতা, স্বাভাবিক বিবর্ণতা, এক ফোঁটা রক্ত নেই মেয়েটির মুখে। কালি-ফেলা টেবিলের গায়ে বুক চেপে ধরে মেয়েটি বললে নিচু গলায়, নিরাশায় নির্জীব তার কণ্ঠস্বর : 'যান একবার প্স্কভ্‌স্কায়া স্ট্রিটে—আমি কী করেছি তা আমি জানি না—আমি মরবো এবার...'

এতক্ষণে নজরে পড়লো, মেয়েটির নিস্তেজ হাতে ছোট রিভলভার। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির কব্জি ধরে ফেললেন সেই ভদ্রলোক আর ওটা ছিনিয়ে নিলেন জোর করে।

'রিভলভার রাখবার পারমিট আছে তোমার ?'

মেয়েটি তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে, অর্ধ-অচেতন স্তব্ধতায়, মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে, যাতে টুপিতে চোখ না সম্পূর্ণ ঢেকে যায়।

'কি নাম তোমার ?'

'অলগা জোটোভা।'

২

দশ বছর আগে। কাজানের বড়ো ব্যবসায়ী ও প্রাচীনপন্থী ভিয়াচেসলাফ জোটোভের বাড়িতে একদিন আগুন লাগে, দিনে-দুপুরে। ফায়ার-ব্রিগেডের লোকেরা নিচের তলায় দুটো মৃতদেহ পায়—ইলেকট্রিক্ তার দিয়ে এক সঙ্গে বাঁধা—জোটোভ আর তার স্ত্রী। উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তাদের মেয়ে, সতেরো বছরের স্কুলের ছাত্রী। তার রাতের পোশাক টুকরো-টুকরো ছেঁড়া, হাতে আর ঘাড়ে আঁচড় আর ঘা, একটা নিদারুণ সংগ্রামের সাক্ষী। কিন্তু ডাকাতরা তাদের পালানোর তাড়ায় নিঃশেষে ঘায়েল করতে পারেনি মেয়েটাকে, শুধু কাছেই কুড়িয়ে-পাওয়া কি-একটা চামড়ায়-বাঁধা ভারি জিনিসের ঘা মেরে অজ্ঞান করে রেখে গেছে।

বাঁচানো গেলো না বাড়িটা, জোটোভের পরিবারের যা কিছু সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। অলগাকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতাল, কাঁধ চেপে বসাতে হলো ঠিক জায়গায়, সেলাই করতে হলো মাথার চামড়া। কত দিন রইলো সে বেঘোরে। জ্ঞান হলো ব্যাণ্ডেজ বদলাবার যন্ত্রণায়। দেখলো, চোখে চশমা ও করুণা নিয়ে কে একজন সামরিক ডাক্তার বসে আছেন তার বিছানায়। যেন তার তারুণ্য স্পর্শ করেছে তাঁকে, ডাক্তার জিভে একটু শব্দ করলেন, যেন না নড়ে সে একটুও। অলগা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলো তার হাত।

'ডাক্তার, কী জঘন্য পশু ওরা!' কেঁদে ফেললো অলগা। এবং আরো ক'দিন পরে বললে, 'আর দুজনের পরনে ছিল সৈন্যের কোট। আরেক-জনকে তো আমি চিনি—ভালকা—পাড়ায় ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে। ওর সঙ্গে কত নেচেছি আমি।...শুনলাম, আমার বাবাকে আর মাকে ওরা খুন করেছে, শুনলাম ওদের হাড় ভেঙে যাবার শব্দ।...ডাক্তার, কেন এমন হলো? এমন পশু!'

'শ্‌শ্‌—' ডাক্তার আবার শব্দ করলেন, চশমার পিছনে তাঁর চোখ আর্দ্র হয়ে উঠলো।

হাসপাতালে কেউ আসতো না অলগাকে দেখতে। তখন রাশিয়ার বড় দুঃসময় যাচ্ছে, আন্তর্যুদ্ধে ছিন্নভিন্ন রাশিয়া, আরামদায়ক জীবন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ তখন যত গভর্নমেণ্টের ইস্তাহার—ছোট-ছোট কাগজে হাজার-হাজার ইস্তাহার—ভীত চোখের সামনে যেখানে-সেখানে লটকানো। তখন কী আর করবার ছিলো অলগার, অসহ্য মমতার কান্না ছাড়া (এখনো কানে লেগে আছে তার বাবার আর্তস্বর, মেরো না, মেরো না—মার অমানুষিক চীৎকার—মা এমন চেঁচাতে পারে কে শুনেছিলো আগে)—কান্না শুধু ভয়ে, যে বিরাট অজানা আসছে দেশের রাজপথ দিয়ে, চেঁচাচ্ছে, গজরাচ্ছে, গুলি ছুঁড়ছে, তার সামনে হতাশার কান্না।

সে-সব দিন এত কান্না সে কেঁদেছিলো, যা তার বাকি সমস্ত জীবন ভিজিয়ে রাখতে পারতো। তার যৌবন যেন সেইখানেই শেষ হয়ে গেলো—যে যৌবনে রইলো না কোনো দোলা কিম্বা কোনো দুঃখ। শুকানো ঘায়ের মতো তার আত্মায়ও দাগ পড়লো। জানতেও পেলো না কী গূঢ় ও সর্বনেশে শক্তি ছিলো তার এই ঠুনকো কাঠামোয়।

এক দিন বারান্দায়, বেঞ্চিতে, তার পাশে বসলো একজন লোক, কাঠ দিয়ে হাত বাঁধা। হাসপাতালের ড্রেসিং-গাউন গায়ে, পায়জামা-প্যাণ্ট আর পুরোনো শ্লিপার, কিন্তু সমস্তটি উপস্থিতি থেকে বেরুচ্ছে একটি আনন্দ, স্বাস্থ্যের তাপ, যেন গরম একটা লোহার স্টোভ। শিসোচ্ছে একটা হালকা জানা গানের সুর আর তাল রাখছে মেঝেতে গোড়ালি ঠুকে। পাশে-বসা সুন্দর মেয়েটির দিকে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে তার শ্যেন চোখ। ছেলেবয়সের দাড়ি উঠেছে তার চিবুকে, যা তখনো ক্ষুরের ছোঁয়া পায়নি—রোদে-পোড়া প্রশস্ত সে-মুখে কেমন একটি

নিশ্চিন্ত অলস ভাব। শুধু চোখ দুটোই একটু তীক্ষ্ণ, হয়তো বা নিষ্ঠুর ; শ্যেনচক্ষুর ধূসরিমা তাতে।

'খারাপ রোগের ওয়ার্ড থেকে ?' জিগগেস করলে সে আলটপকা।

প্রথমটা অলগা বুঝতে পারেনি, পরে রাগে একেবারে জ্বলে উঠলো। 'আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো, তাই আমি এখানে।' সরে বসলো সে দূরে, নাক ফুলে উঠলো, নিশ্বাস নিতে লাগলো সে জোরে-জোরে।

'সত্যি ? কী ভীষণ ! নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিলো তোমাকে খুন করতে চাওয়ায়। ছিলো না ? শুধু ডাকাত ? বলো কি ?'

অলগা তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। এমন ভাবে বলছে সে কথাটা যেন খুবই সাধারণ ঘটনা, যেন অনেক দিনের একঘেয়েমির পর একটা খোসগল্পের বিষয়।

'আমাদের কথা কিছু শোনেননি আপনি ? প্রলমনায়া স্ট্রিটের জোটোভদের কথা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। তুমি তো বেশ শক্ত মেয়ে, ঘাল হয়ে যাওনি।' ভুরু কুঁচকোলো লোকটা : 'এই সব আমাদের দেশের লোক, ওদেরকে ভদ্রলোক বানাতে হলে অনেক আগুন আর গরম জলের ভিতর দিয়ে ওদের নিয়ে যেতে হবে।…এমনি করেই সমাজের অনেক তলানি উপরে উঠে এসেছে আশাতীত ভাবে— দেখলে তাক লেগে যায়। একেবারে পশুর দল।' (তার ঠাণ্ডা দৃষ্টি বসলো অলগার মুখের উপর।) 'অবিশ্যি এই পীড়ন থেকেই তোমার বিদ্রোহের ভাব তার চেহারা নেবে।—আশ্চর্য, তুমি প্রাচীনপন্থীদের বংশের মেয়ে। তাই না ? ঈশ্বর মানো ? যাক গে, কিছু আসে-যায় না তাতে, শেষকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।' (হঠাৎ সে বেঞ্চির উপর একটা কিল মারলো।) 'মানবে, শুধু মানবে তুমি এই সংগ্রাম।'

অলগার ইচ্ছে হলো একটা খুব জোরালো জবাব দেয়—তার উৎপীড়িত

আত্মার আর্তির থেকে, যার কোনো উত্তর দেয়া যাবে না চট করে। কিন্তু তার ঠাট্টা-মাখানো একলক্ষ্য দৃষ্টির সামনে তার চিন্তা নিঃসাড় হয়ে গেলো, জিভে এসে পৌঁছুলো না।

'হ্যাঁ, ভেতরে আছে তোমার সেই তেজ, যেমন আছে ঘাড়-বাঁকানো ঘোড়ায়। কিছুটা খাঁটি রাশিয়ার রক্ত, কিছুটা বেদের রক্তের মিশেল। যদি এখন কিছুই না ঘটতো তোমার জীবনে, তুমি কী করতে? আর-আর পাঁচ জনের মতো হেঁটে যেতে জীবনের মধ্য দিয়ে, তাকাতে তার দিকে যেমন করে লোকে জানলা দিয়ে তাকায়, খসখসের বেড়ার আড়াল থেকে।…কী বিস্বাদ!'

'এটা খুব স্বাদের, এই যা চলেছে চার পাশে?'

'নয় কি তাই? কিছুটা হাত-পা ছুঁড়তে হবে না? সমস্ত জীবন কাটাতে হবে কি ডেস্কে কলম পিষে?'

অলগার আবার রাগ হলো, কিন্তু বলবার কিছু পেলো না। শুধু ঘাড় বাঁকালো। লোকটা এমন দৃঢ়নিশ্চয়!…

'তোমরা আমাদের শহর পুড়িয়েছ, শিগগির সমস্ত রাশিয়া পোড়াবে। নির্লজ্জ…'

'হা-হা! রাশিয়া কী!…আমরা সমস্ত পৃথিবী উলটে দেব, ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগিয়ে যাব দিগন্তের প্রান্ত পর্যন্ত। ঘোড়া এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—সমুদ্র ছাড়া আর কিছু তাকে রুখতে পারবে না। তুমি চাও কি না-চাও, কিছুটা হাত-পা আমাদের সঙ্গে তোমাকেও ছুঁড়তে হবে।'

সে অলগার দিকে একটু ঝুঁকে এলো, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে হাসলো, যেন কী একটা ভয়ংকর আহ্লাদ! অলগার মাথা ঘুরে গেলো, মনে হলো যেন বহু যুগ আগে, কোন দূর অতীতে, শুনেছিলো সে এসব কথা—যেন মনে করতে পারছে সে এই ঝকঝকে শাদা দাঁত—যেন তার রক্তের

অন্ধকার থেকে জেগে উঠেছে সেই স্মৃতি, আর যেন বৃদ্ধ প্রপিতামহদের কণ্ঠ তাকে বলছে চেঁচিয়ে : 'চেপে বসো ঘোড়ার উপর, আমরাও আবার বেঁচে উঠি আনন্দে—' তার মাথা ঘুরতে লাগলো। একটা ক্ষণিক অনুভব, তারপর আবার যেমন-কে-তেমন, সেই একই লোক বসে আছে বেঞ্চিতে, কাঠে হাত বাঁধা, পরনে সেই হাসপাতালের ড্রেসিং-গাউন। শুধু তার হৃদয় উঠেছে দুলে, তপ্ত হয়ে—হঠাৎ কেমন আত্মজনের মতো মনে হয়েছে এই শ্যেনচক্ষু আগন্তুককে। তাড়াতাড়ি সে একেবারে সরে গেলো বেঞ্চির শেষ প্রান্তে। লোকটা তেমনি শিস দিতে লাগলো, লাগলো গোড়ালি ঠুকে তাল দিতে।

সংক্ষেপ কথাবার্তা—হাসপাতালের চলাচলের পথে, আলস্যের ক্লান্তিতে যেমন কয়ে থাকে মানুষে। লোকটা শিস দেয়া শেষ করে চলে গেলো, অলগা তার নামটাও জিগগেস করে রাখলো না। কিন্তু পর দিন সকালে যখন অলগা চুপিচুপি বসলো এসে সেই বেঞ্চিতে আর ভিড়-ভর্তি বারান্দাটা চোখ দিয়ে চষতে লাগলো কার প্রতীক্ষায়, আর মনে-মনে অনেক সব চটকদার কথা উঠছিলো শানিয়ে তার অনেক অহংকার গুঁড়ো করে দেবার জন্যে, আর সত্যি-সত্যি যখন সে এলো না, তখন, তখনই আকস্মিক অলগা বুঝলো কালকের দেখা-হওয়াটা কী অসম্ভব গভীর ভাবে তাকে নাড়া দিয়ে গেছে!

তারপর আর এক মুহূর্তও সে সেখানে বসলো না। তার চোখে জল এলো এই ভেবে যে সে বসে আছে আর ওর কিনা ভ্রূক্ষেপ নেই।... ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে সে শুয়ে পড়লো আর ভাবতে লাগলো যত কঠিন ভাবনা। কেন, কেন তাকে জাগিয়ে গেলো এমন করে?

তবু বিরক্তির চেয়ে কৌতূহল যেন বেশি। এত ইচ্ছে করছে তাকে আরেকটিবার দেখবার জন্যে। কী রকম না জানি ও দেখতে। নিশ্চয়ই,

দেখবার নেই কিছুই। তার মতো লক্ষ-লক্ষ মূর্খ আছে মাঠে-ঘাটে।···
একটা বলশেভিক, একটা ডাকাত। আর তার চোখ—উদ্ধত চোখ!
তার মেয়েলি গর্ব তাকে বারবার খোঁচা মারতে লাগলো—এমন একটা
লোকের কথাই কিনা ভাবছে সে সারা দিন! তার কথা ভেবে বসে-বসে
আঙুল মোচড়াচ্ছে!

রাত্রে সমস্ত হাসপাতাল হঠাৎ জেগে উঠলো। ডাক্তার নার্সরা মোটা-
মোটা বোঝা নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো, রুগীরা ভয় পেয়ে বিছানার
উপর উঠে বসেছে। বাইরে গাড়ির চাকার শব্দ, আর জ্বলন্ত চীৎকার।
চেক সৈন্য কাজানে ঢুকছে। লাল ফৌজ পালাচ্ছে শহর ছেড়ে।
যে কেউ হাঁটতে পারে, প্রত্যেকে ছেড়ে যাচ্ছে হাসপাতাল। শুধু অলগা
একা পড়ে, কেউ ভাবেনি তার কথা।

ভোর হতেই হাসপাতালের বারান্দা বোঝাই হয়ে গেলো চেক সৈন্যে,
চওড়া বুক আর ফিটফাট পোশাক। কাকে যেন টেনে নিয়ে গেলো—
সহকারী ম্যানেজার উঠলো চেঁচিয়ে: 'আমি একজন নিচু কর্মচারী,
আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' জানলা থেকে
বাইরে দেখা যায় উঠোন, দুজন অর্ধপক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী জানলার কাছে
গিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'বেচারা। ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে ঐ
আটচালায়, ফাঁসি দেবে বলে।'

অলগা পোশাক পরে নিলো—হাসপাতালের ধোঁয়াটে পোশাক, ব্যাণ্ডেজ-
করা মাথায় বেঁধে নিলো শাদা রুমাল। ছুটির দিনের গির্জার ঘণ্টার
আওয়াজ ভেসে আসে শহরের উপর দিয়ে; দূরে শোনা যায় সৈন্যদের
বাজনা, কখনো জোরে, কখনো মৃদু। 'শ্বেত' সৈন্যেরা ঢুকছে শহরে;
বহুদূরে, ভলগার ওপারে শোনা যায় বন্দুকের গর্জন।

অলগা ওয়ার্ড থেকে এলো বেরিয়ে। পথের মধ্যে আটকালো শান্ত্রী, ছুটো
বেঁটে-পেয়ে লম্বা-গোঁফ-ওয়ালা চেক তাকে বললে ফিরে যেতে। 'আমি

বন্দী নই, আমি রাশিয়ান।' বললে অলগা, চোখে ঝিলিক দিয়ে। চেক-দুটো হেসে উঠলো, আলগোছে হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে চিমটি কাটতে চিবুকে আর গালে। তাদের চকচকে ওঁচানো ব্যায়নেটের দিকে সিধে এগিয়ে যেতে তার সাহস হলো না। তাই সে ফিরে গেলো, দ্রুত-নিশ্বাসে নাক তার স্ফীত, বসলো গিয়ে তার বিছানায়, যেন ঘোর জ্বর হয়েছে এমনি দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগতে লাগলো।

সেদিন সকালে রুগীরা আর চা পেলো না, লাগলো নালিশ করতে। খাবার সময় এক-পা-কাটা পাঁচটা লাল সৈন্যকে চেকরা খেদিয়ে নিয়ে চললো। জানলার কাছে সেই দুটো অর্ধপক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক বললে, 'ওদেরো তেমনি নিয়ে যাচ্ছে সেই আটচালায়।' এ সময়ে ওয়ার্ডে এলো একজন রাশিয়ান অফিসার, চামড়ার বেল্টে আঁট করে কোমর বাঁধা, তার ঘোড়-সওয়ারের পোষাক বাদুড়ের পাখার মত এলানো। রুগীরা তাড়াতাড়ি কম্বল টেনে দিলো গায়ের উপর। অফিসার তাকালো একবার বিছানা-গুলির দিকে, দৃষ্টিটা সূক্ষ্ম করে স্থির করলে অলগার উপর। 'জোটোভা ? আমার সঙ্গে এসো।' সে যেন উড়ে যাচ্ছে তার পোষাকের ডানায়, জুতোর তলার লোহার শব্দে চারদিকের শূন্যতা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

উঠোন পেরিয়ে যেতে হলো তাদের। সেই সময় একটি যুবক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল ও গায়ে কাজ-করা রাশিয়ান শার্ট, বেরিয়ে আসছিলো ঢাকা বারান্দার থেকে, পড়লো এবার অলগা ও তার সঙ্গীর মুখোমুখি। যুবকটি তেরছা করে তাকালো অলগার দিকে, চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে পালালো ফটকের মুখে। অলগা হোঁচট খেলো। মনে হলো, যেন চেনা-চেনা···কিন্তু না, হতে পারে না।

ঘরে ঢুকলো অলগা, বসলো টেবিলের কাছে, অফিসারের লম্বা মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন কোন বিদঘুটে আয়নায়-দেখা বিকৃত মুখ। চোখে আরেক রকম রঙ নিয়ে অফিসার তাকালো অলগার দিকে, ধমকিয়ে

উঠলো : 'তোমার লজ্জা করে না ? তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছো, লজ্জা করে না তোমার এসব যা-তা লোকের সঙ্গে মিশতে ?' অলগা একবার চেষ্টা করলো বুঝতে, এ কী বলছে। একটা অবাধ্য চিন্তা কিছুতেই তাকে মন ঠিক করতে দিচ্ছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার, দুহাত চেপে ধরলো কোলের উপর এবং সব সে বললে আগাগোড়া, কী তার ঘটেছে। অফিসার সিগারেট খাচ্ছে আস্তে-আস্তে, টেবিলের উপরে কনুয়ের ভর রেখে। যা বলবার ছিলো বলা হলো সব। অফিসার একতাড়া কাগজের একটা পৃষ্ঠা উলটোলো, তাতে পেন্সিল দিয়ে কী খানিকটা লেখা।

'আমাদের খবর ঠিক মিলে যাচ্ছে না,' কপাল কুঁচকে অফিসার বললে। 'আমি তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই বলশেভিস্ট দলের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ? কী ?'

তার মুখের একটা পাশ উঁচু হয়ে উঠলো, ভুরু গেলো বেঁকে। তার সদ্য দাড়ি কামানো মুখ। বয়সের অসঙ্গতিটা ভয় পাইয়ে দিলো অলগাকে। 'কিন্তু আপনি···আমি বুঝতে পারছি না···আপনি নিশ্চয় পাগল হয়েছেন···'

'দুঃখিত, কিন্তু আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে, তোমার কাছে যতই অদ্ভুত লাগুক না কেন···' অফিসার তার সিগারেটটা মুখের থেকে সরিয়ে নিলো, আবার রাখলো এনে ঠোঁটের উপর ; এবার ধোঁয়া ছাড়লো কুণ্ডলীর আকারে—ভাবতে সত্যি কষ্ট হয় যে ড্রয়িংরুম শোভা করা ছাড়া এ লোকের আর কী কাজ হতে পারে। 'তোমার সারল্যে আমি নিরস্ত্র বোধ করছি··· (আবার একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী) শেষ পর্যন্ত খাঁটি থাকবার চেষ্টা কোরো। এদিকে তোমার বন্ধুরা, লালফৌজেরা, মরেছে কিন্তু বীরের মতো। (তার একটা চোখ যাতে একটু হালকা বাদামীর ছোঁয়াচ, তাকালো একবার জানলার দিকে, যেখান থেকে দেখা যায়

আটচালার দরজা।) আর ভিড়বে না তো? কেমন, তাহলে চুপ করে যাই আমরা। বেশ, তবে তাই…'
চেয়ারের হাতলের উপর বাহু রেখে তাকালো সে চেক সৈন্যদের দিকে। বললে, 'বিটি, দেখ তো…'
চেকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো অলগার উপর, চেয়ার থেকে টেনে তুললো তাকে, লাগলো তার শরীরতল্লাসি করতে। হাত রাখলো তার পাছার উপর, বুকের উপর, পোশাকের নিচে, যেখানে-সেখানে খুঁজে বেড়াতে লাগলো পকেট,* তাদের লম্বা গোঁফ আনন্দে লেজ নাচাচ্ছে। চেয়ার থেকে আধখানা উঠে অফিসার দেখলো সব চোখের সামনে, তার দু'রকম রঙের দু'রকম চোখ নিশ্চল বিস্ফারিত। অলগার মনে হলো যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, মুখে সমস্ত রক্ত এসেছে চলে। নিজেকে ছিনিয়ে নিলে সে সবলে এবং তীব্র চেঁচিয়ে উঠলো।
'নিয়ে যাও জেলখানায়।' হুকুম করলে অফিসার।

অলগা দু'মাস কাটালো জেলখানায়, প্রথম সাধারণ গারদে, পরে নির্জন নির্বাসনে। প্রথম দিকে একটা কোন আটচালার ফটকের কথা ভেবে-ভেবে তার চিন্তা যেত ঘুলিয়ে, সে ঘুমুতে পারতো না, স্বপ্নে মনে হোত যেন একটা দড়ি তার গলার উপর দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে।
তাকে কেউ একটা প্রশ্নও করলে না, ডাকলেও না বাইরে, যেন সবাই তাকে ভুলে গেছে। আস্তে-আস্তে সে ভাবতে সুরু করলো এবং হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেলো চোখের-সামনে-মেলে-ধরা বইয়ের পৃষ্ঠার মতো। কাজ-করা শার্টে কোঁকড়ানো চুলের সেই ছেলেটা ভালকা—সেই খুনে—তাতে আর ভুল নেই। পাছে তার বিরুদ্ধে সে নালিশ করে সেই ভয়ে তার নামে তাড়াতাড়ি মিথ্যে করে লাগিয়ে গেছে। পেন্সিলের সেই নোট ভালকার হাতেই লেখা।

অলগা ঘরের মধ্যে বাঘিনীর মতো ঘুরে বেড়ায়, সকরুণ আবেদন করে, একবার সে জেলের কর্তা, পুলিশের কর্তা, বিচারের কর্তার সঙ্গে দেখা করবে, তার উত্তরে শান্ত্রীরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তার এই আত্মবিস্মৃত অবস্থায়ও সে ন্যায়বিচারে বিশ্বাস হারায়নি, অনেক অদ্ভুত সব মতলব গজায় তার মাথায়—কাগজ জোগাড় করবে, পেন্সিল জোগাড় করবে, তারপরে লিখবে নিখুঁত সত্য কথা এবং পাঠাবে উপরিতন কর্মচারীদের কাছে, যেন তারা ঈশ্বরেরই সামিল।

একরাত্রে সে হঠাৎ জেগে উঠলো ফটকের দরজা খোলার শব্দে, খানিকটা আচমকা কথাবার্তায়। কে যেন পাশের ঘরে এসে ঢুকেছে। একটা চশমাওয়ালা লোক থাকতো ও-ঘরে ; তার সম্বন্ধে এইটুকুই শুধু জানা ছিলো যে রাত্রে খুব কষ্টে সে কাশে। অলগা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো ও শুনলো। দেয়ালের পিছনে গলার স্বর ফেটে পড়লো চীৎকারে, অস্থির, ত্বরান্বিত। তারপর থেমে গেলো হঠাৎ, ঘনিয়ে এলো স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভেঙে বেরুলো একটা করুণ ককানি, যেন কাউকে কে মারছে এবং চেপে রাখবার চেষ্টা করছে, ডাক্তারের চেয়ারে দাঁতের রুগীর মতো।

অলগা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে গেলো এক কোণে, জানলার নিচে এবং বিস্ফারিত চোখে তাকালো অন্ধকারে। সাধারণ কয়েদখানার অত্যাচারের গল্প সে যা পড়েছে তা মনে পড়লো একে-একে। তার মনে হলো সে যেন লোকটার উলটোনো মুখটা দেখতে পাচ্ছে, পাংশু বিবর্ণ মুখ, তার চশমা, তার ফুলো গাল বেদনায় কুঞ্চিত। তার কব্জিতে, গোড়ালির কাছে তার জড়িয়ে রেখেছে, যেন মাংস কেটে-কেটে হাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয়।

'তোমাকে আমরা কথা কওয়াবো, তোমাকে আমরা…' অলগা যেন শুনতে পেলো দেয়ালের মধ্য দিয়ে। তারপর শব্দ ভেসে এলো যেন

কে পিটছে ওকে, মানুষকে নয় কার্পেটকে। লোকটা চুপ। একটা বাড়ি, আরেকটা। পরে হঠাৎ উল্লসিত গর্জন: 'আ! তুমি এখন কথা কইবে!' তারপরে আর উল্লাস নেই, একটা যন্ত্রণাময় গোঙানি, সমস্ত কয়েদখানা ভরে উঠলো সেই আর্তিতে। অলগার মনে হলো, যেন সেই ভয়ংকর কার্পেটের ধুলো তাকে আচ্ছন্ন করে ধরেছে; তার বুকে সুরু হলো একটা অসুস্থ কাঁপুনি, পা গেলো টলে, পাথরের মেঝে দুলে উঠলো, আর যখন সে পড়লো, মাথা এসে লাগলো সেই পাথরে।

সেই রাত্রে যখন এক নিঃসহায় লোক মার খাচ্ছিলো আর একটা লোকের হাতে, তখন ন্যায়বিচারের সমস্ত ভীরু আশা তিক্ত হতাশায় গেলো ডুবে। কিন্তু অলগার জীবন্ত স্বভাব স্তব্ধতা বা বিরক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে পারে না। আরো ক'টা অন্ধকার দিনের পর, যখন তার বুদ্ধি প্রায় মূঢ় হয়ে গেছে, তখন সে মুক্তি পেলো—ঘৃণা আর প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা আর ঘৃণা! একবার যদি বাইরে বেরুতে পারতো সে—

মাথা তুলে তাকালো সে জানলার দিকে, ধুলো-ভরা কাচে বাজলো যেন একটু মৃদু আওয়াজ, শুকনো মাকড়সা দুলে উঠলো তার জালের মধ্যে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে আবার বন্দুকের আওয়াজ। (কাজানের দিকে এগিয়ে আসছে পঞ্চম লাল ফৌজ) ওয়ার্ডার তার খাবার রেখে গেলো, নাকের ভিতর দিয়ে ঘৃণ্য আওয়াজ করলো, তাকালো জানলার দিকে। 'তোমার জন্যে একটা কেক এনেছি আজকে…যদি তোমার কিছু লাগে, দরজায় একটু শুধু টোকা মেরো। যারা রাজনীতিক বন্দী, আমরা তাদের বন্ধু।'

জানলার কাচে সমস্ত দিন ধরে শব্দ হয়। দরজার বাইরে ওয়ার্ডাররা গান ধরে। অলগা তার বিছানায় বসে থাকে, দুহাতে দুহাঁটু টেনে ধরে। খাবার সে ছোঁয়ও না। তোলা হাঁটুর উপর তার বুকের ধাক্কা

লাগে, জানলার বাইরে দূর বন্দুকের শব্দ। সন্ধের সময় ওয়ার্ডার আবার আসে আস্তে-আস্তে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমরা চাকর, কিন্তু আমরা জনগণের—আমরা—'

প্রায় মধ্যরাত্রে কয়েদখানার বারান্দাগুলো গোলমালে ও চলাচলে সজীব হয়ে উঠলো, ঝনঝনিয়ে উঠলো দরজা, জেগে উঠলো আতঙ্কময় কণ্ঠস্বর। কতগুলি পোশাকী ও বে-পোশাকী অফিসার রিভলবার তুলে ধরে এক দঙ্গল কয়েদীকে নিচে তাড়িয়ে নিয়ে চললো—সংখ্যায় ত্রিশ কি আরো বেশি। অলগাকেও টেনে নিয়ে গেলো তার কুঠুরি থেকে, সিঁড়ির উপর দিয়ে, টেনে, ছুটিয়ে। অলগা বেরালের মতো পাক খেতে লাগলো, চেষ্টা করতে লাগলো জেলারের হাত কামড়াতে। এক মুহূর্তের জন্যে সে একটা বাতাসে-ভাসা আকাশের ছবি দেখলো, চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা চৌকো উঠোনের উপরে আকাশ; হেমন্তের রাতের বাতাসের সজীবতায় ভরে গেলো তার বুক। তারপর—নিচু দরজা, কয়েকটা পাথরের ধাপ, স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধ ঘর, অনেকগুলি লোক; ইলেকট্রিক টর্চের আলোর ঝলক পড়ছে এসে ইটের দেয়ালে, বিবর্ণ মুখে, ভয়বিস্তৃত চোখের উপর···অনেকগুলো ক্রুদ্ধ ও কুৎসিত গর্জন, অনেকগুলো রিভলবারের গুলির শব্দ। যেন সমস্ত ছাদ এক্ষুনি ভেঙে ধ্বসে পড়বে। অন্ধ অন্ধকারের দিকে ছুটে গেলো অলগা। এক সেকেণ্ডের জন্যে ইলেকট্রিক টর্চের আলোয় দেখতে পেলো সে ভালকার বিকৃত মুখ। যেন কী একটা গরম জিনিস জোরে এসে লাগলো তার কাঁধে, পিঠ ছিঁড়ে বুক ভেদ করে লোহার মাকুর মতো গেলো বেরিয়ে···অলগা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো মাটির উপর, যে মাটিতে কাদা আর আগাছার গন্ধ।

পঞ্চম লালফৌজ কাজান দখল করলো, ভলগার উপর দিয়ে স্টিমারে করে পালালো চেকেরা, ছোড়ভঙ্গ হলো রাশিয়ানরা, লালের ভয়ে

শহরের অর্ধেক লোক পৃথিবীর আরেক প্রান্তে গিয়ে গা ঢাকা দিলে। কয়েক সপ্তাহের জন্যে এই সব পলাতকদের দেখা যেতো ভলগার দুই পারে, বৃষ্টিতে ফোলা, অনাহারে মৃতপ্রায়। এই সব পলাতকদের মধ্যে ভালকা একজন।

সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধেও অলগা রইলো বেঁচে। যখন গুলিকরা বন্দীদের দেহ ঘর থেকে বার করে আনা হলো ও বর্ষার আকাশের নিচে উঠোনের উপর সাজানো হলো পর-পর, তখন একজন অশ্বারোহী সৈন্য, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, গুঁড়ি মেরে বসলো অলগার পাশে, ধীরে তুলে ধরলো তার মুখ।

'বেঁচে আছে মেয়েটা। দেখ, দেখ, একটা ডাক্তার নিয়ে এসো।'

এই সেই লোক, ঝকঝকে যার দাঁত আর শ্যেনের মতো যার চক্ষু। মেয়েটাকে সে কয়েদীদের হাসপাতালে নিয়ে গেলো এবং সত্ত-অধিকৃত শহরের বিশৃংখলার মধ্যে ছুটে-ছুটে খুঁজে বেড়াতে লাগলো ডাক্তার, পুরোনো দিনের পাকা লোককেই তার দরকার। চিকিৎসাবিদ্যার এক প্রফেসারের ফ্ল্যাটে তীরবেগে ঢুকে পড়লো সে, তাকে এখুনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখালো, আর একটা মোটর-সাইকেলে চড়িয়ে নিয়ে এলো তাকে হাসপাতাল। হতচেতন অলগার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আমি চাই ও বাঁচুক।'

ফিরিয়ে আনা হলো তার জীবন। খুব খানিকটা ব্যাণ্ডেজ ও ওষুধের পর নীল চোখের পাতা মেলে ধরলো সে, আর তার মুখের উপর ঝুঁকে-পড়া শ্যেন চক্ষুকে যেন চিনতে পারলো।

'কাছে এসো।' বললে সে অস্ফুট গলায়, আর তার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করবার পর হঠাৎ বলে উঠলো অলগা, 'আমাকে একটা চুমু দাও।' বিছানার কাছে অনেক লোক; সময়টা যুদ্ধের; তবু সেই শ্যেনচক্ষু লোক খাঁখরে নিলো তার গলা, তাকালো চারদিকে।

'যাক গে যত সব—' কিন্তু সাহস হলো না তার, শুধু সে অলগার বালিশটা টান করে দিলো একটু।

সেই অশ্বারোহী সৈন্যের নাম এমেলিয়ানফ, কমরেড এমেলিয়ানফ। কী তার ক্রিশ্চিয়ান নাম জিগগেস করলে অলগা। ডিমিট্রি। তারপর সে চোখ বুজে ডাকতে লাগলো বারে-বারে, ডিমিট্রি। কাজানে এমেলিয়ানফের বাহিনীর জন্যে লোক জোগাড় করা হচ্ছে, সেই উপলক্ষে সে রোজ আসে অলগাকে দেখতে।
যখনই তাকে দেখে তখনই তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে ডিমিট্রি বলে, 'তোমাকে আমি বলছি, তুমি কেউটের মতো বেঁচে থাকবে। যখন তুমি ভালো হবে তখন আমি তোমাকে নেব আমার স্কোয়াড্রনে, তোমাকে করবো আমার পার্শ্বরক্ষী।' রোজ তাকে সে বলতো এ-কথা, আর অলগাও শ্রান্ত হতো না তা শুনতে। ডিমিট্রি হাসতো, ঝিকিয়ে উঠতো তার দাঁত আর একটি সুকোমল হাসি ভেসে উঠতো অলগার পাৎলা ঠোঁটের উপর। 'কেটে ফেলবো তোমার চুল, হালকা দেখে বুট কিনে দেবো এক জোড়া—এক জোড়া জোগাড় করেছি তোমার জন্যে, মরা এক ছাত্রের পা থেকে, তারপর জিনের ওপর তোমাকে বেঁধে দেব চামড়ার ফিতে দিয়ে, যাতে তুমি না পড়ে যাও···'

কেউটে ছাড়া আর কিছুই নয় অলগা। ও সব ঘটনার পর চোখ ছাড়া তার আর কিছু নেই—যেন নিদ্রাহীন জ্বালা, অস্থির তৃষ্ণা সেই চোখে। তার অতীত জীবন পড়ে রইলো পিছনে, স্মরণের দূর তীরে। তার বাবার সেই দাম্ভিক জাঁকালো বাড়ি, তার স্কুল, তার ভাবপ্রবণ ছাত্রী-বন্ধুর দল, রাস্তার উপরে লঘু তুষার, অভ্যাগত অভিনেতাদের নিয়ে মেয়েদের মোহ, রাশিয়ান সাহিত্যের সুন্দর অধ্যাপকের প্রতি আরাধনার

ভাব, স্কুলের গুপ্ত সমিতি, হের্টর্জেন পড়ে মশগুল হয়ে থাকা আর ক্লাবের কমরেডদের সঙ্গে উদ্বেলভাবে প্রেমে পড়া, রাশিয়ান ভাষায় বিদেশীদের উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হওয়া আর ক্নুট হামসুনের অশরীরী নায়কনায়িকাদের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা, মার্গেরিটের উপন্যাস পড়ে কৌতূহলকে উত্তেজিত করে তোলা—সব, সব পড়ে রইলো পিছনে। ও সব কি কিছুই ছিলো সত্যি? ক্রিসমাসের সময় নতুন পোশাক পাওয়া, কোনো ছাত্রের সঙ্গে একটু ক্রিসমাসী মূর্খতা, কাপড়ের খোলে তুলো ভরে কালো শিং লাগিয়ে মেফিস্টোফিলিস সাজা—কোথায় সে সব? তিরিশ ডিগ্রি বরফে ফুলের মৃত গন্ধ···সেই বিষণ্ণ নীরবতা···গির্জার ঘণ্টার শব্দ, ব্যস্ত রাস্তায় গলিত বরফে বাদামী রং···ভলগার পারে বাগান-বাড়ি, পাইন গাছ, যত দূর চোখ যায় বন্যার ফেনিল বিস্তার, আকাশে ভুর-করা পালক-পেলব মেঘ···এ সব অলগার স্বপ্নে মনে পড়তো, হাসপাতালের বালিশের গরমে, চোখের জলে ভেজা ছিলো যে-বালিশ। এই সব স্বপ্নে হঠাৎ আবির্ভাব হতো ভালকা—হাতে চাবুক, আর চাবুকের মুখে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা ভার বাঁধা। একবার গুণ্ডামির জন্যে ভালকাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো স্কুল থেকে, পরে স্বয়ংসেবক হয়ে গিয়েছিলো সে যুদ্ধের সম্মুখসীমানায়। বছর ঘুরতেই এলো ফিরে কাজানে, ল্যান্সারের পোশাকে হেঁটে বেড়াতো রাস্তায়, বুকে সেণ্ট জর্জের ক্রশ ঝুলিয়ে। লোকে বলে পুলিশ-ইনস্পেক্টর, ওর বাপ, জেলার প্রধান সেনাপতির কাছে এই বলে আবেদন করেছিলো যাতে ভালকাকে পাঠানো হয় খোদ যুদ্ধক্ষেত্রে, যেন সে নিশ্চিত মরে সেখানে, কেননা 'প্রপীড়িত বাপের চোখে পাষণ্ডের বাঁচার চেয়ে মরাও শতগুণে কাম্য।' লোভী, অনবরত ফুর্তির দিকে ঝোঁক, পাপের মতো নির্ভয় এই ভালকা। যুদ্ধ তাকে অনেক কায়দা-কৌশল শিখিয়েছে, শিখিয়েছে রক্তে আছে টকো গন্ধ, আরো দু-একটা জিনিস। বিপ্লব তাকে ছেড়ে দিয়েছে

উচ্ছৃংখল করে।

অলগার স্বপ্নের রঙিন তুষার ভালকার পাঁচ পাউণ্ড ওজনের বাড়িতে টুকরো-টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেলো। সেই তুষার ছিলো ভয়ংকর হালকা, আর তারই উপরে অলগা তৈরি করতে চেয়েছিলো তার ভবিষ্যতের ভিত্তি : বিয়ে, ভালোবাসা, ছেলেপিলে, সুখী স্থায়ী ঘর। সেই বরফের নিচে লুকিয়ে ছিলো চোরা সমুদ্র। গুঁড়ো হয়ে গেলো সেটা—এবং জীবন, নিষ্ঠুর ও উদ্বেল, কালো ফেনিল তরঙ্গের মতো ভেঙে পড়লো তার উপর।

অলগা তাই স্বীকার করে নিলো তাকে, নিষ্ঠুর একটা সংগ্রাম (দু-দুবার তাকে খুন করতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারেনি, তাই তার আর এক ফোঁটাও ভয় নেই) প্রাণভরা ঘৃণা, দৈনিক প্রয়োজন মেটাতে রুটির একটা খণ্ড, আর অনাস্বাদিত প্রেমের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই জীবন। এমেলিয়ানফ আসে, বসে তার খাটের পাশে। অলগা পিঠের নিচে বালিশ রেখে সরু আঙুলে কম্বলের কোণ মুড়তে-মুড়তে সরল বিশ্বাসের চোখে তার দিকে চেয়ে বলে, 'আমি কল্পনা করতুম আমার স্বামীকে, সুন্দর দেখতে, মাথা-ভরা চুল—আর আমার পরনে রঙচঙে ড্রেসিং-গাউন, বসেছি দুজনে আমরা প্রাতরাশের টেবিলে, আর কিছু নয়···ঐ তো সুখ! এখন ঘেন্না হচ্ছে সেই মেয়েটাকে। রঙিন ড্রেসিং-গাউন পরে কফি-কাপের আড়ালে বসে সুখ খোঁজে, অলস, মূর্খ কোথাকার।'

এমেলিয়ানফ তার গল্প শোনে আর নিজের পাঁজরার উপর ঘুসি মেরে হাসে। বুঝতে পাচ্ছে না অলগা, কিন্তু যেন মিশে যাচ্ছে সে এমেলিয়া-নফের অস্তিত্বে। তার এখন শুধু এক ইচ্ছা, ঘৃণ্য এই হাসপাতালের বিছানা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া নিজেকে। চুল কেটে ফেললো সে। যেমন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, এমেলিয়ানফ তার জন্যে সৈন্যের খাটো

কোট এনে দিলো, নীল ব্রিচেসের উপর লাল সুতোর ডোরা, আর এক জোড়া হালকা ঘোড়সওয়ারের বুট।

নভেম্বরে অলগা হাসপাতাল ছাড়লো। তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু নেই শহরে। নির্জন রাস্তা ও পরিত্যক্ত দোকানের উপরে কালো আকাশ বেয়ে উত্তুরে মেঘ ছুটোছুটি করছে, মারছে বৃষ্টি ও বরফের চাবুক। এমেলিয়ানফ কাদার মধ্য দিয়ে দ্রুত পায়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে খালি ঘর, এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। ভারী ভেড়ার চামড়ার কোটে ও বুটে, মৃত ছাত্রের পা থেকে তুলে আনা সেই বুট, অলগা যাচ্ছে তার পিছে-পিছে, কাঁপছে তার হাঁটু, কিন্তু ভেঙে মরে যাবে তাও ভালো তবু ডিমিট্রি এমেলিয়ানফের বেশি পিছনে পড়ে থাকবে না। কমরেড জোটোভার জন্যে এক্সিকিউটিভ কমিটির থেকে এমেলিয়ানফ জোগাড় করেছে জায়গা পাবার হুকুম—জোটোভা, শ্বেত ফৌজের হাতে লাঞ্ছনা যার উঠেছে গিয়ে চরমে, আর এমেলিয়ানফ দৃঢ়সংকল্প, যে করে হোক সাধারণের থেকে ভালো এমন কোনো জায়গা বের করবেই সে খুঁজে-পেতে। অবশেষে ঠিক করলো একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাতে গ্রীক থাম আর ঘষা কাচের জানলা। যেটা ছিলো আগে কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর, ফেলে চলে গেছে পালিয়ে, সেটাই সে তলব করলে। খালি ও খোলা সব ঘরের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, রঙ-করা শিলিঙ আর সোনালি পালিশের আসবাব ন্যাড়া হয়ে পড়ে আছে, নেই আর এক আঁশ লেস বা কার্পেট। ঝাড়লণ্ঠনের বেলোয়ারী ঝালর বাজছে মৃদু-মৃদু, হয়তো বা ব্যথিত কান্না। বাগানে শুকনো লেবু গাছের ডালগুলি শনশনিয়ে উঠছে। লাথি মেরে এমেলিয়ানফ খুললো ভেজানো দরজা, বললে, 'দেখ, কী নোংরা করে রেখেছে! এই করেই দেখাতে চেয়েছে ওরা বুর্জোয়াদের উপর রাগ!'

নাচের ঘরে সে ভেঙে ফেললো অর্গ্যানটা, ওক কাঠের তৈরি, আর

সে-সব কাঠ জড়ো করলো এক কোণের ঘরে, যেখানে আছে আগুন জ্বালবার জায়গা। কয়েক মিনিট পরেই ফুর্তি করে জ্বলতে লাগলো আগুন।

'এখানে তুমি তোমার জল গরম করতে পারো, পেতে পারো তোমার আলো আর তাপ। বুর্জোয়ারা জানতো বটে, কী করে থাকতে হয় আরামে।'

ওকে এনে দিলো একটা টিনের কেটলি, চায়ের বদলে কিছু 'ক্যারট', শস্যের কিছু দানা, কিছু চর্বি আর আলু—প্রায় দিন পনেরোর মতো খাবার—আর অলগা থাকলো সে-ঘরে একলা, শূন্য অন্ধকার যে-ঘর, খোলা চিমনির ভিতর দিয়ে যেখানে হাওয়া চেঁচাচ্ছে, যেন, বাড়ির আগেকার মালিকদের প্রেতাত্মা বৃষ্টিতে ছাদে বসে কাঁদছে গুমরে-গুমরে।

অলগা ভাববার সময় পেয়েছে প্রচুর। চেয়ারে বসে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে চুপচাপ, কেটলিটা যেখানে সবে সুরু করেছে তার গান, ভাবে ডিমিট্রি আজ রাতে আসবে কিনা। যদি আসে কী ভালো যে হয়, সেদ্ধ আলুর তবে ভাগ পায় ঠিক সময়। যেন শুনতে পেলো পায়ের শব্দ, দূরে, কাঠের মেঝের উপর যেন বাজলো তার প্রতিধ্বনি—তারপর সত্যিই সে এলো, খুসিতে উজ্জ্বল তার চোখ—যেন তার সঙ্গে ফিরে এলো অলগার সমস্ত প্রাণ। সে রাখলো তার রিভলভার, দুটো হাতবোমা, ভেজা ওভারকোটটা খুলে ফেলে দিলো ছুঁড়ে। জিগগেস করলো, সব ঠিক আছে কি নেই, লাগবে নাকি কোনো কিছু।

'একটা জিনিস শুধু, তোমার কাশিটা সারিয়ে ফেল, যেন কফে আর এক বিন্দুও রক্ত না থাকে। নতুন বছরে তুমি ঠিক ভালো হয়ে-যাবে।'

চা খেয়ে ও নিজে একটা সিগারেট বানিয়ে সে বললে এবার যুদ্ধের খবর, ঘোড়-সৈন্যদের যুদ্ধের বর্ণনা দিলে হুবহু, এবং বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে এত সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে অলগার ভয় করতে লাগলো তার ঐ

চোখের দিকে তাকাতে।

'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—মানে, পরিখার যুদ্ধ—বড় একঘেয়ে, কোনো উৎসাহ নেই, মরাটা পর্যন্ত বিস্বাদ।' এমেলিয়ানফ দাঁড়ালো ঘরের মধ্যিখানে, দুই পা ঈষৎ বিস্তৃত করে, হাতে নগ্ন একটা তলোয়ার নিয়ে। 'বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এই ঘোড়-সৈন্য। ঘোড়া—ঘোড়া হচ্ছে প্রকৃতির প্রাণবস্তু। ঘোড়ায় বসে আক্রমণ ঠিক যেন একটা বিপ্লবের ঝড়। হাতে এই একটা রিক্ত তলোয়ার নিয়ে আমি ঢুকে পড়ি সৈন্যব্যূহে, বন্দুকের ঝাঁকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি।...শত্রু দাঁড়াতে পারে আমার মুখের সম্মুখে? পারে না। ভয়ে সে ছুট দেয়, আমি তাকে টুকরো-টুকরো করে কাটি, আমার পিঠে হঠাৎ পাখা গজায়। তুমি জানো, কেমন এই ঘোড়-সৈন্যদের যুদ্ধ? এক লাভাস্রোতের বিরুদ্ধে আরেক লাভাস্রোতের—কোনো গুলি-গোলা নেই। ভীষণ গর্জন...মনে হবে যেন নেশা ধরেছে তোমার—তারপর মেশে দুই স্রোত। এক মিনিট, খুব বেশি হলে হয়তো দুই... কেউ থাকতে পারে না টিকে...শত্রুর চুল খাড়া হয়ে ওঠে, আর সে ঘোড়া নিয়ে পিছু পালায়। তখন আর কিছুই করবার থাকে না, শুধু পিছু নাও আর মারো। বন্দী করা নেই একদম।'

ইস্পাতের মতো জ্বলতে লাগলো চোখ, ইস্পাতের মতো তার তলোয়ার জ্বললো আকাশে। আবেগে জমে গিয়ে শুনলো অলগা, একদৃষ্টে তাকালো তার দিকে, হাঁটুর উপর কনুই রেখে, হাতের উপর চিবুক। মনে হলো যদি সেই লিকলিকে তলোয়ার তার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত করে দিতো এখন, তবুও সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতো—এমন ভালোবেসেছে সে এমেলিয়া-নফকে।

কিন্তু তার সারল্যের প্রতি এমেলিয়ানফের এত সম্মান কেন? অলগার জন্যে সে কি করুণা ছাড়া আর কিছুই বহন করে না? রাস্তায়-পাওয়া কুকুরের মতো সে কি এতই অনাথ যে দয়া ছাড়া আর কিছুই তাকে

দেবার নেই ? মাঝে-মাঝে তার চোখে দেখেছে যেন একটা বাঁকা দৃষ্টি, শুধু ভ্রাতৃস্নেহের মানে দিয়ে তাকে ঠিক বোঝানো যায় না। তার গাল দুটো গরম হয়ে উঠলো, কোথায় লুকোবে সে মুখ, যেন তার হৃদয় খসে পড়ছে এক প্রমত্ত অতলে। কিন্তু না—পকেট থেকে মস্কোর একটা কাগজ তুলে নিয়ে এমেলিয়ানফ বসলো আগুনের সামনে ও পড়তে সুরু করলো বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ। প্রবন্ধে খুলে দেখিয়েছে এদের স্বরূপ, জর্জর করে দিয়েছে অভিশাপে। পা ঠুকে বলে সে খুসি হয়ে: 'শয়তানের দল ! কী চমৎকার লেখা ! যদি আমাদের গুলি না থাকে, ওদের আমরা শুধু কথা দিয়ে ঘাল করবো।'

এলো শীত। অলগার স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো তাড়াতাড়ি। এক দিন খুব ভোরে, প্রায় ভোর হবারো আগে, এমেলিয়ানফ তার ঘরে এসে বললে, 'পোশাক পরো।' তাকে সে নিয়ে গেলো শহরের স্কোয়ারে, দিলো তাকে ঘোড়া-চড়ার প্রথম পাঠ। হালকা বরফের নরম কুঁচি পড়ছে মাঠময়। শাদা মাঠের উপর দিয়ে অলগা চললো ঘোড়ার পিঠে, পায়ে-পায়ে পড়ে থাকছে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। 'কী করছ তুমি।' চেঁচিয়ে উঠলো এমেলিয়ানফ: 'তুমি একটা কুকুরের মতন বসে আছ, বেড়ার গা ধরে যেমন বসে। পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো উঁচু করে তুলে ধরো, পিছন দিকে ঝুঁকে থেকো না।' অলগার ইচ্ছে হলো হেসে উঠতে, কিন্তু তার কানে বাতাস গান গাইছে আর তার চোখের পাতায় লেগে আছে বরফের কুচো।

৩

সেই পলকা মেয়ের ঠুনকো শরীরে কী অসীম শক্তি ছিলো লুকিয়ে কোত্থেকে যে এলো কে বলবে। শহরের ময়দানে এক মাসের শিক্ষা-নবিশির পর শীতের বাতাস তার গালে নিয়ে এলো স্বাস্থ্যের আভা। এমেলিয়ানফ বলতো, 'প্রথম দেখলে মনে হবে তুমি ওকে দুখণ্ডে ভেঙে ফেলতে পারবে, কিন্তু আমি কখনোও সাহস করবো না।' আর, তাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত রকম সুন্দর, যখন তাকে ব্যারাকের ধোঁয়াটে পরিবেশের মধ্যে দেখা যেতো, লম্বা ও ছিপছিপে, কাঁধে ঘন চুলের গুচ্ছ, গায়ে খাটো কোট, কোমরে চামড়ার বেল্ট আঁটা, তখন যুবক ঘোড়-সৈন্যেরা তাকিয়ে থাকতো তার দিকে, আর বুড়োদের দেখাতো কেমন মনমরা।

তার হালকা দুটি হাত শিখে নিয়েছিলো কী করে ঘোড়া চালাতে হয়, ওদের মর্জি দেখে, বুদ্ধি খাটিয়ে। ওর পা, যা মধ্যবিত্ত নাচ ও সিল্ক স্কার্ট ছাড়া আর কোনো কাজে লাগেনি, হয়ে উঠলো সবল ও সুগঠিত। ওর মুঠোর জোর দেখে এমেলিয়ানফ অবাক হয়ে যেতো, জিনের উপর বসতো জোঁকের মতো, ঘোড়াটা ব্যবহার করতো যেন ভেড়া। কী করে তলোয়ার চালাতে হয় তাও নিয়েছিলো শিখে, আর যখন ঘোড়া নিয়ে পুরোদমে ছুটেছে তখন দু-আলাদা করে কেটে ফেলতে পারতো সে গাছের ডাল। কিন্তু, যাই বলো, পারতো না জোরে আঘাত করতে ; আঘাতের সমস্ত জোর আসে কাঁধের থেকে, আর ওর কাঁধ মেয়ের কাঁধ।

রাজনীতিক বিষয়ে পারো না তাকে বোকা বলতে। তার বুর্জোয়া মনোভাবের কথা ভেবে এমেলিয়ানফের অল্প-অল্প ভয় ছিলো—সেই সময়কার সরকার সেই মনোভাবের উপর ছিলো নৃশংস নিষ্ঠুর। 'কমরেড জোটাভা, শ্রমিক ও কৃষক লালফৌজের কী উদ্দেশ্য ?' অলগা লাফিয়ে

উঠতো আর বলতো একটুও হোঁচট না খেয়ে, 'ধনিক, জমিদার ও ধার্মিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজর্জর মানুষের সর্বগত সুখের সন্ধান।' এমেলিয়ানফের অধীনে যে সেনাদল, তাতে একজন প্রাইভেটরূপে জোটোভাকে ভর্তি করা হলো। ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেন-বোঝাই হয়ে সেই দল গেলো ডেনিকিনের যুদ্ধক্ষেত্রে।

যখন নামলো তারা গাড়ি থেকে, ঘোড়ার লাগাম ধরে অলগা দাঁড়ালো একবার চুপচাপ। স্টেশনের বাইরে কাদা-মাখা নোংরা বরফ, বসন্ত—সূর্যাস্তে লাল আর নীল আকাশের দিকে তাকালো সে সতৃষ্ণের মতো, কান পেতে শুনলো দূর বন্দুকের গর্জন, মনে জ্বলে উঠলো তার অদূর অতীতের ছবি, অমার্জনীয় অন্যায় ও প্রতিহিংস্র ঘৃণার অনলে।

'রাখো সিগারেট খাওয়া ! ওঠো ঘোড়ার ওপর।' শোনা গেলো এমেলিয়া-নফের কণ্ঠস্বর। অলগা লাফিয়ে উঠলো তার জিনে, তলোয়ারটা বাড়ি খেলো তার উরুর উপর। এখন আসুক দেখি কেউ তাকে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের ভার-বাঁধা চাবুক নিয়ে ভয় দেখাতে, নিয়ে যেতে তাকে অন্ধকার কয়েদখানায় ! 'ছোটো।' এলো হুকুম। জিনগুলো আওয়াজ করে উঠলো, অলগার কানের মধ্যে কনকনিয়ে উঠলো ভেজা হাওয়া, সূর্যাস্ত-আভার দিকে তুলে ধরলো সে তার চোখ···'ঘোড়াগুলি এখন উচ্ছৃংখল, সমুদ্রের পার ছাড়া আর তারা থামবে না কোথাও।' সানন্দ সঙ্গীতের মতো কানে লাগলো তার প্রিয়বন্ধুর সেই কথা। এবার সুরু হলো তার সামরিক জীবন।

দলের লোকেরা অলগাকে এমেলিয়ানফের স্ত্রী বলে উল্লেখ করতো। কিন্তু সে তার স্ত্রী ছিলো না—হয়ওনি। কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না তা, হয়তো তারা হেসে কুটিকুটি হয়ে যেতো যদি সত্যিই জানতো যে অলগা

এখনো কুমারী। যাই হোক, যা তাই; অলগা আর এমেলিয়ানফ কাউকে কিছু বলতো না। বরং তাকে স্ত্রী বলে ভাবাটাই অনেক সহজ তার পক্ষে, কেউ তাই ছুঁতে আসতো না তাকে, সবাই জানতো এমেলিয়ানফের ঘুসির কী ওজন, অনেকবারই তা প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই জোটোভা সবাইর কাছে 'ছোটো ভাই'।

পার্শ্বরক্ষীর কর্তব্যের খাতিরে জোটোভাকে থাকতে হতো সেনাপতির সঙ্গে-সঙ্গে। অভিযানের সময় সে একই ঘরে শুতো তার সঙ্গে, এমন কি অনেক সময় একই বিছানায়। এমেলিয়ানফের মাথা এক প্রান্তে, অলগার আরেক; কম্বলের বদলে দুজনের গায়েই ভেড়ার চামড়ার কোট। দীর্ঘ, শ্রান্ত দিনের পর, প্রায় পঞ্চাশ মাইল আবৃত করে এসে, অলগা প্রথমে তার ঘোড়ার তদারক করে, সর্বজনীন পাত্র হতে কিছু খাবার তুলে খায়, তারপর, বুট খুলে ফেলে গরম শার্টের কলার খুলে ফেলে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে, কখনো বা স্টোভের উপর। এক দিনও শোনেনি সে এমেলিয়ানফকে শুতে আসতে, বা উঠে যেতে। একটা বন্যপশুর মতো এমেলিয়ানফ ঘুমোয়—কিছুক্ষণ, আর ততক্ষণ, এক কানে শোনে সে রাত্রির গুঞ্জন।

অলগার প্রতি তার ব্যবহার ছিলো অপক্ষপাতভাবে কঠোর, অন্যের চেয়ে তার বেলায় বা সে বেশি কড়া। এত দিনে অলগা বুঝতে পেরেছে তার শ্যেন চক্ষুর শক্তি, এ হচ্ছে যুদ্ধের চাউনি। তার অমায়িকতা, তার হাসির জন্যে আগ্রহ, খসে গেছে তার স্বভাব থেকে, যেমন গা থেকে খসে গেছে বাড়তি চর্বি। রাত্রিতে সে ঘুরে-ঘুরে দেখে, ঘোড়াগুলোকে ঠিকমতো রাখা হয়েছে, ঘুমিয়েছে সৈন্যেরা, ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পাহারা, তারপর ঢোকে এসে সে তার ঘরে, শ্রান্ত, গায়ে ঘামের গন্ধ, বেঞ্চির উপর বসে বুট খুলে ফেলে। এক পা থেকে আদ্ধেক বুট-খোলা অবস্থায় কখনো-কখনো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর বিছানার কাছে সরে এসে অলগার

শীতপীড়িত দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, রমণী অথচ যেন শিশু। তার চোখে ছেয়ে আসে কুয়াশা, ঠোঁটের উপর স্নিগ্ধ একটি হাসি। কিন্তু যদি কোনো দিন অলগা ভুল করতো তা হলে নিশ্চয়ই সে তাকে ক্ষমা করতো না।

ডিভিসনের অধিনায়কের কাছে জোটোভা এক দিন কতকগুলি কাগজ নিয়ে যাচ্ছিলো। মাঠের উপর দিয়ে জোরে হাওয়া বইছে, ঘাসগুলো একবার হচ্ছে সবুজ, আর একবার শাদাটে। উপরে নির্মেঘ আকাশ পাখির গানে মুখর। ঘোড়া আস্তে-আস্তে চলেছে। ছুটে যাচ্ছে ছোট-ছোট হলদে কাঠবিরালি। এমন সকালে এ সহজেই ভুলে যাওয়া যায় যে চলেছে কোথাও যুদ্ধ, শত্রু আসছে এগিয়ে আর তাদেরকে ঘিরে ধরছে, পদাতিক সৈন্য যুদ্ধ করবে না অথচ ভেঙে ফেলবে তাদের রেলগাড়ি, শহরে দুর্ভিক্ষ আর গ্রামে মারপিট। আগের মতোই বসন্ত ধরণীকে সুন্দর করে সাজিয়েছে, আবার তেমনি হৃদয়ে আনছে স্বপ্নের উত্তেজনা। খারাপ খাওয়ার জন্যে সমস্ত গায়ে যার ঘাম সেই ঘোড়াটা পর্যন্ত অদ্ভুত আওয়াজ করছে, ঘন চক্ষু দিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে, যেন কিছুটা আমোদ ও খেলার জন্যে সে উৎসুক।

ছোট একটা হ্রদের ধার দিয়ে তার রাস্তা, আগাছা-গজানো হ্রদ, জলে চা-খড়ি পারের ছায়া পড়েছে। ঘোড়া পথ বদলে এগুলো জলের দিকে। জোটোভা নেমে পড়ে ঘোড়ার মুখ থেকে লাগাম খুলে দিলো, দিলো তাকে জল খেতে, আর যেই তার ঠোঁট জল ছুঁয়েছে অমনি সে মাথা তুলে কাঁপা-গলায় ছাড়লো একটা ক্ষিপ্ত শব্দ—অমনি হ্রদের আরেক প্রান্তে আগাছার আড়াল থেকে আরেকটা ঘোড়া তার প্রতিধ্বনি করলে। জোটোভা তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে নিয়ে উঠলো জিনের উপর, তার চোখ সেই দিকে যেদিক থেকে উঠেছে ঐ হ্রেষা। আগাছার

আড়ালে দুটো মাথা যেন দেখা যাচ্ছে, দু'জন ঘোড়সওয়ার উঠে দাঁড়ালো এসে পারের উপর, আর থামলো তাকে দেখে। নিশ্চয় টহলে বেরিয়েছে, কিন্তু এরা কারা ? লাল না শাদা ?

একটা ঘোড়া পায়ের থেকে মাছি তাড়ালো লেজ ঘুরিয়ে মাথাটা ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে আর সঙ্গে-সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে সওয়ারও টাল সামলালো লাগাম ধরে, আর রদ্দুরে ঝিকমিক করে উঠলো তার কাঁধের কাছে ছোট্ট একটি সোনালি চিহ্ন। 'শাদা!' তলোয়ার দিয়ে অলগা ঘা দিল ঘোড়াকে, আর ঘোড়াটা উড়াল দিলো। অনুসরণের শব্দ ছুটলো তার পিছনে—তারপর, গুলি···। অলগা তাকালো পিছন ফিরে, একজন ডাইনের দিকে বেরিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে, গ্রেহাউণ্ডের মতো ছুটছে তার কসাক ঘোড়া। আবার গুলি···। লাগাম ছেড়ে দিয়ে অলগাও তার রাইফেল তুলে নিলো। লাল ঘোড়ার সওয়ারটা এসে পড়েছে প্রায় ত্রিশ হাতের ব্যবধানের মধ্যে। 'থামো, দাঁড়াও।' লোকটা তলোয়ার ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আর কেউ নয়, ভালকা ব্রিকিন। নিমেষে অলগা চিনতে পারলো তাকে, ঠেলে দিলো ঘোড়াকে, লাফিয়ে এগিয়ে গেলো তার সংবর্ধনায়। তুললো তার রাইফেল আর মুহূর্তে তার জলন্ত হিংসা গুলির আকারে বেরিয়ে এলো। কসাক ঘোড়া ঘুরে পড়লো মাটির উপর আর তার তলায় চাপা পড়লো তার আরোহী।

'ভালকা! ভালকা!' চেঁচিয়ে উঠলো সে তীব্র আনন্দে। আর তখুনি দ্বিতীয় লোকটা প্রায় ধরে ফেললো তাকে। দেখলো তার ঝুলন্ত গোঁফ, ঢেলার মতো চোখ, বিস্ময়ে একেবারে গোল। 'মেয়েলোক!' আর তার উত্তোলিত তলোয়ার দুর্বলের মতো লাগলো এসে অলগার বন্দুকের নলে। তাকে পেরিয়ে চলে গেলো সে তখুনি। অলগা দেখলো হাতে তার আর বন্দুক নেই, হয় সে কখন ছুঁড়ে দিয়েছে বা ফেলে দিয়েছে (পরে

এই গল্পটা বলবার সময়ও সে ঠিক মনে করতে পারেনি) হাত বাড়িয়ে অনুভব করলো একবার তার তলোয়ার, তারপর খাপ থেকে টেনে তুলে চীৎকার করে উঠলো, আর ছুটন্ত ঘোড়া ধরে ফেললো সেই লোকটাকে। যত জোর তার আছে সব দিয়ে অলগা মারলো সেই তলোয়ার। দু'হাত একসঙ্গে ঘাড়ের উপর চেপে ধরে লম্বা গোঁফওয়ালা লোকটা গুটিয়ে ছোট হয়ে গেলো।

অলগার ঘোড়া জোরে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে অলগাকে নিয়ে এলো ঘেসো ঢালের উপর। তলোয়ারের বাঁট তখনো দৃঢ় মুঠে ধরে আছে অলগা। খাপে যেন চট করে চাইছে না ঢুকতে। অনেকবারের চেষ্টায় তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে অলগা ঘোড়া থামালো, তাকালো চার দিকে। বাঁয়ে, সেই হ্রদ আর তার ধারে সেই চা-খড়ির পার। যত দূর চোখ যায় প্রান্তর শূন্য, কেউ আর পিছু নেয়নি তার, গুলিগোলা থেমে গেছে। আকাশের উজ্জ্বল নীলে লাগছে এসে লার্কের ডাক, এমন মিষ্টি আর সুন্দর লাগছে, যেমন মিষ্টি আর সুন্দর লেগেছিলো সেই ছেলেবেলায়। আঙুল দিয়ে গলার কাছে শার্টটা চেপে ধরে অলগা চাইলো নিজেকে শাসন করতে, কিন্তু পারলো না—চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়লো। আর সে জিনের উপর বসে কাঁদতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো।

এমনি অনেকখানি রাস্তা সে চললো চোখ মুছতে-মুছতে, কখনো এ-হাতে, কখনো ও-হাতে।

দলের লোকেরা একশো বার করে গল্প শুনবে জোটোভার। তারা হাসে, মাথা নাড়ে, বিকট চীৎকার করে ওঠে।

'কী লজ্জা! দু'দুটো লোকের বিরুদ্ধে একটা মেয়ে।'

'দাঁড়াও। ফের বলো—ও তোমাকে ধরে ফেললো আর বলে উঠলো : "মেয়েলোক"!'

'গোঁফগুলি লম্বা?'

'চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে ?'
'হাত উঠলো না কিছুতেই ?'
'উঠবে কি করে ?'
'আর সেই মুহূর্তে তুমি মারলে ওর ঘাড়ের উপর ! আমি মরে যাবো হাসতে-হাসতে। তারপর কী করলে ?'
'বিশেষ কিছু না।' বললে অলগা, 'যা সবাই করে—তলোয়ারটা মুছলাম আর চিঠি পৌঁছে দিতে গেলাম হেডকোয়ার্টার্সে।'

এই অভিযানের জীবনে একটা ভারি অসুবিধে ছিলো অলগার, সে তার লজ্জাকে কিছুতেই বশ মানাতে পারছিলো না। বিশেষ করে যখন কোনো গ্রীষ্মের দিনে সৈন্যরা একত্র হয় নদীতে বা হ্রদে, গা থেকে খুলে ফেলে সব কাপড়চোপড়, হাসে, শব্দ করে, অনাবৃত ঘোড়ার উপর পা ছড়িয়ে বসে জলে নেমে পড়ে, তখন তার বিরক্তির অবধি থাকে না। নিজের জন্যে জোটোভাকে বেছে নিতে হয় একটি ঢাকা ঘেরা জায়গা, আগাছা বা ঝোপের আড়াল।
'বোকার মতো ব্যবহার কোরো না বলছি, তোয়ালে জড়িয়ে চলে এসো আমাদের সঙ্গে।'
পরিচ্ছন্নতার দিকে এমেলিয়ানফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যারা ঘোড়ার সওয়ার তারা শরীরের যত্ন নেবে বেশি ও বিশেষ করে, তাই শীত কি গ্রীষ্ম, সবাইকে সে বলতো ঠাণ্ডা জলে গা রগড়াও আর সুবিধে পেলেই সকালে অন্তত পনেরো মিনিট ব্যায়াম করো।
ঠাণ্ডা জলে গা রগড়ানোও অলগার পক্ষে অসুবিধে। উঠতে হয় সবার আগে, শিশিরে-ভেজা ঠাণ্ডা ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে যেতে হয় কুয়োর দিকে, তখন কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভোরের লালিমা দেখা যায় কি না যায়। এক দিন এক বালতি বরুফে জল তুলে কুয়োর ধারে রেখে সে বিবসন

হয়েছে, কাঁপছে সর্বাঙ্গে, হঠাৎ মনে হলো কে যেন অত্যন্ত আলগোছে ছুঁয়েছে তার পিঠ।

ঘুরে তাকালো সে আচমকা। ঘরের দরজার ধারে ডিমিট্রি, অদ্ভুত অথচ স্থির চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আস্তে-আস্তে অলগা চলে গেলো কুয়োর ও-পাশে, উবু হয়ে বসলো সেখানে, যাতে তার বড়-বড় অনিমেষ চোখ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এ যদি আর কোনো কমরেড হতো, সে খেঁকিয়ে উঠতো : 'চোখ মেরো না বলছি, পালাও এখান থেকে।' কিন্তু এখন আবেশে ও লজ্জায় গলা তার কাঠ হয়ে গেলো। এমেলিয়ানফ ঘাড় বাঁকালো, হাসলো, চলে গেলো ভিতরে।

ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু সেই থেকে সবই গেলো বদলে। সব হঠাৎ জটিল হয়ে উঠলো, নিতান্ত যা সাধারণ, তাও। স্কোয়াড্রন অর্ধ-দগ্ধ এক গ্রামে রাতের জন্য দাঁড়ালো বিশ্রাম করতে। আর-আর রাতের মতো অলগা আর এমেলিয়ানফকে অংশ নিতে হলো এক বিছানার। সে-রাত্রে খাটের অন্তিম প্রান্তে শীর্ণ হয়ে শুলো অলগা, গায়ে একটা ঘোড়ার চামড়ার কম্বল, ঘোড়ার গন্ধে ঘোরালো, যত জোরেই সে চোখের পাতা চেপে থাক না কেন ঘুমুতে পারলো না এক ফোঁটা। অথচ শুনলো না কখন ঘরে ঢুকলো এমেলিয়ানফ। ভোর হলে যখন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙলো, তখন দেখলো এমেলিয়ানফ দরজার পাশে মেঝের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের সম্পর্কের সে-সারল্য গেছে অন্তর্হিত হয়ে। যখন ডিমিট্রি কথা বলে, তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে। দুজনেই তারা মুখোস পরেছে যেন। অথচ, আশ্চর্য, সমস্তক্ষণ অলগা যেন আনন্দে আধ-মাতাল।

সত্যিকারের যুদ্ধে নামেনি এখনো অলগা। তাদের রেজিমেণ্ট এখন উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছে, ডিভিসনের বাকি অংশের সঙ্গে। ছোট-খাটো মারামারির সময় অবশ্যি থেকেছে সে দলপতির পাশে-পাশে।

কিন্তু হঠাৎ এখন ঘোরতর কিছু একটা ঘটেছে যুদ্ধ-সীমানায়, তাদের কানে এসে পৌছুলো অনেক আতঙ্কিত গুজব। আদেশ হলো, শত্রুর ব্যূহ ভেঙে দিতে হবে, পশ্চিম বাহু, তারপর ফের ফিরে আসতে হবে নিজের জায়গায়। এই অলগা প্রথম বুঝলো আক্রমণের স্বাদ। তখুনি রওনা হয়ে গেলো তারা, সর্বাগ্রে এমেলিয়ানফের দল। রাত্রে এক জঙ্গলে তারা গা ছড়ালো, আলো জ্বেলে, ঘোড়াগুলোকে বে-লাগাম করে। কোমল কোলাহল করে গরম বৃষ্টি ঝরে পড়লো গাছে-গাছে, এত অন্ধকার যে নিজের প্রসারিত হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। অলগা বসেছিলো একটা গাছের গুঁড়ির উপর, কাঁধের উপর টের পেলো হঠাৎ কে হাত রেখেছে। চকিতেই বুঝতে পারলো সে, হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এবং তাকিয়ে দেখলে একবার অন্ধকারে। তার দিকে ঈষৎ নুয়ে পড়ে ডিমিট্রি জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় পাওনি তো?···বহুৎ আচ্ছা···থেকো আমার পাশে-পাশে।'

চাপা গলায় আদেশ দিলো সৈন্যদের আর সৈন্যেরা মুহূর্তে ঘোড়ার উপর চেপে বসলো। অন্ধকারে একমাত্র অচেতন বুদ্ধিবলে ঘোড়াকে সিধে চালিয়ে নিয়ে গেলো অলগা, তার রেকাব দিয়ে স্পর্শ করলো ডিমিট্রির পা। ঘোড়ার খুরের নিচে জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো, কোত্থেকে জঙ্গুলে আগাছার গন্ধ লাগলো নাকে। তখন, কতক্ষণ পরে, খোলা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট আলোর রেখা ফুটতে লাগলো, বনের গভিরতা এলো তরল হয়ে। হঠাৎ, তাদের অত্যন্ত কাছে, যেন কতকগুলো আগ্নেয় সূচীমুখ অন্ধকারকে বিদ্ধ করতে লাগলো, পাইন-গাছের ভিতর থেকে শোনা গেলো জোর গর্জন। এমেলিয়ানফ চেচিয়ে উঠলো : 'খোলো তলোয়ার, চলো এগিয়ে।'

ভিজা গাছের ডাল মুখে এসে লাগছে অলগার, গাছের ছালের গায়ে-গায়ে ঘেঁষড়ে যাচ্ছে তার হাঁটু, ঘোড়াগুলি নাকের ভিতর দিয়ে ক্রুদ্ধ

আওয়াজ করতে-করতে ঘনিয়ে আসছে পাশাপাশি।…ধোঁয়াটে মাঠ সামনে প্রসারিত—ঘোড়সওয়ারের ছায়া পেরিয়ে যাচ্ছে তা লাখে-লাখে। পরে এলো তারা যেখানে, সেটা নদীর খাড়া পার। ঘোড়ার মাংসল পাঁজরাতে অলগা ডুবিয়ে ধরলো তার জুতোর গজাল, ঘোড়া নিজেকে ঘনীভূত করে লাফিয়ে পড়লো নদীর মধ্যে।…

শত্রুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করলো রেজিমেণ্ট। অন্ধকারে, আনত মেঘের নিচে, অনবরত ছুটিয়ে চললো ঘোড়া, পাঁচশো ঘোড়ার খুরের শব্দে শূন্যপ্রান্তর ধ্বনিত হতে লাগলো। প্রচণ্ড ফুৎকারে বেজে উঠলো শিঙা, নামলো সবাই ঘোড়া থেকে। কাঁধের আর টুপির ব্যাজ দেয়া হলো সবাইকে। বললে এমেলিয়ানফ, 'লেফটেনাণ্ট-জেনারেল ব্যারন ভ্রাঙ্গেল-এর অধীনে উত্তর-ককেশীয় আর্মির ছদ্মবেশ পরতে হবে আমাদের। মনে থাকবে তো সবাইর? (সৈন্যেরা কেউ-কেউ অট্টহাস্য করে উঠলো) কে হাসছে? মারো তার মুখের ওপর। চুপ। আমি এখন আর "কমরেড কম্যাণ্ডার" নই, আমি এখন "হুজুর", "প্রভু"। (সে জ্বালালো একটা দেশলাইর কাঠি, দেখালো তার কাঁধের উপর ঝলমল করছে ব্যাজ) আর তোমরা কমরেড নও, "প্রাইভেট"। সব দাঁড়াতে হবে তোমাদের বাধ্য বশ্যতায়, সেলিউট করবে, হয়ে যাবে ভদ্র মার্জিত। চুপ। বুঝেছ সবাই? (সমস্ত সৈন্য হেসে উঠলো বিদ্রূপে, দাঁড়ালো সার বেঁধে, "হুজুর" "হুজুর" বলে তার সঙ্গে জুড়ে দিলো যত অশ্লীল লেজুর।) সেলাই করে নাও ব্যাজ, খুলে রাখো তোমাদের লাল তারা, তার বদলে টুপিতে লাগাও চেন্না।'

সমানে তিন দিন ধরে নতুন ছদ্মবেশে, জেনারেল ভ্রাঙ্গেলের আর্মির পশ্চাদ্দেশ ব্যেপে ছুটলো তারা সদলে। সমস্ত রাস্তা কালো হয়ে গেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে, পুড়ছে রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেন, মিলিটারি স্টোর, জলের ট্যাঙ্ক, বারুদের ঘর। চার দিনের দিন ঘোড়াগুলো শ্রান্ত হয়ে

এলো ও সুরু করলো টলতে। দিনের মধ্যিখানে হঠাৎ এক বিরানা গ্রামে আদেশ হলো থামবার।

অলগা বেঁধে রাখলো তার ঘোড়া, খড়ের এক গাদার উপর পড়লো মুখ থুবড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমে গেলো তলিয়ে। হঠাৎ একটা উচ্চহাসির শব্দে সে জেগে উঠলো—একটা জীবন্ত চাষার মেয়ে, পায়ের নগ্ন গোছার উপর কালো স্কার্টের প্রান্ত তোলা, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'দেখ দেখ, কেমন সুন্দর ছেলে!' সদ্য-ধোয়া এক জোড়া পটি মেয়েটা ঝুলিয়ে রাখছে।

যখন অলগা ঘরে ঢুকলো, এমেলিয়ানফ তখন বসে আছে টেবিলে, ঘুমো চোখ, প্রফুল্ল মুখ, খালি পা, চুলে লেগে আছে ছোট-ছোট তুলোর দলা। সে ঘুমোচ্ছিলো বিছানায়, আর ঐ চাষার মেয়েটা তারই পটি ধুয়ে এনেছে সদ্য।

'বসো। খানিকটা ভডকা খাবে?' সেই তাজা চাষার মেয়েটা নিয়ে এলো ভডকার বাটি, সুগন্ধ ধোঁয়া থেকে লাল গাল দূরে রেখে। এমেলিয়ানফের নাকের তলায় টেবিলের উপর শব্দ করে রাখলো সে বাটিটা, আর তার নধর কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকালো।

'ভাবছিলুম কতক্ষণে জাগবে—এই তৈরি তোমার ভডকা।' উঁচু সুরে বাঁধা মেয়েটার গলা, চটপটে, একটু বা ফাজিল। 'তোমার পটি ধুয়ে দিয়েছি, এই শুকোলো বলে।' কুকুরের মমতা নিয়ে মেয়েটা তাকালো ডিমিট্রির দিকে। মেয়েটাকে লক্ষ্য করে একটা প্রশংসাসূচক শব্দ করে এমেলিয়ানফ মন দিল বাটিতে। তাকালো অলগার দিকে, এখন যেন কেমন নরম লিক্‌লিকে, তার এই খাওয়ার ভঙ্গিতে। অলগা তার চামচ নামিয়ে রাখলো, যেন কোন বিষাক্ত সাপ কামড়েছে তার বুকের মধ্যে, যন্ত্রণায় মলিন দেখাচ্ছে তার মুখ। দরজার বাইরে যখুনি দেখা গেলো সেই মেয়েটাকে, অলগা ছুটলো তার পিছনে, ঢাকা বারান্দার নিচে, তার

বাহু চেপে ধরলো, যেন দম নিতে কষ্ট পাচ্ছে এমনি ভাবে বললে, 'তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠলো, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দিলো সোজা। বিস্মিতের মতো ডিমিট্রি তাকাচ্ছিলো অলগার দিকে, কী যে ব্যাপার হলো হঠাৎ বুঝতেই পারছিলো না। যখন সে তার ঘোড়া নিতে বাইরে এলো বেরিয়ে, দেখলো অলগার চোখ জ্বলছে আর নাকের বাঁশি কেঁপে-কেঁপে উঠছে, ভয়ে কুঁকড়ে গেছে সেই চাষার মেয়ে, তাকাচ্ছে যেন ধরা-পড়া ইঁদুরের মতো। এক নিমেষে বুঝলো সে সব। আর তার শাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতের পুরোনো হাসিতে ফেটে পড়লো আচমকা। যখন তারা গাঁয়ের ফটক ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে চলে এলো বাইরে, তখন এমেলিয়ানফ তার হাঁটু দিয়ে অলগার হাঁটু ছুঁয়ে আদর করে হঠাৎ বললে, 'তুমি কী মিষ্টি বোকা!'

অলগা প্রায় কেঁদে ফেললো।

•

পাঁচ দিনের দিন কানে এলো যে কসাকদের একটা সম্পূর্ণ ডিভিসন লাল ফৌজের এই ছদ্মবেশী রেজিমেণ্টকে অনুসরণ করছে। ক্ষয়ক্ষীণ ঘোড়াগুলোকে ফেলে রেখে ওরা চললো আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে, পিছনের স্কোয়াড্রনকে যুদ্ধ করতে হলো অনুস্রিয়মান কসাকদের সঙ্গে। পতাকা বইতে দেয়া হলো অগ্রগামী স্কোয়াড্রনকে। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছুলো এক অন্ধকার গ্রামে, বন্ধ খড়খড়ির গায়ে ঠুকতে লাগলো বন্দুকের বাঁট, ডাকাডাকি করতে লাগলো। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। গির্জার ঘণ্টা একবার বেজে চুপ করে গেলো।

দুটো চাষাকে ধরে আনা হলো—যেন এ পৃথিবীর তারা কেউ নয়, লুকিয়েছিলো কোন এক খড়ের গাদার মধ্যে। চার দিকে তাকিয়ে বলছে বারে-বারে, 'মেরো না, মেরো না আমাদের।'

'তোমার গাঁ কি হোয়াইটদের জন্যে না সোভিয়েটদের জন্যে ?' জিনের থেকে ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলে এমেলিয়ানফ।

'কিছুই জানি না আমরা।...আমাদের সব নিয়ে গেছে, পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সব।'

যাক, বোঝা যাচ্ছে গ্রামটা এখনো দখল করেনি কেউ, তবে গ্রামের লোক ভ্রাঙ্গেলের কসাকদেরই প্রতীক্ষা করছে। আরো শুনলো, নদীর অন্য পারে, রেলের পুল পেরিয়ে, কতগুলি ট্রেঞ্চ আছে বলশেভিকদের হাতে। সৈন্যরা খুলে ফেললো সব কপট ব্যাজ, গেঁথে নিলো তাদের লাল তারা। নদী পার হয়ে মিশলো তাদের দলের লোকের সঙ্গে। শুনলো, শাদারা চাপ দিচ্ছে বরাবর, আর আদেশ হয়েছে যে করেই হোক বজায় রাখতে হবে ঐ পুল। অবস্থা অত্যন্ত সঙিন, মেশিনগানের জন্যে নেই কোন মশলা, গড়গুলো পোকায় আকীর্ণ। নেই রুটি, কাঁচা শস্য খেয়ে সৈন্যরা ফুলে যাচ্ছে, রাত্রে টিকতে পাচ্ছে না পরিখায়। যে লোককে রাখা হয়েছিলো বক্তৃতা ও প্রচারের কাজে, সে মরেছে আমাশা হয়ে। রেজিমেণ্টের প্রধান, প্রধান কম্যাণ্ডারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ চললো। আদেশ খুব স্পষ্ট, যে করে হোক বজায় রাখতে হবে পুল, যতক্ষণ না লাল ফৌজ পারছে শত্রুব্যূহকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে।

'অলগা, জীবন্ত যেতে পারবো না এ-জায়গা থেকে।' বললে এমেলিয়ানফ। নদী থেকে দু-কেতলি জল এনে এক কেতলি জল দিলে অলগার হাতে, আর তার পাশে বসে তাকালো অপর তীরের অস্ফুট রেখার দিকে। ঝাপসা, হলদেটে একটা তারা উঠছে নদীর উপরে। সমস্ত দিন ধরে বলশেভিকদের পরিখার উপর ভ্রাঙ্গেলের সৈন্য গুলি বর্ষণ করেছে। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ হুকুম এলো, ঝড়ের মতো ছিনিয়ে নিতে হবে পুল, নদীর ধার থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে শাদাদের আর অন্য পারের গ্রামটা

দখল করতে হবে।

অলগা জলের উপর তারার সেই ঝাপসা নিশ্চল ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো—যেন তাতে কত বিষাদ। 'অলিয়া, ফিরে চলো।' বললে ডিমিট্রি। 'অন্তত এক ঘণ্টা আমাদের ঘুমিয়ে নিতে হবে।' এই প্রথম সে অলগাকে ছোট-নামে ডাকলো। সৈন্যদের অস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে ঝোপের পাশে, নদীর পারে, হাতে জলের কেতলি—সমস্ত দিন এগুতে পারেনি তারা নদীর কাছে, জল পায়নি এক ফোঁটা। সকলেই জানতো কী চরম হুকুম এসেছে আজ, জানতো আজ রাত্রিই তাদের শেষ রাত্রি। 'চুমু দাও আমাকে।' বললে অলগা, আস্তে, ম্লানভাবে। হাতের কেতলিটা এমেলিয়ানফ আস্তে নামিয়ে রাখলো, কাঁধ ধরে টেনে নিলো তাকে কাছে—তার টুপি পড়ে গেলো, চোখ গেলো বন্ধ হয়ে—আর তাকে সে চুমু খেতে স্থরু করলো, চোখে, গালে, মুখের মধ্যে।

'তোমাকে আমি বিয়ে করতুম অলগা, কিন্তু তুমি তো জানো এখন এ অসম্ভব।'

রাত্রির আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা হলো কোনোমতে। তাদের দিকের পুলের অংশটা শাদারা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করেছে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে চালিয়েছে মেশিনগান। কুয়াসাচ্ছন্ন নদী আর ভেজা মাঠের উপর জাগলো ধূসর প্রভাত। নদীর দুপার থেকে মাটি যেন মুহূর্তে শূন্যে উঠে আবার নেমে আসছে নিজের জায়গায়। বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ছররা-ছিটোনা গুলির আওয়াজে। শব্দে সবাইকে মূঢ় দেখাচ্ছে। পুলের পাশে নিষ্প্রাণ নিশ্চল দেহের স্তূপ রয়েছে পড়ে। মেশিনগানের গুলির সামনে অনন্তকাল বসে থাকা যায় না।

তখন খাড়া পারের নিচে, ক্ষণিক আশ্রয়ে, সাত জন লালফৌজ কমিউনিস্ট রেজিমেণ্টের পতাকার নিচে এসে সমবেত হলো। গুলিছেঁড়া সেই

নিশানকে মনে হলো ভোরের আলোয় রক্তের রঙ নিয়েছে। দুটো স্কোয়াড্রন ছিলো ঘোড়ার উপর আসীন। রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার বললে, 'তোমাদের মরতে হবে সবাইকে।' বলে ছুটে দাঁড়ালো সেই পতাকার নিচে। দলের অষ্টম জন হচ্ছে ডিমিট্রি এমেলিয়ানফ। তারা টেনে নিলো তাদের তলোয়ার, খেপিয়ে তুললো ঘোড়াগুলোকে, ছুটলো প্রতিধ্বনিমান পুলের উপর দিয়ে।

অলগা দেখলো, একটা ঘোড়া পড়ে গেলো রেলিঙের গায়ে, পরে আরোহী-শুদ্ধ গড়িয়ে পড়ে গেলো নদীর মধ্যে, প্রায় চল্লিশ হাত নিচে। কতগুলি ঘোড়সওয়ার পৌঁছলো পুলের মধ্যিখানে। একটা লোক জিনের থেকে পড়ে গেলো খসে, মাতালের মতো। সামনেকার সওয়াররা কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, কাটছে সেই বেড়া। দীর্ঘদেহ পতাকাবাহীর হাতে কাঁপছে নিশান, নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। ডিমিট্রি নিজের হাতে তুলে নিলো সে-পতাকা, আর মুহূর্তেই গুলি খেলো তার ঘোড়া।

কানের কাছ দিয়ে গুলি গুঞ্জন করে ফিরছে। পুলের ফাঁক-ফাঁক তক্তার উপর দিয়ে ছুটলো এবার অলগা, তার পিছনে পুলের লৌহদেহটা বহু ঘোড়ার ভারে শব্দায়মান, বহু কণ্ঠের কোলাহলে। ডিমিট্রি দাঁড়িয়ে আছে পতাকা ধরে, দুই পা বিস্তৃত, মুখ মৃত্যুর মতো মলিন, মুখের থেকে চিবুক বেয়ে রক্ত গলে-গলে পড়ছে। অলগা তার হাত থেকে তুলে নিলো পতাকা, ছুটলো ঘোড়া নিয়ে। এমেলিয়ানফ কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়লো রেলিঙ ঘেঁসে। স্কোয়াড্রনগুলো তাকে অতিক্রম করে চলে গেলো, ঘোড়ার কেশরের উপর নোয়ানো তাদের শরীর, হাতে প্রদীপ্ত তলোয়ার।

পৌঁছলো তারা অপর তীর, শত্রু পলাতক, বন্দুক শব্দশূন্য। অশ্বারোহীদের ফেনস্রোতের উপরে অনেকক্ষণ ধরে পাল তুলে দিয়ে চললো সেই লাল-পতাকা, তারপর দূর গ্রামের উইলো-বনের মধ্যে তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। খালি-পা আর গোল-মুখ একটা চাষার ছেলে এখন বহন করছে সেটা,

ছোটাচ্ছে ঘোড়া আর চেঁচাচ্ছে জোর গলায় : 'এসো, এসো মারো ওদের। শেষ করে ফেলো।'

অলগাকে পাওয়া গেলো মাঠের মধ্যে। পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, উরুর উপর কেটে গেছে সাংঘাতিক। তার স্কোয়াড্রনের কমরেডরা ভীষণ দুঃখিত তার জন্যে, কী করে তাকে তারা বলবে যে এমেলিয়ানফ আর নেই। রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডারের কাছে ডেপুটেশন গেলো, সাহসের জন্যে জোটাভাকে পুরস্কৃত করতে হবে। কী দেবে তারা তাকে কিছুই ভেবে পেলো না। সিগারেট-কেস ? সে সিগারেট খায় না। ঘড়ি ? মেয়েদের কী দরকার ঘড়ির ? একজন মৃত অফিসারের জিনিসের মধ্যে পেলো তারা একটা সোনার ব্রোচ ; হৃদয়কে বিদ্ধ করছে তীর, এই চেহারায়। রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার রাজি হলো এই পুরস্কারে, কিন্তু লিখিত একটা সর্ত জুড়ে দিলো : 'তার কীর্তির জন্যে তীরের আকারে সোনার ব্রোচ জোটাভাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, কিন্তু মধ্যবিত্ততার নিদর্শন বলে হৃদয়কে ফেলে দিতে হবে উপড়ে।'

৪

জোটোভার জীবন, যেখানে প্রেম ছিলো উদ্বেল অথচ নিরীহ, ভেঙে গেলো হঠাৎ, যেমন ভেঙে যায় পাখির ওড়া, বাতাসের জোয়ারে পাখার পালে চলতে-চলতে আচমকা গুলি খেয়ে ঝুপ করে খসে পড়ে মাটির উপর। অনেক অনড় দিন আর সপ্তাহ চলছে সে ঠেলে-ঠেলে। যা সে চায়নি, চেনেনি কোনো দিন। অনেক রকম হাসপাতালে অনেক দিন সে রইলো, মালগাড়িতে চড়িয়ে জায়গায়-জায়গায় টেনে নিয়ে গেলো তাকে, ঠাণ্ডায়, অনাহারে, প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে। তার কাছে বাইরের সব লোক যেন নির্দয় বিদেশী, তাদের কাছে সে হাসপাতালের তালিকায় একটা নিষ্প্রাণ নম্বর। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। ভীষণ, সাতঙ্ক জীবন—অথচ মৃত্যু তাকে নিলো না।

যখন শেষ পর্যন্ত ছাড়লো সে হাসপাতাল, সে তখন কঙ্কালের আকার, তার যুদ্ধের কোট আর স্যুট ভীষণ বড় হয়ে গেছে, চুলগুলি কদমফুলের মতো ছাঁটা। সে গেলো একটা রেল-স্টেশনে, যেখানে অমানুষিক কতগুলো মানুষ ওয়েটিং-রুমের মধ্যে আছে আর মরছে অকাতরে। কোথায় সে যাবে? তার কাছে পৃথিবী যেন ধূ-ধূ মরু-প্রান্তর। সে গেলো শহরে, ঢুকলো এক সৈন্য-সংগ্রহ আফিসে, দেখালো তার দলিলপত্র আর পুরস্কার—সেই ব্রোচ—আর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সাইবেরিয়ায়, যুদ্ধ করতে।

টুকরো-টুকরো ছবি সব তার স্মৃতিতে। লাইনের উপর রেলগাড়ির ঘর্ঘর, নীলচে ধোঁয়ার মধ্যে থেকে লোহার স্টোভের তাপ, ট্রেনের মধ্যে হাজার-হাজার মাইল, যত দীর্ঘ যাত্রা তত দীর্ঘ গান। তারপর, ব্যারাকের সেই গন্ধ আর ময়লা, সামরিক ইস্তাহারের সেই সব চীৎকার-করা অক্ষর, বহু-বহু ঘোষণা আর বিধান—বাতাসে কাগজের টুকরো, কাঠের ঘরের মধ্যে লম্বা-লম্বা সভা, ঘরের সেই অন্ধকার, সেই ধোঁয়া-উগরোনো ল্যাম্প। তারপর বরফ, পাইন-গাছ, তাঁবু-ফেলা মাঠের মধ্যে আগুন, আগুন

জ্বালানো গ্রাম, শাদা বরফের উপর লাল রক্তের স্রোত, আফাড়া কাঠের মতো হাজার-হাজার মৃতদেহ।…সমস্ত জট পাকিয়ে আছে তার স্মৃতিতে, যেন একটা শেষহীন দুর্ঘটনার অফুরন্ত শৃংখল।

ওজনে পাৎলা, চামড়া কটাসে, অলগা খেতে শিখেছিলো মোটর-স্পিরিট, ফুঁকতে পারতো মাহর্কা, শপথ করতে পারতো পুরুষদেরই মতো। অল্প লোকেই তাকে মেয়ে বলে মানতো, সে একেবারে হাড্ডিসার, সাপের মতোই শয়তান। এক দিন ব্যারাকে, এক রাত্রে, গৃহহীন সৈন্যদের একজন, পুরু তার ঠোঁট, কি-একটা অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলো তার কাছে, তার আকস্মিক বন্যতায় সে তাকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে নাকের উপর এমন জোরে মেরেছিলো যে তাকে যেতে হয়েছিলো হাসপাতাল; সেই সাপের সম্বন্ধে কারো কোনো রঙিন কল্পনা পোষণ করবার সাহস হয়নি আর।

বসন্তে, ঘুরতে-ঘুরতে গেলো সে ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত। জীবনে এই প্রথম সে সমুদ্র দেখলো—নীল, নিবিড়, আশ্চর্যরকম জীবন্ত। দেখলো দিগন্তের গা বেয়ে লাফিয়ে উঠেছে তরঙ্গের কেশর, ঢেউ ঠেকাবার পাথরের উপর পড়ছে ছিটিয়ে, হাওয়ায় ফেনার মেঘ উঠছে ফেঁপে-ফেঁপে। সমুদ্রে ভেসে কোথায় চলে যাবার ইচ্ছে হলো অলগার। ছেলেবেলাকার স্বপ্ন যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠলো: সেই সব নাম-না-জানা গাছে-ঢাকা সমুদ্র-তীর, পাহাড়ের চূড়া, মেঘের ফাঁক দিয়ে সোনালি রোদ, আর একটি ভাসমান জাহাজ। কিন্তু তা হবার নয়। কেউ তাকে জাহাজে তুলে নেবে না। খালি একবার এক পাবলিক-হাউসে এক বুড়ো খালাসির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো, সে তাকে ধরে নিয়েছিলো বেশ্যা বলে, মাতাল চোখে কেঁদেছিলো তার জন্যে, তার বিধ্বস্ত যৌবনের জন্যে, আর একটা নোঙরের উল্কি এঁকে দিয়েছিলো তার ডান বাহুতে। বলেছিলো, মনে রেখো, এ হচ্ছে আশার চিহ্ন, মুক্তির আশা।

তারপর শেষ হয়ে গেলো যুদ্ধ। অলগা দোকান থেকে কিনলো সবুজ

মখমলের কোট, পুরোনো পর্দা থেকে তৈরি, আর সুরু করলো নানান সোভিয়েট আফিসে নানান রকম চাকরি, টাইপিস্ট, সেক্রেটারি, নকল-নবিশ, তার লেখবার টেবিল নিয়ে এক মেঝে থেকে আরেক মেঝেয়। এক জায়গায় থাকতো না সে বেশি দিন, শহর থেকে শহরে সরে যেতো, খোদ রাশিয়ারই কাছে-কাছে। একেক সময় মনে হতো ঐ পুল পেরিয়ে গেলে না-জানি কেমন হয়, ঐ নদীর পারে, যেখানে কেতলিতে জল ভরে ডিমিট্রি শেষবার বসেছিলো তার পাশে।...হয়তো দেখতে পেতো সেই উইলো-গাছ, সেই জায়গাটি, ঘাসে হয়তো এখনো তাদের সেই বসবার ছাপ রয়েছে লেগে।

অতীতকে সে মুছে ফেলতে পারলো না মন থেকে। শুকনো, একলা তার জীবন। কিন্তু আস্তে-আস্তে সৈন্যের কাঠিন্য উঠে যাচ্ছে তার শরীর থেকে —অলগা আবার নারী হয়ে উঠছে ক্রমে-ক্রমে।

৫

তৃতীয় বারের মতো অলগা নতুন করে জীবন সুরু করলো, বাইশ বছর বয়সে। তার মনে হলো যেন যুদ্ধের ঘোড়া দিয়ে লাঙল টানা হচ্ছে। দেশ তখনো অশান্ত, বিশৃংখল, জনগণের রক্তাক্ত চোখ তখনো যেন ধ্বংস করবার জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে—এদিকে প্রচারিত হচ্ছে নানা নির্দেশপত্র, অতীত থেকে বর্তমানকে অসম্পৃক্ত করে, ডাক দেয়া হচ্ছে সবাইকে, তৈরি করো; গড়ে তোলো, ক্ষতিপূরণ করো।

এ যেন যুদ্ধের চেয়েও কঠিন—পড়ে-শুনে এই মনে হলো অলগার। যে শহরে সে থাকতো, দুর্দান্ত রাগে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বাড়িগুলি সব ধ্বংসস্তূপ, মাঠ-ঘাট সব ছাই, কাঁটা-জঙ্গলে ভরতি। খোলা আকাশের নিচে সবাই শুচ্ছে, কম্বলের অভাবে মাদুর গায়ে দিয়ে। খাক আর ঘুমোক, লোকেরা সব সময়েই যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে। তাদের প্রতিভায় গড়ে উঠেছে এখন শুধু হাঁড়ি-কুঁড়ি, হোগলার মাদুর—যেমন ছিলো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। দেশের নির্দেশ, গড়ে তোলার ও তৈরি করার, কিন্তু হাত কই? তাদের হাত যে শিকারী-পাখির নোখের মতো বাঁকানো।

সন্ধের দিকে শহরে একা-একা ঘুরে বেড়াতে ভারি ভালো লাগে অলগার, অচেনা অন্ধকারে অবিশ্বাসী মুখের দিকে চেয়ে থাকে, রাগ ভয় ও ঘৃণায় যে-মুখ রেখাদীর্ণ। সে বুঝতে পারে, সবাই বহন করছে যুদ্ধের ছাপ, ঐ মুখের সংকুচন, ঐ দাঁতের ভগ্নাবশেষ। ছেলে আর বুড়ো, সবাই পেরিয়ে এসেছে সেই হলকার মধ্য দিয়ে। পুরোনো পরদা আর চট দিয়ে তৈরি জামা-কাপড়ে, ছেঁড়া আর দুর্গন্ধ, পায়ে মাদুরের জুতো, সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই নোংরা শহরে, আলুথালু, কদর্য—যে কোনো মুহূর্তে যেন কেঁদে ফেলবে বা খুন করে ফেলবে।

তৈরি করো, তৈরি করো, তৈরি করো—চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে দেয়ালের

ইস্তাহার। পুল উড়িয়ে দেয়া, ছোঁ মেরে দুর্গ ছিনিয়ে নেয়া, ঘোড়া ছুটিয়ে গোলন্দাজ মেরে আসা বা ফ্যাক্টরি পুড়িয়ে দেয়া অনেক সহজ। রঙচঙে ইস্তাহার-লটকানো একটা বেড়ার সামনে দাঁড়ালো এসে অলগা। অনেক সব মুখ আঁকা, সত্যিকারের জীবনে যা দেখা যায় না, উড়ন্ত নিশান, আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, ধূমায়মান চিমনি, অক্ষরগুলি নাচছে চোখের সামনে—দেশময় শ্রমশিল্প সংগঠন করো। ও সব বর্ণাঢ্য ঘোষণা-পত্রের সামনে অলগা স্বপ্ন দেখতে লাগলো—নতুন সংগ্রামের বৃহত্ত্ব তাকে মুগ্ধ করছে।

সন্ধ্যা ম্লানতর হয়ে আসে, দগ্ধাবশিষ্ট জানলার উপর পরিত্যক্ত গৃহস্তূপে শেষ রশ্মির কুপিত আভা এসে পড়ে। একটা লোক বারে-বারে যাওয়া-আসা করছে তার সমুখ দিয়ে, পঙ্কিল রাস্তায় সূর্যমুখী-ফুলের বিচি থুতিয়ে ফেলতে-ফেলতে—যেখানে পড়ে আছে মর্চের রঙের পাতা আর মরা বেরাল। সবখানেই এই সূর্যমুখী-ফুলের বিচি। লোকটা অবসর যাপন করছে তার চোয়াল নেড়ে, যেন চিন্তার গোধূলিতে মস্তিষ্ক অর্ধ-নিদ্রিত। প্রস্তরযুগে ফিরে যাবার প্রতীক এই সূর্যমুখী-ফুলের বিচি। অলগা তার হাতের মুঠি চেপে ধরে—সে মেনে নিতে পাচ্ছে না এই নিঃশব্দতা, সূর্যমুখী-ফুলের বিচি, হোগলার মাদুর আর মহকুমা-শহরে এত অনাবাদি পোড়ো জমি।

মস্কৌতে চাকরি পেলো সে একটা। পুরোনো পর্দার কাপড়ে তৈরি সবুজ মখমলের স্কার্ট পরে এলো সে মস্কৌয়, সংকল্পে আর স্বার্থত্যাগের স্বীকৃতিতে দৃঢ়ীভূত।

শারীরিক কষ্ট আর তাকে পীড়া দেয় না, সে দেখেছে এর চেয়েও দুঃসময়। প্রথম ক' সপ্তাহ সে যেখানে-সেখানে কাটিয়েছে, তারপর সে সর্বজনিক একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠলো। বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, বহু দরখাস্ত পেশ

করে, বহু জটিল চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে, অবশেষে সে "মূল্যবান ধাতু"-র ট্রাস্টে চাকরি পেলো, গুঞ্জরমুখের মৌচাকের মতো অভ্রলিহ আফিসের কোলাহলের ঝড়ে প্রায় দিকভুল হয়ে গিয়ে। অতিচক্রিল কলের মাঝখানে ধরা-পড়া ছোট্ট চড়ুই। ভয় পেয়ে গেছে সে। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় আসে আফিসে, দেখে চার দিকে চেয়ে, আর নকলনবিশের কাজে নিজের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে দ'মে যায় ভয়ানক। এখানে কেউ আর শারীরিক কৌশল সম্বন্ধে কৌতূহলী নয়, না তার উন্মত্ত সাহস বা সর্প-ক্রূর ঘৃণা সম্বন্ধে। টাইপরাইটারের আঙুলের শব্দ, কাগজের খসখস, টেলিফোনে বিষয়ী কথাবার্তা—এই চলেছে চার দিকে। যুদ্ধের চেয়ে কত আলাদা—যুদ্ধ, যেখানে সব ছিলো স্পষ্ট, নির্ধারিত, তুমি তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ তোমার উদ্দেশ্যকে, কানের কাছে শুনতে পাচ্ছ গুলির গুলতান।

শেষ পর্যন্ত সেও খাপ খাইয়ে নিলো, পোষ মানালো নিজেকে। দিনের পর দিন, একঘেয়ে, ঔৎসুক্যহীন কেজো দিন। রুটিনের একঘেয়েমিতে ঘুমিয়ে না পড়ে অলগা কিছু রাজনীতিক কাজ হাতে নিলো। তার ক্লান্ত জীবনে নিয়ে এলো তার সামরিক শাসন, এমন-কি সামরিক পরিভাষা—উৎসাহে যা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো।

সহকারী ম্যানেজারের কাছেই ধমক খেলো প্রথম। অলগা মাহর্কার ধোঁয়া খায়। 'কমরেড জোটাভা, মোটামুটি তুমি একটি পরিচ্ছন্ন মেয়ে, অথচ আফিসে বসে তুমি মাহর্কা খাও। যেন তোমার মধ্যে কোনোই মেয়েলি গুণ নেই। কেন, ভালো তামাক কিছু খেতে পারো না ?'

ঠিক সময়েই ঐ তুচ্ছ নালিশটা এসেছিলো তার জীবনে। অলগা প্রথমটা একটু নাড়া খেলো,পরে প্রায় কাঁদবার মুখে। আফিস-ফেরৎ নিচে চাতালের একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালো সে কিছুক্ষণ, বহু বছর পর এই প্রথম দেখলো একবার নিজেকে মেয়ের মতন করে। পাখি তাড়াবার জন্যে

মাঠের মধ্যে যে কাঠি দিয়ে ভূত খাটিয়ে রাখে তেমনি চেহারা। ঝর্ঝরে মখমলের স্কার্টটা সামনের দিকে খাটো, পিছন দিকে ফেঁসে-যাওয়া, ধোঁয়াটে ছিটের ব্লাউজ গায়ে, পায়ে পুরুষের সেকেলে জুতো। এরকম পোশাক সে পরেছে কি করে?
গোলাপী মোজা আর খাটো স্কার্টে ঝলমল করতে-করতে দুটো টাইপিস্ট মেয়ে জোটোভার পাশ দিয়ে চলে গেলো, আয়নার সামনে তাকে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে আরেক চাতালে গিয়ে হেসে উঠলো। কানে এলো শুধু একটা কথা: 'একটা ঘোড়া উঠবে ভয় পেয়ে…'তার সুচারু মুখে রক্তের তাপ ফুটলো। ওদের মধ্যে একজন অলগার ফ্ল্যাটেই থাকে—নাম সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা।

কয়েক দিন পরে প্স্কভস্কায়া স্ট্রিটের মেয়ে-বাসিন্দারা অলগার ব্যবহারে ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। রান্নাঘরে স্নান করতে ঢুকে সকালবেলা, অলগা সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভার কাছে গিয়ে তার মোজা দেখিয়ে জিগগেস করলে, 'এটা কিনেছ কোথায়?' 'এটা কিনেছ কোথায়?'—জিগগেস করলে সনিয়ার স্কার্ট তুলে নিচেকার জাঙিয়া দেখিয়ে। দ্রুত ক্রুদ্ধ গলায় সে প্রশ্ন করছে, যেন চালাচ্ছে সে তলোয়ার।
সনিয়া পরিজ রাঁধছিলো, একেই ভীতু, এই সব স্থূল ভঙ্গিতে আরো ভয় পেয়ে গেলো। রোসা বেসিকোভিচ এলো তার সাহায্যে, বললে নরম গলায়, কুজ্‌নেট্‌স্কি স্ট্রিটে সমস্ত পাওয়া যাবে। আজকাল সেমিজের স্টাইলে পোশাক পরাটাই ফ্যাশানেবল, আর মাংসের মতোই রঙ হবে আজকালকার মোজার।
'হুঁ। তাই। বুঝেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বললে অলগা। তারপর সনিয়ার এক গুছি চুল সে টেনে ধরলো, যেন এটা ঘোড়ার ঘাড়ের লোম, পৃথিবীর মধ্যে কোমলতম চূর্ণালক নয়।

'আর এটা—এটা কী করে করতে হয়?'
'কেটে ফেল, ছেঁটে ফেল চুল।' রোসা বেসিকোভিচ বললে, 'ঘাড়ের দিকে ছোট, সামনের দিকে সোজা সিঁথি, কান না ঢেকে।'
পিটর মর্‌স্‌ এসেছে সে-সময়, বললে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে, কমরেড জোটোভা—'
'মূর্খ। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো যদি যুদ্ধে···'তীব্র দৃষ্টি ফেলে বললে অলগা, স্বর শান্ত ও স্পষ্ট, কিন্তু পিটর মর্‌স্‌ যেন শুনতে পেয়েছিলো তার দাঁতের সঙ্গে দাঁতের ঘর্ষণ।

'মহামূল্য ধাতু'র ট্রাস্ট আপিসে সেদিন যখন জোটোভা হাজিরা দিলো, সবাই একেবারে হতভম্ব। ছোটহাতার কালো সিল্কের ফ্রক জোটোভার পরনে, মাংসের রঙের মোজা, পেটেণ্ট চামড়ার বিলাসী জুতো, তার তামাটে চুল কায়দা করে ছাঁটা, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে শেয়ালের ঘাড়ের চুলের মতো। টেবিলে বসে নিচু হয়ে কাজ সুরু করলো জোটোভা—কান দুটো তার জ্বলছে।
সহকারী ম্যানেজার, বোকা আর কাঁচা-বয়স, একদৃষ্টে তাকাচ্ছে তার দিকে, সামনে যে ঘোরতর শব্দে টেলিফোন বাজছে কানেই ঢুকছে না।
'কোত্থেকে জোটালো এ সব? সত্যি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, তার সুচারু সম্ভ্রান্ত মুখ, রাত্রির মতো কালো বিমর্ষ চোখ, নুয়ে পড়া নরম চোখের পাতা। আঙুলে কালির দাগ পর্যন্ত সে ধুয়ে এসেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত মুখ বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে তাকে, সিসের মতো ভারী চোখে তার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দিয়ে বলছে, 'খাসা ছুঁড়ি।'
আর-আর ঘর থেকেও কেরানিরা আসছে তাকে দেখবার জন্যে। জোটোভার এই আশ্চর্য রূপান্তর ছাড়া কারু মুখে আর কোনো কথা নেই।
প্রথম সংকোচের ভাবটা চলে যেতেই অলগা তার এই নতুন খোলসে

নিজেকে স্বাধীন ও স্বাভাবিক মনে করলে, যেমন করতো তার সেই স্কুলের ফ্রকে, ঘোড়সৈন্যের কোটে, চামড়ার বেল্টে যা আঁট করে বাঁধা, তার মুকুটে, তার জুতোর তলাকার গজালে। তার চলে যাবার সময় লোকেরা যদি খুব বেশি তাকায় তার দিকে, সে তার চোখের পাতা নামিয়ে আনে, যেন তা দিয়ে ঢেকে ফেলে তার আত্মার অনাবরণ।

নিঃসন্দেহ, জননের প্রাচীন প্রেরণা থকেই নারীদেহের সুষমায় এত মাদকতা পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অলগার দিকে তিন দিন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সহকারী ম্যানেজার, ইভান পেডাট্টির মনে যে তোলপাড় সুরু হয়েছে তার পিছনে ঐ সুদূর প্রাচীন প্রেরণার ছায়া পড়েছে বলে মনে হয় না।

উড়ে যায় সময়ের পাখিরা, বেজে ওঠে টেলিফোন, ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে চিঠি, সই হয়ে চলে যায় সঙ্গে-সঙ্গে—আর রোজই অলগাকে বেশি করে সুন্দর মনে হয় পেডাট্টির। তার মনোভাব প্রায় একটা শিশুর মতো—ভোরের রোদ্দুরে-ধোয়া পৃথিবীর দিকে যে প্রথম চোখ খোলে—সে দেখছে যেন জীবনের এক বিস্ময়। পেডাট্টি যুবক, অনভিজ্ঞ, পড়েনি কিছু সাহিত্য। তার ধারণা, যেমন সৈন্য দিয়ে শ্রমসমস্যার সমাধান করা হয় তেমনি করে যৌবনসমস্যার অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই নিষ্পত্তি করা চাই—মানে, ঝড়ের উদ্দামতায়। তার অচেতন মন বলছিলো তাকে বারবার যে তার জীবনে খুব সাংঘাতিক ও অসাধারণ কিছু একটা ঘটছে, প্রায় ক্ষণিক পাগলামির কাছাকাছি, আর—গন্তব্যের দিকে স্থির, দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে। কিন্তু কেন কে জানে কেমন ভয়-ভয় করছে তার। (এমনিতে সাধারণ অবস্থায় মোটেই সে ভীতু নয়) অনেক চেষ্টা করছে সে কী করে কী ব্যাখ্যার আড়ালে গিয়ে সে আত্মরক্ষা করবে, ভুলবে তার এই লজ্জা আর ভীরুতা—ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়লো

তার এক বন্ধুর কথা, ১৯২০ সালের গ্রীষ্মে, সমুদ্রতীরে, একবার কী কথা হয়েছিলো তার সঙ্গে। সুস্থ, সবল, লাল-চুল, সেই কমরেড। গাঢ় নীল সমুদ্রের পারে জলে পা ডুবিয়ে শুয়েছিলো তারা, আর যে মেয়েই তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো তার সম্বন্ধেই করছিলো আলোচনা। বন্ধু সেদিন তাকে দিয়েছিলো একটি প্রেমের ফর্মুলা—'আসল ব্যাপার হচ্ছে,' বলেছিলো সে, 'বুকের মধ্যে জোর করে হঠাৎ জড়িয়ে ধরো তাকে—কী সে বলে-না-বলে কিছুই গ্রাহ্য কোরো না।'

তিন দিনের দিন, পাঁচটার সময়, ভেজা চোষ-কাগজে অলগা যখন তার কনুইয়ের কাছেকার কালি তুলছে, পেডাটি এলো তার কাছে, ভুরু কুঁচকে, বললে, তার সঙ্গে তার ভীষণ জরুরি কথা আছে একটা। অলগা ধীরে-ধীরে তার অপরূপ ভুরু তুলে তাকালো তার দিকে, টুপি পরলো। একসঙ্গে বেরুলো তারা দুজনে। পেডাটি বললে, 'আমার ঘরে চলো, সেইখানেই সুবিধে, এই কাছেই আমার ঘর।' জোটোভা কাঁধ ঝাঁকালো। চললো তারা রাস্তা দিয়ে। তপ্ত বাতাস ধুলোর ঝড় তুলে ছুটেছে। চলেছে রাস্তা দিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে মস্কৌর লোক, তাদের ঘেমো গায়ে বিশ্রী গন্ধ, কিন্তু পেডাটির নাকে তার এই উদাসীন সঙ্গিনীর গাত্রবাস—উত্তেজনায় শীতল তার নাক। পাঁচতলার উপরে একটা ঘরে তারা ঢুকলো। অলগাই ঢুকলো প্রথম, বসলো চেয়ারে, জিগগেস করলো: 'কী, কী কথা আছে আমার সঙ্গে?'

হাতের পোর্টফোলিওটা পেডাটি ছুঁড়ে দিলো বিছানায়, চুলগুলো দুহাতে উস্কখুস্ক করলো, মনে হলো ঘরটা যেন শ্বাসরোধ করে আছে। আদর্শবাদের যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তা দমন করবার জন্যে নির্দয় চেষ্টা করতে-করতে অপরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে বললে, 'কমরেড জোটোভা, আমরা বিষয়টাকে মুখোমুখি আক্রমণ করবো, আমরা হচ্ছি ঝোড়ো সৈন্যের দল।...আসল হচ্ছে যৌনাকর্ষণ, যেটা কিনা স্বাভাবিক প্রেরণা।...

রাত বারোটা বেজে গেছে রোমান্টিসিজমের, যত সব বাজে বুলি।···
না, আর কিছু নয়, তুমি তো বুঝতে পেরেছো সব, আমি নাই বা
বললাম খোলাখুলি।'
বাহুর নিচে অলগাকে সে আঁকড়ে ধরলো আর চেয়ায় থেকে তাকে তুলে টেনে আনলো বুকের উপর, তার অনভ্যস্ত হৃদয় ভীষণ ওঠা-নামা করছে, যেন দাঁড়িয়ে আছে সে গিরিশৃঙ্গের উপরে। কিন্তু তখুনি সে স্বাদ পেলো প্রতিরোধের—চেয়ার থেকে জোটোভাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়, সে কৃশ, তাই সে পিছলে সরে যেতে জানে। কিছুমাত্র না ঘাবড়ে, প্রায় উদাসীনের মতো, অলগা পেডাট্টির দুই কবজি চেপে ধরলো, এমন জোরে চেপে ধরলো যে পেডাট্টি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো, চেষ্টা করলো হাত ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু অলগার হাত ক্রমশই বেঁকে যেতে লাগলো ধীরে-ধীরে। শেষকালে রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো পেডাট্টি : 'লাগছে, ভীষণ লাগছে আমার।'
'ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো, বলে দিচ্ছি।' অলগা ছেড়ে দিলো হাত, টেবিলের উপর সিগারেটের বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো, ধরিয়ে বেরিয়ে গেলো শান্তভাবে।

সমস্ত রাত অলগা এপাশ-ওপাশ করে বিছানায়···উঠে জানলার কাছে বসে সিগারেট খায় একটা, আবার বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। তার সমস্ত অতীত ফিরে আসে তার চোখের কাছে। যা সব মরে গেছে মনে হতো, তাই বেঁচে উঠে তাকে খোঁচা মারে। কেন, কেন তার রাত কাটবে এমন ভয়ঙ্কর? হৃদয়ে প্রেমের জ্বর না নিয়ে সমস্ত জীবন ঠাণ্ডা হয়ে কাটিয়ে দেয়া যায় না নিরালায়, পাহাড়ের ঝরনার মতো? আর, সে বুঝতে পারছে, যতই সে পাক না কেন কষ্ট আর কাঠিন্য, এই আদিম মূর্খতা এখনো তার থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি, আবার

সুরু হবে বুঝি তার প্রচণ্ডতা। তার মুক্তি নেই তার থেকে।

সকালবেলা,রান্নাঘরে যাবার মুখে, অলগা শুনতে পেলো এক ঝলক হাসি, আর সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভার গলা: 'কী ভীষণ দেমাক—দেখতে পারিনা দুচক্ষে। ছুঁতে পারো না এত তেজ। আফিসের চাকরির ফর্মে ও লিখেছে "অবিবাহিত"—বড়-বড় অক্ষরে। (হাসি, প্রাইমাস স্টোভের গর্জন) সবাই জানে, সে ঘুরে বেড়িয়েছে একটা স্কোয়াড্রনের সঙ্গে। বুঝলে তো ? একটা গোটা স্কোয়াড্রনের সঙ্গে সে থেকেছে।'

দর্জির দোকানে কাজ করে, মেরিয়া আফানাসিয়েভনা বললে, 'খারাপ রোগ। ওর মুখ দেখেই তা বলা যায়...'

বললে রোসা বেসিকোভিচ: 'আর চাল দেয় যেন রথসচাইল্ড।'

তারপর পিটর মরসের গলা: 'ওর সম্বন্ধে বেশ হুঁসিয়ার থেকো। আমি আগেই ওকে আঁচ করে নিয়েছি। দেখো, তোমরা টেরও পাবে না, ও খুব উন্নতি করে যাবে।'

'কী যে যা-তা বলো তার ঠিক নেই।' সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা রেগে উঠলো: 'ঐ মুরোদে উন্নতি হয় না।'

অলগা ঢুকলো রান্নাঘরে আর সবাই চুপ করে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে তাকালো সে সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভার দিকে, এমন বিরক্তি তার মুখে যে রাগে ফুটতে লাগলো সনিয়ার রক্ত। কিন্তু কোনো ঝগড়া হলো না সেবার।

সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা ঠিকই বলেছে, উন্নতির মুরোদ অলগার নেই। পেডাট্টির সঙ্গে সেই ঘটনার পর পেডাট্টি তাকে নিঃশব্দে ঘৃণা করতে লাগলো,সে নিঃশব্দ ঘৃণা শুধু পরাজিত পুরুষেই সম্ভব। ফলে তাকে ঘিরে ধরলো মেয়েদের শত্রুতা, পুরুষদের ব্যঙ্গভঙ্গি। মুখোমুখি ঝগড়া করতে তাদের সাহস নেই, শুধু সে তার ঘাড়ের উপর তাদের বিষাক্ত দৃষ্টির স্পর্শ পায়, যেখানে যায় সেইখানেই। তার ডাকনাম হয়েছে, 'কালসাপ',

'ভাগ্যহীনা', 'মাদীসৈন্য', তার পিছনে সবাই ফিসফিস করে, তার ব্লটিং প্যাডের উপর পড়তে পারে সে সব ফিসফিসানি। সব চেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে এই যে এ সব থেকে সে দুঃখ পায়, তার চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করে, 'নই, আমি অমন নই।'

ডিমিট্রি তাকে ডাকতো 'বেদিনী' বলে। সে বুঝতে পারছে, গভীর বেদনার সঙ্গে বুঝতে পারছে, তার মধ্যে জেগে উঠছে বাসনার বিষ, এবার যেন পরিণতির আগ্রহে। কিন্তু তার কৌমার্য রাজি হচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু সে কী করতে পারে? রান্নাঘরের কলের তলায় গিয়ে গা ভিজিয়ে রাখবে কি বরফের জলে? একবার ভীষণ পুড়ে গিয়েছিলো সে, আগুনকে তাই তার বড্ড ভয়।……কোনো দরকার নেই, ভয়ঙ্কর তা ভাবতে…

লোকটাকে অলগা মুহূর্তের জন্যে দেখলো, আর তার সমস্ত সত্তা বলে উঠলো, এই সেই পুরুষ…ব্যাখ্যার অতীত, সর্বনাশে ভরা, ঠিক বাস-এর সঙ্গে সংঘর্ষের মতো, যে-বাস গলির মোড় ঘুরে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে হঠাৎ।

টলস্টয়ী শাদা ব্লাউজ গায়ে, লম্বা-চওড়া সেই লোক চাতালে দাঁড়িয়ে দেয়ালে খবরের কাগজ পড়ছিলো। কর্মচারীরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। যাচ্ছে এ-ঘর থেকে ও-ঘর। হাওয়ায় ধুলো আর তামাকের গন্ধ। নিত্যকার যা, তাই। উপরের তলার মাহর্কা ট্রাস্টের এক ডিরেক্টরের ব্যঙ্গচিত্র দেখছিলো সেই লোক, তার মুখে অলস একটি হাসি। অলগা যেই সেই খবরের কাগজের সামনে দাঁড়িয়েছে, ভদ্রলোক তার দিকে ফিরে ব্যঙ্গচিত্রের দিকে হাত দেখিয়ে (তার হাত কী ভারী, বড়, সুন্দর) বললে, 'মনে হচ্ছে তুমি একজন সম্পাদক, তাই না, কমরেড জোটাভা? (তার স্বর নিচু কিন্তু জোরালো) যত খুসি ছবি আঁকো আমার, কিচ্ছু

বলবার নেই। কিন্তু এটা যা এঁকেছো, হয়নি কিছুই, যেমন বোকা, তেমনি বাজে।'

ছুদিকে ছুটো টেলিফোন বাজছে আর হাতে চায়ের গ্লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে-ভদ্রলোক—এই হচ্ছে সেই ছবি। বিদ্রূপের ইঙ্গিত হচ্ছেএই যে, আফিসে কাজের সময়ও কাজে মন না দিয়ে মন দিয়েছে চা খাওয়ায়।

'জোরে ঘা মারতে তোমাদের ভয়, তাই শুধু ঘেউ-ঘেউ করো। এ হচ্ছে চাষাড়ে মনোভাব। সত্যি কথা, আমি চা খেতে ভালোবাসি, ১৯১৯ সালে জেগে থাকবার জন্যে আমি মদের সঙ্গে কোকেন মিশিয়ে খেয়েছি।'

অলগা তাকালো তার চোখের দিকে, ঠাণ্ডা ধূসর চোখ, ময়লা ইস্পাতের রঙ, বহুদিন আগেকার নির্বাপিত ছুটি প্রিয় চক্ষুর কথা মনে করিয়ে দেয়। বৃহৎ অথচ সুমিত তার পরিচ্ছন্ন মুখের ছাঁদ। তার হাসিটি অলস কিন্তু চতুর। তার সম্বন্ধে কী শুনেছে তা অলগার মনে পড়লো এখন: ১৯১৯ সালে সাইবেরিয়ান সরবরাহের সে সর্বেসর্বা ছিলো, সৈন্যদের খাওয়াবার সেই ছিলো মালিক, হাজার-হাজার মাইল জুড়ে তার নাম ছিলো একটা জাগ্রত আতঙ্ক। এ সব লোকদের সম্বন্ধে অলগার ধারণা যে তারা আকাশে মাথা ঠেকিয়ে হাঁটে। ঘটনা নিয়ে যেন তারা তাস ভাঁজে। আর এখন সে তাকে দেখছে, হাতে পোর্টফোলিও, মুখে শ্রান্ত হাসি, যে-জীবন সে তৈরি করেছে তা বয়ে যাচ্ছে তাকে ঠেলে ফেলেই।

আবার সে বললে, 'সমস্ত জিনিসকে তুচ্ছতায় নিয়ে আসার কোনো মানে হয় না। এইভাবে তুমি সমস্ত বিপ্লবকে সস্তা ব্যঙ্গচিত্রে নিয়ে আসতে পারো। বুড়োরা তাদের কাজ শেষ করেছে, বলতে চাও তা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু না? পেয়ে গেছে তাদের মাইনে, এবার বসে-বসে শুধু বিয়ার খাবে? আমাদের তরুণেরা চমৎকার, কিন্তু অতীত থেকে সরে যাবার মতো বিপদ আর কিছুতে নেই। শুধু প্রজাপতিরা, এক দিনের জন্য যাদের আয়ু, তারাই শুধু বাঁচে বর্তমানে। বুঝলে?'

বলে চলে গেলো। অলগা তাকালো তার পিছনে, তার বলবান ঘাড় ও তার প্রশস্ত কাঁধের দিকে, যেমন সে ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে মাহর্কা ট্রাস্টের আফিসের অভিমুখে। তার মনে হলো যেন সে প্রচণ্ড চেষ্টা করছে যাতে বয়সের ভারে তাকে কুঁজো না দেখায়। তার জন্যে তীব্র করুণা অলগার হৃদয়কে বিদ্ধ করলে। আর কে না জানে এই করুণাই···

প্রথম সুযোগেই কর্মচারী-সমিতি থেকে চিঠি নিয়ে অলগা মাহর্কা ট্রাস্টের আফিসে এসে হাজির হলো আর সোজাসুজি ঢুকলো ডিরেক্টরের কামরাতে। পোর্টফোলিওর উপর প্রকাণ্ড কেক, ভদ্রলোক চামচ দিয়ে তার চা নাড়ছে। জানলার কাছে বসে টাইপিস্ট মেয়ে চলেছে খটখটিয়ে। অলগা এত অভিভূত যে সে-মেয়ের উপস্থিতি তার চোখেই পড়লো না। সে দেখছে শুধু তার ইস্পাত-কঠিন চোখ। চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে ভদ্রলোক সই করলো। তবু অলগা দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোক বললে, 'আচ্ছা, বেশ। এবার যেতে পারো।'

শুধু এই ?···অলগা যখন দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছিলো যেন শুনতে পেলো পিছনে সেই টাইপিস্ট মেয়ের হাসি! তার এখন পাগল হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। এখন কেউ আর তাকে পাঁচ-পাউণ্ড ওজনের ভার দিয়ে মাথায় ঘা মারতে পারবে না, কিংবা কয়েদখানায় পারবে না গুলি করতে। আর সে, সে আসবে না তাকে বুকে করে জেলখানা থেকে বাইয়ে নিয়ে যেতে, বসবে না তার বিছানার পাশে, আর মৃত স্কুল-ছাত্রের পা থেকে খুলে আনবে না তার জন্যে এক জোড়া জুতো।

মনে করতেও ইচ্ছে করছে না কী করে তার সে-রাত কেটেছিলো। পর দিন সকালে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলো তাকে বাসিন্দেরা, আর তখনই পিটর মরুস্ বলেছিলো, তার ঘরে দশ গ্র্যাম আইডোফরম্ ঢুকিয়ে

দিলে কেমন হয়।
'আমাদের কালসাপ পাগল হয়ে গেছে।' এই দাঁড়ালো রান্নাঘরের রায়।
সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা রহস্যের হাসি হাসলে, তার নীল চোখে অসীম আত্মনির্ভর।
মৃত্যুর ভয় দমন করা যত সহজ লজ্জা দমন করা সহজ নয় তত। এই দ্বিতীয় যুদ্ধের ভিতর দিয়ে অলগার এই যাত্রা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না—যদি করতেই হবে, যে কোনো উপায়েই করতে হবে। কখন সুযোগ আসে তার জন্যে বসে থাকা, বাজে কাজে, ঘুর-পথে সময় অপব্যয় করা—কখনো মাংসরংঙের মোজায় পা দেখানো, কখনো বা নগ্ন কাঁধ, চারিদিকে কালো সিল্কের পাড় মোড়া—এ-সব কৌশল তার জন্যে নয়। সে ঠিক করলো সোজা সে যাবে, খোলাখুলি সব বলবে, আর তার যা খুসি তাই সে করুক। এ তার যা জীবন, এ একেবারে নিরর্থক।
কত বার তার ইচ্ছে হয়েছে সিড়ি দিয়ে ছুটে তার জামার হাতা ধরে তাকে থামায়, আর সেখানে দাঁড়িয়েই তাকে বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার অসীম দুঃখ···' কিন্তু প্রতিবারেই সে তার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসেছে, অন্যান্য কর্মচারীদের জনতায় তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। এই সময়েই সে হাউস-কমিটির সভাপতি জুরাভলেফের দিকে জ্বলন্ত স্টোভ ছুড়ে মেরেছিলো। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ফ্ল্যাটটাই যেন বিদ্যুতে বোঝাই হয়ে আছে। অলগার পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা পালালো রান্নাঘর ছেড়ে। রসিক ভ্লাডিমির পোনিজোফস্কি ধার-করা চাবি দিয়ে জোটোভার ঘর খুলে ঢুকে তার মাদুরের নিচে রাখলো একটা কাপড় ঝাড়বার ব্রাশ, কিন্তু তা লক্ষ্য না করেই জোটোভা রাত কাটালো ঘুমিয়ে।
তারপর একদিন ডিরেক্টর আফিস থেকে ফিরছিলো হাঁটা পায়ে (তার মোটর গেছে সারাতে)। অলগা তাকে ধরে ফেললো, ডাকলো

নাম ধরে, জোরে, কাঠখোট্টার মতো—তার মুখ,গলা সব শুকিয়ে গেছে। পাশে-পাশে চললো তার সঙ্গে, চোখ তুলে তাকাতে সাহস নেই, শুধু পায়ের তাল রেখে চলেছে, কনুই দুটো চলেছে বেখাপ্পার মতো। একটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে যেন অনন্তকালের মতো ; একই সময়ে গরম আর ঠাণ্ডা, কোমল আর ক্রুদ্ধ মনে করছে সে নিজেকে। ডিরেক্টর শুধু হেঁটেই চলেছে, উদাসীন, হাস্যহীন, নিষ্ঠুর।

'ব্যাপারটা হচ্ছে…'

'ব্যাপারটা হচ্ছে', ডিরেক্টর বাধা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'সবাই আমাকে তোমার সম্বন্ধে বলছে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ও, হ্যাঁ, তুমি আমাকে অনুসরণ করছো। তোমার মতলব খুব পরিষ্কার—হ্যাঁ, মিথ্যে বোলো না, কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না তোমার। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি হাভাতে নই, সুন্দর মুখ দেখলেই আমার নাল গড়ায় না। রাজনীতির দিকে তুমি তোমার জীবনকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছ। আমার পরামর্শ যদি শোনো, তোমার মাথা থেকে ঐ সব সিল্কের মোজা আর স্নো-পাউডারের বুর্জোয়া স্বপ্ন দূর করে দাও। খাঁটি কমরেড হবার জিনিস এখনো তোমার মাঝে আছে।'

বিদায়ের মামুলি সম্ভাষণ না জানিয়েই সে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেলো ওপারের ফুটপাতে, একটা মেঠাইয়ের দোকানের পাশে, যেখানে তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা। সনিয়া ধরলো তার বাহু আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কি যেন বললো রেগে-রেগে। বিরক্তিতে ভুরু আরো কুঁচকে ডিরেক্টর ছাড়িয়ে নিলো তার বাহু আর চলে গেলো সোজা, তার ভারি মাথাটা সামনের দিকে নোয়ানো। একটা চলন্ত মোটর-বাসের ধোঁয়া অলগার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলো তাদের।

তা হলে নায়িকা হচ্ছেন ঐ সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা। ওই তা হলে এই

"সৈন্যবেশ্যা" জোটোভার অতীত ও বর্তমান জীবনের কথা বলেছে ঐ মাহর্কা ট্রাস্টের ডিরেক্টরকে। সনিয়া জিতেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভয়ও কি পায়নি কিছুটা?

সেই রবিবার যার কথা বলা হয়েছে আগে, অলগার ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ শুনেই সনিয়া ছুটে গেলো তার ঘরে, আর ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো—সর্বদা এমনি ভয়ে-ভয়ে থাকা সত্যিই যন্ত্রণাদায়ক। গা ধুয়ে অলগা দু-দুবার শয়তানের নাম করলে—প্রথম রান্নাঘরে, পরে তার নিজের ঘরে। শেষে বেরিয়ে গেলো রাস্তায়।

রান্নাঘরে আবার জড়ো হয়েছে বাসিন্দেরা: পিটর মর্‌স্ তার রবিবারের প্যান্ট্যালুনে আর শাদা টুপিতে, খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়ে ভ্লাডিমির পোনিজোফস্কি, মাতলামির পর বড় বেশি ফুর্তিবাজ। রোসা বেসিকোভিচ তৈরি করছে কুলের জ্যাম, মেরিয়া আফানাসিয়েভনা ইস্ত্রি করছে তার স্কার্ট। সবাই গল্প করছে, ঠাট্টা করছে। ফোলা চোখে সনিয়া ভ্যারেণ্টসোভা এসে হাজির।

'অসম্ভব, এ ভাবে চলতে পারে না কখনো। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া উচিত। কোন দিন বা ও আমার গায়ে য়্যাসিড ছুঁড়ে মারবে।'

তক্ষুনি ভ্লাডিমির পোনিজোফস্কি বললে: 'কাপড়-ব্রাশের দাঁড়াগুলি কাল-সাপের বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে আসা যাক, তা হলেই আপনা থেকেই সরে পড়বে মেয়েটা।' পিটর মর্‌স্ একটা রাসায়নিক আক্রমণের পরামর্শ বাতলালে, 'দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু আইডোফরম বা গন্ধক ঢুকিয়ে দেয়া যাক ঘরের মধ্যে।' কিন্তু ও-সব শুধু ধোয়াটে কল্পনা। কাজের কথা বললে শুধু মেরিয়া আফানাসিয়েভনা।

'তুমি বড্ড লুকোনে মেয়ে ডলি, বলি ডিরেক্টরের সঙ্গে তোমার ব্যাপারটা আইনের চোখে পাকাপাকি করে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি বৈকি। তিন দিন হলো গিয়েছিলাম রেজিস্ট্রারের

আফিসে। আমি এমন কি গির্জেয় বিয়ের জন্যে পেড়াপীড়ি করছি—কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি—'
'তাড়াতাড়ি কিসের ?' পিটর মবুস্ ফোড়ন দিলো।
'তোমার কী করা উচিত জানো ?' বললে মেরিয়া আফানাসিয়েভনা: 'ঐ কালসাপের মুখের উপর তোমার বিয়ের সার্টিফিকেটটা ছুঁড়ে মারা।' বলে কাকে যেন সে মারতে উদ্যত হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে ইস্ত্রিটা উঁচিয়ে ধরলো।
'ওরে বাবা, কী সর্বনাশ !···আমার বাবা, ভীষণ ভয় করবে—কি জানি কেন···'
'আমরা সব দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবো। তোমার কিছু ভয় নেই।' মদে তখনো চুলবুল করছে, বললে ভ্লাডিমির পোনিজোফস্কি, 'আমরা সব রান্নাঘরের হাতাখুন্তি নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো বাইরে।' ডলিকে শেষ পর্যন্ত প্ররোচিত করলো তারা।
রাত আটটায় ঘরে ফিরলো অলগা, ক্লান্তিতে ভাঙা, মুখে মাটির রং। বন্ধ করলো দরজা, বসলো বিছানার উপর, কোলের উপর দুটি হাত একত্র করা। একটা বন্য শত্রুসংকুল দেশে সে একা, কেউ তাকে চায় না, একেবারে একা, মৃত্যুর মুহূর্তে যে একাকীত্ব। কাল থেকেই একটা অদ্ভুত অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ দেখতে পেলো হাতের মুঠোয় তার রিভলভারটা, দেয়াল থেকে কখন যে তুলে নিয়েছে খেয়াল নেই। বসে-বসে ভাবছে আর তাকাচ্ছে সেই শক্ত, নিষ্ঠুর ইস্পাতের খেলনাটার দিকে।
কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ভীষণ চমকালো অলগা। আবার শব্দ, এবার আরো জোরে। উঠে দরজা খুলে দিলো সে। বারান্দায় একসঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সব বাসিন্দেরা, কারু হাতে মেঝে সাফ করার ব্রাশের দাঁড়া, কারু হাতে বা স্টোভ খোঁচাবার সুঁচ। ঘরে এগিয়ে

এলো ভ্যারেণ্টসোভা, ঠোঁট দুটো চাপা, মুখ নীরক্ত। সরু ইঁদুরের গলায় বললে সে দম না নিয়ে : 'বিবাহিত ভদ্রলোকের পিছু নিতে লজ্জা করা উচিত'। এই দেখ রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কে না জানে যে খারাপ রোগ আছে তোমার। তা সত্ত্বেও তুমি জীবনে উন্নতি করতে চাও, আর তা কিনা আমারই বিবাহিত স্বামীর মারফৎ। তুমি তো একটা বেশ্যা। এই দেখ সার্টিফিকেট।'

অলগা যেন অন্ধ হয়ে গেছে এমনি চোখে তাকালো সে সনিয়ার দিকে। তারপর হঠাৎ একটা অতিপরিচিত বন্য ঘৃণার ঢেউ তার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠলো, তার শরীরের সমস্ত পেশী আঁট হয়ে গেলো ইস্পাতের মতো। গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা কর্কশ কান্না। ছুঁড়লো গুলি, আর শাদা একটা মুখ, যে-মুখ তার চোখের সামনে তখন নাচছে, তার উপর অনবরত মেরেই চললো সে গুলি।

বোরিস্ পাস্তেরনাক

রিক্ত বৎসর

শীতের গোধূলিতে সমস্ত পৃথিবী মোড়া, যখন বরফে আকাশ নোয়ানো, আর যখন সূর্য উঠলেই গলবে সে-বরফ। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দ, চিহ্ন-হীন। আদিগন্ত প্রান্তর। কালো মাটি।

যতই ঢুকবে গভীরে ততই উঁচু খড়ের গাদা, নিচু কুঁড়ে ঘর, বিরলতর গ্রাম। আর তার পর—তার পর বিধ্বস্ত মরুমাঠ।

আকাশ ও মাঠের মধ্যেকার অন্ধকার ফাঁক দিয়ে বয় শীতের হাওয়া। শেষ ঘাস আর গম আর যব কাটা হয়ে গেছে, ছোট আগাছার দল আওয়াজ করে অস্পষ্ট। কাঁচের চাঁদ উঠে আসে। যদি মেঘ দল বাঁধে, তা হলে নির্ঘাৎ বরফ, কিম্বা বরফের বৃষ্টি।

শস্যের ক্ষেত।

রাস্তা যেখানে রেল-লাইন কেটে গেছে সেখানে ষাঁড় রয়েছে দাঁড়িয়ে, অনেক আগে থেকেই বাঁধা। ষাঁড়গুলো লম্বা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে—চেয়ে আছে মাঠের দিকে, যে মাঠে ওদের জন্ম। ওদের পাশ দিয়ে চলে যায় ট্রেন,চলে যায় দূরে। গ্রামে একটাও গির্জে নেই, আছে একটা দরিদ্র মসজিদ।

মরুমাঠ।

হামাগুড়ি দিয়ে আসে ট্রেন—তামাটে রঙের ঘোড়ার বাক্সগুলো লোকে বোঝাই, যেমন লোকগুলো বোঝাই উকুনে। নিঃশব্দে থামে ট্রেন। ট্রেনের ছাদে পা-দানিতে আনাচে-কানাচে ঝোলে লোক, আঠা দিয়ে

আটকানো। আর সেই ছোট্ট স্টেশনে, মার-জংশনে, যেখানে ট্রেন কখনো থামে না ও ক্রু-র কখনো বদল হয় না, সেখানে ট্রেনটা হঠাৎ দাঁড়ায়, আর মানুষ যেমন চেঁচায় তেমনি ডাক ছাড়ে। ছাদ থেকে ছাদের লোকগুলির যেমন চীৎকার, তেমনি এঞ্জিনটার, শীতের সন্ধ্যায় কেমন যেন ভয়ংকর। গ্যাভরিলা থামায় ট্রেনটাকে। স্টেশনে ডিউটিতে আছে যে-লোক, বয়স অল্প, লাল নিশেনওলা সৈন্যের টুপি মাথায়, এগিয়ে যায় ট্রেনের দিকে, যেন একঘেয়েমির শ্রান্তি অসহ্য লাগছে তার কাছে। ট্রেন থেকে যাত্রীরা জলের খোদলের দিকে ছুটে যায়। মৌচাকের মতো ট্রেনটা ভন্‌-ভন্‌ করে; তারপর মরচে-পড়া বুড়ো লোহায় টান দিয়ে ককিয়ে চলতে সুরু করে। পিছনে লাইনের তক্তার উপর পড়ে থাকে একটা চাষায় মেয়ে, শরীরের কী একটা ব্যথায় চোখ দুটো তার বিস্ফারিত। ছোটে কত ক্ষণ ট্রেনের পিছু-পিছু, হতাশায় ওঠে চেঁচিয়ে, 'মিটিয়া, ও মিটিয়া, দেখো আমার ছেলেমেয়েগুলোকে।'

তার হাতের বোঁচকাটা হাওয়ায় নাচে আর পর-পর সাজানো তক্তার উপর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটে যায়, গোঙায় ভয়-পাওয়া কুকুরের মতো। তার সামনে প্রান্তরের বিস্তীর্ণ শূন্যতা। পিছন ফিরে ছুটে চলে সে এবার স্টেশনে, যুবক কেরানির কাছে, কিছুই করবার নেই বলে যে তখনো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও আগাগোড়া লাগছিলো তার বিস্বাদ। মেয়েটা তার দিকে কুঁকড়ে ঝুঁকে পড়ে, কাঁপে তার ঠোঁট দুটো, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে যন্ত্রণায়।

'কী হয়েছে তোমার?' জিগগেস করে কেরানি।

মেয়েটা কিছু বলে না, চেঁচিয়ে ওঠে আর্তিতে, আর তেমনি অন্ধের মতো হাওয়ায় বোঁচকা নাড়তে-নাড়তে চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে চলে। বুড়ো তাতার, ক্রসিং-এর পাহারাওয়ালা, বলে, 'মেয়েটার ছেলে হবে, প্রসবের ব্যথা উঠেছে। ওগো মেয়ে, এদিকে এসো। রাশিয়ার মেয়ে, বেরালের

মতো। সেই বুড়ো মেয়েটাকে স্টেশনের মধ্যে তার নিজের ঘরে নিয়ে যায়, সেখানে একটা শোবার তক্তার উপর রয়েছে খড়ের মাদুর আর ভেড়ার চামড়ার কম্বল। লোকটা ঠিকই বলেছে, মেয়েটা বেরালের মতো শুয়ে পড়ে আর বুনো গলায় বলে চেঁচিয়ে, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। বদমাস কোথাকার। মেয়েছেলে কাউকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কিন্তু স্টেশনে কোথাও একটা মেয়ে নেই।

টানা প্ল্যাটফর্ম ধরে সেই কেরানি পায়চারি করে, আর অন্ধকার প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ভাবে—'এশিয়া।'

মাঠগুলি খালি, শব্দহীন। কাঁচের ছোট্ট চাঁদ আরো উঠে আসে আকাশে। বাতাস হেঁকে যায়, কর্কশ, কনকনে। প্ল্যাটফর্ম ধরে কেরানি অনেকক্ষণ হাঁটে, তারপর ঢোকে গিয়ে আফিসে। দেয়ালের মধ্য দিয়ে আসে সেই মেয়েটার আর্তনাদ। ফোন তুলে ধরে কেরানি পরের স্টেশনকে ডাকে (সমস্ত রাশিয়ান কেরানিরই মতো) আর বলে, 'আখ্‌মিটভা! আটান্ন বেরিয়ে গেলো। কেউ আসছে এদিকে?'

এদিকে কেউ নেই।

স্টেশনের শক্ত বেঞ্চির উপর সে বসে,আর যে-খবরের কাগজ সে হাজার-বার উলটিয়েছে তাই ফের ওলটায়। আর বসবে না বলে তারপরে শোয়। বুড়ো পাহারাওয়ালা আলো নিয়ে আসে। মধুর আবেশে কেরানি ঝিমোয়।

কাজের শেষে সে চলে যায় তার গাঁয়ের বাড়িতে। মার-জংশন (যেখানে ট্রেন কোনো থামে না ও ক্রু-র হয় না বদল) তক্ষুনি মুছে যায় অন্ধকারে। চার দিকে তৃণহীন শূন্য মাঠ। কেরানি মাঠ পেরিয়ে চলে যায়; জায়গায়-জায়গায় কবরের স্তূপ, কারা কবে গাদা করেছিলো মাটি, আর কী না জানি রয়েছে তার অন্তরালে—চার দিকে সেই মৃতের জিজ্ঞাসা। সেই

মৃত্যুর স্তূপের উপর নড়ছে ঘাসের গুচ্ছ। পিচের মতো শক্ত গ্রামের কালো মাটি, লাগছে পায়ের তলায়।

গাঁয়ে কোথাও একটা টু শব্দ নেই, থেকে-থেকে শুধু কুকুরের ঘেউনো। তাতারদের গ্রাম পেরিয়ে ঢোকে সে পাহাড়ের গহ্বরে, যেখানে ফিন্‌দের বসতি, তারপরে উলটো দিকের ঢাল ধরে নেমে যায়। কুঁড়ে ঘরে সৈন্যের বৌ টেবিলের উপর দুধ ও শুয়োরের চর্বি সাজিয়ে বসে আছে। কেরানি খায়, নেকড়ে বাঘের মতো খাওয়া শেষ করে, পরে সব চেয়ে ভালো পোশাক, বেরিয়ে যায় স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।

শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে উনুনে সে নতুন এক টুকরো কাঠ ফেলে, তার আভায় অন্ধকার গলে যেতে সুরু করলে সে বলে ওঠে,'এশিয়া। কোনো দেশ নয়, শুধু এশিয়া। তাতার, ফিন্‌, ঘোরতর দারিদ্র্য। কোনো দেশ নয়, শুধু এশিয়া।'

আর নিজের চরমতম দারিদ্র্যের কথা মনে করে।

শিক্ষয়িত্রী স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে, তুলোর মতো শাল গায়ে, বয়সের রেখার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সামোভার জ্বালিয়ে কিছুটা যবের কফি তৈরি করে···

অনেক রাতে কেরানি বাড়ি ফিরে আসে তার ছোট ঘরে,সৈন্যের বৌয়ের সঙ্গে ঘুমুতে। খাটটা শব্দ করে, কোণে গিটারের তার টুংটুং করে ওঠে। স্টোভের পিছনে একটা শুয়োরের ছা নাক ডাকায়। সৈন্যের বৌ টেবিল সাফ করে, যায় বাইরে। পাতলা মাটির দেয়ালের মধ্য দিয়ে শোনে তাড়া খেয়ে কোথাকার কে একটা ক্ষুধার্ত কুকুর দূরে হটে যায়। সব শোনে আর অনেক আশ্চর্য ছবি তার মনে আসে: টাকার, সুন্দর সুসজ্জিত মেয়ের, কায়দা-দুরস্ত ফ্রকের, মদের, পার্টির, যা কিছু সব সুখের সব কিছুর। সব কিছুর, যা একদিন তার হবে। বৌটা অনেকক্ষণ ধরে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করে। আলো নিভে যায়, মাটির মেঝের উপর

মেয়েটা খালি পায়ে হাঁটে, গা চুলকোতে-চুলকোতে কেরানির পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

প্রান্তরের উপর দিয়ে রাত্রি চলে যায়। আগাছার দল বাতাসে শব্দ করে। শব্দ করে কবরের ঘাস। বিন্দুবৎ মার-জংশনকে প্রান্তরের প্রান্তে চোখে দেখা যায় কি না যায়।

আটান্ন নম্বর মিক্‌সড্ ট্রেন কালিঢালা প্রান্তরের পার দিয়ে আসে, দাঁড়ায়।

লোক আর লোক, পা, হাত, পেট, মাথা, পিঠ, আর যত রাজ্যের যত রকমের নোংরা; গাড়ির মধ্যে পিলপিল করছে লোকগুলো, যেমন লোকগুলোর মাথায় পিলপিল করছে উকুন। গাদা-করা বস্তা-ঠাসা লোকগুলো, তবু সেখানে তাদের স্বত্ব নিয়ে মারামারি করে, তাদের ট্রেনে চড়বার অধিকার নিয়ে, গায়ের জোর ফলাতেও কসুর করে না। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে হাজার-হাজার এমনি নিরাশ্রয় প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেনে এসে চড়াও হচ্ছে, ভিতরের লোকদের মাথা পিঠ ঘাড় পা ঠেলে, মাড়িয়ে চটকে থেঁতলে চেষ্টা করছে ভিতরে ঢুকতে—আর, এ মারছে, ও মারছে, একে টানছে, ওকে টানছে, এ পড়ছে টলে, ও পড়ছে আছড়িয়ে। যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়ছে ততক্ষণ চলছে এই হুটোপুটি, আর যারা কোনো মতে লেগে থাকতে পারছে তাদের নিয়ে চলেছে ট্রেন। যারা কোনো রকমে ঢুকতে পেরেছে তারা আবার পরবর্তী মারামারির জন্যে নতুন করে প্রস্তুত হচ্ছে।

দিনের পর দিন এমনি চলেছে তারা ট্রেনে, অবিচ্ছিন্ন নোংরামির মধ্যে। শিখেছে কী করে ঘুমোতে হয় বসে, দাঁড়িয়ে, ঝুলতে-ঝুলতে। ঘোড়ার বাক্সে লম্বালম্বি কোনাকুনি তাক আছে অনেকগুলো, তার উপরে ও তলায়, মেঝেতে যত কিছু সম্ভাব্য কোণে ও গর্তে, আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে, জড় হয়ে আছে শব্দহীন নরদেহের স্তূপ, পরের

স্টেশনের জন্যে সমস্ত কোলাহল মজুত রেখে। গাড়ির মধ্যেকার বাতাস দিশি তামাক ও উদ্গারের গন্ধে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে গাড়ি একেবারে অন্ধকার, জানলা বা বাতাস চলাচলের ফোকর সব বন্ধ। কেউ ঘুমের মধ্যে ব্যাঙের আওয়াজ করছে, কেউ চুলকোচ্ছে খচখচ করে, আর ঝরঝরে গাড়িটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে-করতে চলেছে। গাড়ির মধ্যে একটু নড়োচড়ো এমন সাধ্যি নেই, একজনের পা আর একজনের বুকের উপর, আর তৃতীয় জন তার উপরে শুয়ে, আর তার পা প্রথম জনের ঘাড়ে। তবু, তবু, তারা নড়ে-চড়ে।

একটা লোক, দুটো ফুসফুসই পোকায় প্রায় সাবাড় করে দিয়েছে, গড়াতে-গড়াতে এগিয়ে আসে বাইরের দরজার দিকে, চার দিকে চেপে ধরে মেয়ে-পুরুষ সবাই তাকে জায়গা করে দেয়, দরজাটা খুলে ধরে একটু। তারপর সে কোনো রকমে ঝুলে বসে দরজার ধারে, নিজেকে নিরুদ্বেগ করে—মেয়ে-পুরুষ যার যা দরকার, শিখে নিয়েছে সব গোপনীয় খুঁটিনাটি কৌশল।

যক্ষ্মার শেষ আগুনে জ্বলছে সেই লোকটা—অদ্ভুত ভাবে খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে তার সমস্ত চেতনা। সুখে-দুঃখে সমান অবিচলিত থাকবার কথা, তার ব্যক্তিগত সম্মানের কথা। তার ঘর, তার পুঁথিপত্র, আর এই দুর্ভিক্ষের কথা– গেছে সব রসাতলে। অসংখ্য বিনিদ্র রাত্রির পর তার সব চিন্তা এখন জ্বরতপ্ত লোকের চিন্তার চেহারা নিয়েছে—আর তার মনে হচ্ছে তার এই "আমি" দুই খণ্ডে, তিন খণ্ডে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। তার ডান হাতটা বাঁচছে আর ভাবছে অসম্পৃক্ত ভাবে, খণ্ডিত "আমি"র আরেকটা ডান হাতের সঙ্গে ঝগড়া করছে কী নিয়ে।

দিনের পর রাত, মালগাড়ির পর মালগাড়ি, স্টেশনের ধারে ছোট গ্রাম, থার্ডক্লাশ, পা-দানি আর ছাদ—সব মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ওরা হেঁটে যাক ওর উপর দিয়ে, থুতু ফেলুক, উকুন ঝরিয়ে দিক। দুঃখে

অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ থাকবার সে সব প্রবন্ধ, সোস্তালিজমের উপরে, যক্ষ্মার উপরে, আর ঈশ্বর সম্বন্ধে বই—সে ভাবে একটা নতুন ও আশ্চর্য একভ্রাতৃত্বের কথা—ঘুমে কাটা পড়ে আর কারু গায়ের উপর ঢলে পড়া, আঁকড়ে থাকা—কে সে? সিফিলিসের রুগী, না টাইফয়েডের? কার সঙ্গে ঘেঁষে বসে সে নিজেকে গরম করছে আর তাকেও গরম করছে—কে সে! হর্ন, হুইসল আর ঘণ্টা। তার মাথা তুলোর মতো তুলতুলে হয়ে এসেছে, আর তুলো যেমন গরম, তেমনি তার অদ্ভুত সব চিন্তা আর আকুল সব ইচ্ছা, জ্বরের নির্বাণের সীমানায়।

আর শব্দ করছে দরজা আর কড়ি। আর মেয়েরা, মেয়েরা, মেয়েরা কেউ বসে-বসে, কেউ বা শেকল ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুলছে। এবার যৌন আকর্ষণ···

কাল ছোট একটা স্টেশনে কে-একটা চাষার মেয়ে উঠতে চেয়েছিলো গাড়িতে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো এক সৈন্য।

'ডার্লিং! আমাকে ঢুকতে দাও দয়া করে। ক্রাইস্টের দোহাই, ঢুকতে দাও আমাকে। কোথাও আর একতিল জায়গা নেই।' বললে মেয়েটা।

'না মাসি, জায়গা নেই। চেষ্টা কোরো না। একদম জায়গা নেই কোথাও।' বললে সেই সৈন্য।

'আমাদের ক্রাইস্টের দোহাই—'

'উঠতে দিলে কী দেবে আমাকে ফেরাফিরতি?'

'তা হবে 'খন—'

'তুমি কি চাচ্ছ—'

'তা সে ঠিক হবে 'খন···ও নিয়ে আমরা ঝগড়া করবো না।'

'বেশ, চলে এসো তবে। ঐ বাঙ্কের তলায় গিয়ে ঢোকো। ঐখানে আমাদের কোট আছে। ও সেমিয়ন, ছুঁড়িকে ঢুকতে দাও তো—'

সৈন্যটাও হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে বাঙ্কের নিচে, লোক জড়ো হয় চার

পাশ থেকে। আর সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত রুগীর মন মধুরতম অথচ পাশবিকতম বেদনায় টনটন করে ওঠে—ইচ্ছে করে কেঁদে চেঁচিয়ে ওঠে আর যে মেয়ে সামনে এসে পড়ে তাকেই আঁকড়ে ধরে নির্দয়ের মতো। যুক্তি, ভদ্রতা, লজ্জা, সুখদুঃখে সমান ঔদাসীন্য—সমস্ত সভ্যতা নরকে গিয়ে বসেছে। আমরা এখন চাই শুধু পশুকে।

আবার তার মাথায় দরজার কাঠামোটা দুলে-দুলে ওঠে।...স্ত্রীলোক, ঝাঁকবাঁধা ভিতরকার স্ত্রীলোক...তার ব্যক্তিত্ব দুদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, এসে পৌঁছয় একই বেদনার মোহানায়। বুকের মধ্যে কী আছে, যার সঙ্গে তার হৃদয় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে...মালগাড়ি ক্যাঁকোঁ করে ওঠে, আর লাফায়।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমে কাটা প'ড়ে লুটিয়ে পড়ে কার পায়ের তলায়। কে আবার তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। একটা নিশ্চেতন পাথরের মতো সে ঘুমোয়। সমস্ত মালগাড়িটাই ঘুমে নিঝুম। স্টেশন, হুইসল, গাড়ির লাফ।...এক মুহূর্তের জন্যে তার ঘুম ভাঙে। তার মাথা, তার আমিত্ব যেখানে এক, দুই, দশ অংশে বিচ্ছিন্ন, কে-একটা স্ত্রীলোকের নগ্ন পেটের উপর শুয়ে আছে। মেলায় জাঁকালো পোশাক-পরা মেয়ের দলের মতো তার চিন্তা ভিড় করে আসে—চুলোয় যাক ভগবান—পশু আর তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—সে চুমু খায় সেই উলঙ্গ নারীমাংস, চুমু আর চুমু—আর্ত ও আকুল—কে এই নারী, কোত্থেকে?

তারপর সেই চাষানী ধীরে-ধীরে জাগে, গা চুলকোয়, অস্ফুটস্বরে বলে, 'ঢের হয়েছে, বদমাস কোথাকার...' তারপর...'তুমি দেখছি খুব তুখোড়...'

তার নিশ্বাস দ্রুত ও অনিয়মিত হয়ে ওঠে।

মরুময় বন্য মাঠ...শেষহীন বিস্তার, অন্ধকার আর তুহিনশীতল।

যে-স্টেশনে ট্রেন প্রথম থামে সূর্যোদয় দেখে, সেখানে তারা ছুটে যায় খালি কুয়োর দিকে, জলের ছোট ডোবার দিকে, গা গরম করবার জন্যে আগুন করে, আলু সেদ্ধ করে—তারপর চেয়ে দেখে খালি গাড়ির মধ্যে একটা মৃতদেহ—একটা কে বুড়ো, আগের দিন সে কষ্ট পাচ্ছিলো তীব্র টাইফয়েডের যন্ত্রণায়, আজ সে নির্বাক।

ধূসর, বিষণ্ণ, তন্দ্রালু প্রভাত। প্রান্তর-দিগন্তের অন্ধকার ফাটল থেকে শীতল ও পাপার্ত বাতাস বয়। মেঘ নুয়ে-নুয়ে চলে—নিশ্চয়ই বরফ পড়বে। রেলের লাইন, মালগাড়ি, চাকবাঁধা জনতা। আগুনের লাল শিখা, ধোঁয়ার গন্ধ। আগুনের কাছে যেখানে মেয়ে-পুরুষ রাঁধছে, খুলে ফেলছে তাদের শার্ট আর ব্লাউজ, পাজামা আর পেটিকোট, ঝেড়ে ফেলছে উকুন আর মারছে নিকি, সশব্দে। শস্যের খোঁজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। রুটি তৈরি করবার কিছু নেই, নেই একটুও নুন। আলুই উবু-উবু গেলে। ট্রেন দাঁড়িয়েছে সেখানে এক দিন বা দু দিনের জন্য। এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে, তারা শ'য়ে-শ'য়ে আশে-পাশের গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে (যত দূরে ততই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন কুঁড়েঘর, আর ততই উঁচু-উঁচু গাদা) আর ছোট-ছোট দলে ভিক্ষে চায়। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলো নিচু হয়ে-হয়ে ককায়: 'চারটি খেতে দাও, ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন।'

ট্রেনটা দাঁড়াতে পারে এক দিনের জন্যে, দুদিনের জন্যে। ভারপ্রাপ্ত কেরানির কাছে গার্ডরা আসে, তারপর যায় একস্ট্রাঅর্ডিনারি কমিটিতে। শ্বেত-রাশিয়ানরা এখানে এসেছে, লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বন্ধ গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে, গাড়ির সারি, দরজার জন্যে ফোকর করা। আফিসে—অন্ধকার একটা গাড়ি—লোহার একটা ধোঁয়ানো স্টোভ, গালার গন্ধ, তারের শব্দ, লোকের ভিড়।

কে একটা লোক কেরানির কানে ফিসফিসিয়ে কী বললো।

‘অসম্ভব, অসম্ভব।’ তৃপ্ত, মোটা গলায় কেরানি বলে, ‘সব ভর্তি। পঁচাত্তরটা মালগাড়ি আর দেড়শো বগি—অসম্ভব।’

চুল এসে লাগে চুলে, হাত হাতে ; আর সেই লোকটা এক বাণ্ডিল নোট আলগোছে গুঁজে দেয়।

‘এ হতেই পারে না। যদি কিছু করে দিতে পারতাম, নিতাম তা হলে। কিন্তু এখানে, পঁচাত্তরটা মালগাড়ি, দেড়শো বগি—কিছুই করবার নেই।’

আবার চুল এসে লাগে চুলে—এবার ঘনতর তেল।

এবার মনে হয়, কেরানি ইচ্ছে করলেই পারে। বিকেলের শেষে আবার একটা ট্রেন আসে, নতুন জনতা ফের আলো জ্বালে—উকুন মারে—আর রাত্রে এই ট্রেনই আগে রওনা হয়!

ওরা সব ছুটে যায় কেরানির কাছে, কিন্তু কোথাও সে নেই, তার জায়গায় অন্য লোক। (গার্ডরা ওদের শান্ত করে : শুনছো না তার ডিউটি গেছে ফুরিয়ে। তোমরা শোননি এই এক হপ্তায় তাকে সাত বার আক্রমণ করা হয়েছে) তখন তারা ছুটে যায় একস্ট্রাঅর্ডিনারিতে—কিন্তু রাত্রে লালফৌজের এক দল এসে পৌঁছয় আর সমস্ত ট্রেন আতিপাতি করে খোঁজে।

একটা স্তব্ধীকৃত গাড়িতে একজন লাল সৈন্য উঠে আসে। ‘কে তুমি বেরিয়ে এসো। বার করো শিগগির।’

বাঙ্কের উপরে বসা একটা বুড়ো তার টুপি খুলে সেটা এগিয়ে দেয়। ‘এসো ভাগাভাগি করে নি। সবাই আড়াইটে করে…’

পরের দিন ভোরে ট্রেন ছাড়ে।

কেরানি এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায় আর হাজার-হাজার কণ্ঠে তাকে বিদায় জানায় ট্রেনের কামরা থেকে। ‘শুয়োরের বাচ্চা! ঘুসখোর!’

ট্রেন যেন হেঁটে চলে। সেই আদিগন্ত প্রান্তরের বিধ্বস্ত শূন্যতা। শীত আর দুর্ভিক্ষ। দিনে সেই প্রান্তরের উপরে ঝিমোনো সূর্য ওঠে। শীতের

স্তব্ধতায় দাঁড়কাকের দল, শোকাকুল দাঁড়কাকের দল লুণ্ঠিত মাঠের উপর উড়ে আসে। বিরল গ্রামের বিচ্ছিন্ন কুঁড়েঘর থেকে, শোকাকুল কুঁড়েঘর থেকে খড়-পোড়ার নীলচে ধোঁয়া ওঠে।

রাত্রে বরফ পড়ে, আর পৃথিবীর সঙ্গে প্রভাতের সাক্ষাৎ হয় দুঃসহ শীতের মধ্যে। কিন্তু বরফের সঙ্গে আসে একটু উষ্ণতা, মনে হয়, আবার শরৎ। আসে, বৃষ্টি হয়ে ঝরতে ; আর পৃথিবী ভিজে আকাশের নিচে ঠাণ্ডার চাদরে গা মুড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। বরফ যেন ছেঁড়া শাদা কাপড় পরে শুয়ে আছে।

ওল্ডকুর্ডিয়ুম গ্রাম প্রান্তরের নির্জন গর্তে ঝরনার ধারে গা-ঢাকা দিয়ে আছে ; সেই গ্রামের কেউ জানে না কোথায় দিগন্তের শেষ, কোথায় এশিয়া।

সেই গ্রামে রাশিয়ানদের পাড়ায়, তাতারদের পাড়ায়, ফিন্‌দের পাড়ায়, কুঁড়েঘরের সামনে বেঁটে-খাটো গোলাঘরে, কুঁড়েঘরের পিছনে গাদা-মারা শস্য—গম, যব, সরষে আর যই—খাদ্য। তাদের শস্য কাটা সারা হয়েছে, এবার তাদের শান্তি আর বিশ্রামের দিন।

এই দিনেই রাশিয়ান পাড়ায় বাষ্প-স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। ঝরনার নিচে একটা মাটির ঘরেই স্নানের জায়গা। গ্রামের মেয়েরা খালি পায়ে আসে জল নিয়ে। ভিতরে ঘরের মালিক ছাই বাছে আর কাপড়ের টুকরো কুড়োয়, আর তারা সকলে স্নানের ধোঁয়া খায়—বুড়ো চাষা আর জামাই, ছেলেপিলে আর তাদের মা, স্ত্রী আর বউ, আর যত কুমারীর দল—সব একসঙ্গে। স্নানের ঘরে কোথাও একটা চিমনি নেই—আর সেই কার্বন-ডায়কসাইডে, বাষ্পে, লাল আভায় আর উত্তাল এলোমেলোমিতে মানুষের শাদা দেহগুলি গুঁতোগুঁতি করে ; সবাই একই ক্ষার-জলে গা ধোয় আর সেই মালিক প্রত্যেকের পিঠ ঘসে দিলে তারা ঝরনার জলে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ধূসর কুয়াসাচ্ছন্ন ভোর বেলায়। খোদলে-খোদলে বরফ জমতে থাকে।

আর অপর পারে তাতারদের পাড়ায়, যেখানে মিনার মাথা উঁচু করে আছে, সেখানে তাতাররা মাদুর বিছিয়ে পুবে, অদেখা সূর্যের দিকে মুখ ক'রে প্রার্থনা করে, তারপর ধোয় হাত-পা, শেষে মোজা পায়ে মাথায় চ্যাপটা টুপি এঁটে কার্পেট-কুশান-বিছানো ঘরে যায়, আর ঘরের মধ্যিখানে মেঝের উপর বসে ভেড়ার মাংস খায়, শব্দ করে-করে চিবোয়, আঙুল বেয়ে টস-টস করে ঝোল গড়ায়। চোখে পড়ে বুড়ো একটা লোক, পিছনে মেয়েরা জলের জগ হাতে করে দাঁড়িয়ে (যেন মেয়েরা প্রার্থনাও করবে না, খাবেও না)।

আর সেই মুহূর্তে ওল্ডকুর্ডিয়ুম গ্রামে খাবার সন্ধানে ভিক্ষুক ভবঘুরেরা দলে-দলে এসে পড়ে।

মাঠের পাশে কুয়োর ধারে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে একদল ফিন্ আছে দাঁড়িয়ে, মেয়েদের মাথায় শিং আর পাগুলো কাঠের মতো ; আর বেঁটে-খাটো পুরুষ-চাষাদের মুখে দাড়ি, আর মাথায় মাটির গামলার মতো টুপি, বুকে বেল্ট-বাঁধা হাঁটু পর্যন্ত জামা, বেল্টে ঝুলছে সূঁচের কাজ-করা ঝালর—কিন্তু আসলে বড্ড নিরীহ ও নীরব। নীরক্ত মুখ তুলে দুঃখী একটা চাষা বলে মৃদুস্বরে : 'রূপোর টাকা, রূপোর টাকা দিন। দিন কিছু বার্লি, গম, দিন রূপোর টাকা।' বলেই ছুটে নিজের দলে গিয়ে ভেড়ে।

তার জায়গায় দাঁড়ায় এসে এক স্ত্রীলোক, মাথায় যার শিং, পা যার কাঠের মতো। বলে, 'রূপোর টাকা, দিন রূপোর টাকা। কিছু বার্লি, দিন কিছু গম।' বলে চোখ মটকিয়ে মুচকে-মুচকে হাসে, ছুটে পালিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে—চোখ তার সূর্যমুখী-বিচির মতো, যেন সৈন্যের কোটের ঘসা ময়লা বোতাম।

স্নানের ঘর থেকে ছুটে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা উলঙ্গ মেয়ে, পিঠ-ভরা চুলের বোঝা, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝরনার জলে আর সেখান থেকে ছুটে যায় তার কুঁড়ে ঘরে, আবার সেখান থেকে ফের স্নানের জায়গায়। ঝরনার অপর পার থেকে তাতারের দল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পা ঝোলাতে-ঝোলাতে আসে, পাড়ার ছোঁড়ারা আর ঘেউনো কুকুরগুলি তাদের পিছু নেয়। তাতাররা আগন্তুকদের ঘিরে ধরে, হাত বাড়িয়ে হাত ঝাঁকায়।

একজন ধূর্ত হাসি হেসে চেঁচিয়ে বলে, 'আমার থেকে কেনো, আমার থেকে। একশো রুবল। খিদে পেয়েছে, খেতে চাও? আছে আমার কাছে।' ধূর্তের মতো হাসে।

'এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের রক্ষক। আর কারুর কাছে যেয়ো না।'

ছিন্ন কাপড়ে বরফ শুয়ে আছে, আর প্রান্তরের স্থান বা সীমার যেন শেষ নেই। গ্রামের কেউ জানে না যে তার পরেই, দিগন্তের অস্তিনেই এশিয়া। একটা চাষানী—যাকে সেই সৈন্য গাড়িতে উঠতে দিয়েছিলো—ভাবে আপন মনে: যদি ফ্লানেল পাবে ভাবো, সর্ষে বেচতে পারো দশ রুবলে আর যদি টাকা পাবে ভাবো, নেবে একশো রুবল, আর তোষকের খোল, ডোরা ডোরা বা ঘরকাটা রঙিন সুতোর ছিট, আর বুড়ো মেয়েদের জন্যে কালো আলপাকা…

রাস্তা ধরে দুটো লোক আসে, বগলের নিচে বোঁচকা। মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে কুয়োর পাশে। একজন চোরের মতো তার কাছে এগিয়ে চোরের মতো জিগগেস করে, 'ময়দার বদলে কিছু জিনিস নেবে?'

'কি জিনিস দেবে শুনি?'

'সুতোর জিনিস। সব রকম।'

'একটু দাঁড়াও। যে বাড়ি দেখাবো সে বাড়িতে এসো।'

মেয়েটা ইসারা করে। ঢোকে তারা সেই বাড়িতে। ঘরে ঢুকতে দরজার চৌকাঠে মাথা ঠুকে যায়। ঘরের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে স্টোভ, তার উপর বুড়ো একটা স্ত্রীলোক আর গণ্ডা দেড়েক নোংরা শিশু, এক কোণে একটা শুয়োরের ছা, আরেক কোণে ঘরের কর্তা।

পরস্পর মাথা নোয়ায়, হাত ঝাঁকায়, কর্তা থেকে ক্রমে-ক্রমে সকলেই। তারপর তারা খাবার চায়—আর লোভীর মতো খেতে সুরু করে, নেকড়ে বাঘের মতো—শুয়োরের মাংস, ভেড়ার মাংস, শুয়োরের ঝোল, ফ্যান, রুটি, আরো ঝোল, আরো মাংস। দাড়ির মধ্যে চোখ ডুবিয়ে কর্তা তাদের দেখে, দেখে তাদের খাওয়া।

'ডৌনকা !' ছেলের বৌকে কর্তা ডাকে : 'স্নানের ঘর ঠিক করো।'

তারপর যায় তারা স্নানের ঘরে, আর যখন তারা বাষ্প নেয়, তখন তাদের জন্যে ডৌনকা জল নিয়ে আসে, ভেসে তলিয়ে যাবার মতো জল।

'ডৌনকা, আগুন রাখো মালসায়।' তারপর অতিথিরা ফিরে এলে বলে কর্তা : 'দেখি কী জিনিস আছে তোমাদের সঙ্গে। দেখাও দেখি।'

বোঁচকা খুলে ফেলে লোকগুলো। ব্যবসাদারের চোখে কর্তা চুপ করে দেখে! মেয়েরা—বাড়ির আর পাশের বাড়ির, আটকে থাকে জিনিস-গুলির গায়ে, যেমন থাকে মধুর গায়ে মৌমাছি। বাড়ির কর্ত্রীর গায়ের উপর একটুকরো লাল ছিটের কাপড় ফেলে তার পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে বলে একজন রসিকতা করে : 'চেয়ে দেখ হে কর্তা। কুড়ি বছর কাঁচিয়ে গেছে—কিশোরী মেয়েটার চেয়েও ছোট দেখাচ্ছে। তুমি, মেয়ে, স্টোভের উপর গিয়ে দাঁড়াও তো, তাহলেই কর্তা চুলবুল করে উঠবে।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই।' মেয়েটা ছড়িয়ে পড়ে কড়ার উপরে চ্যাপটা পিঠের মতো।

ফিরিয়ালা তার হাঁটুর উপরে আরেকটা ছিট মেলে ধরে, পা-জামার ছিট, আর হাঁটুটা চোখা করে সবাইর দিকে এগিয়ে ধরে আর তারিফ করে তার জিনিসের। মেয়েরা দরকারি জিনিস কুড়িয়ে নেয়, অদরকারি জিনিসও। দ্বিতীয় ফিরিয়ালা ঘরের কর্তার সঙ্গে আলাপ চালায়, এ-বছরের ফসলের কথা, যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা, আর মস্কোতে যেমন এক দিকে লোকের রেশমি কাপড়, সেলাইয়ের কল আর ছাপার রঙ, তেমনি অন্য দিকে আবার না খেতে পেয়ে রাস্তার উপর পড়ে-পড়ে মরে যাচ্ছে।

চা দিয়ে যায়। ওরা সকলে পাঁচ আঙুলের উপর আলতো করে প্লেট রেখে চায়ে আস্তে-আস্তে চুমুক দেয়। ছ-ছটা বাটি সাবাড় হয়ে গেলে বাড়ির কর্তা কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে, আর জিগগেস করে, 'দাম কত শুনি ?'

মেয়েরা দরজার দিকে সরে যায়, মুখ চোখ নিস্পৃহ, প্রচ্ছন্ন ভয় বা তাতে, —বাড়ির কর্তা এবার দর করছে।

'তোমাদের যা জিনিস, তাই আমাদের টাকা।' ফিরিয়ালার মুখে তৈরি জবাব। 'আমরা ময়দা চাই।'

'তা আমরা জানি। ময়দার দাম খুব বেশি কিনা।'

আগন্তুকের মুখ বেদনায় ও ব্যর্থতায় বিকৃত হয়ে আসে, চাষার মেয়ের মতো কাতর একটা শব্দও করে ফেলে।

'ও! তোমাদের নিজেদের কাছে তোমাদের জিনিসের দাম, আমাদের জিনিসের কোনোই দাম নেই, তাই না? দাম কে বলবে? আমরা রাস্তায় পড়ে মরে থাকবো আর তোমরা আমাদের গা থেকে জ্যান্ত চামড়া তুলে নেবে, তাই না? ঠিকই তো, কে ঠিক করবে দাম? দাম ঠিক করবে কে? আমরা—আমরা না?'

আবার চায়ের প্লেট উঠে বসে আঙুলের উপর, আবার তারা চা খায়,

আর নতুন করে সুরু হয় দরাদরি। তারপর আবার চা, আবার প্লেট, আবার নতুন করে দরকষা। মেয়েরা, ভয়ে নম্র হয়ে দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। এই নিয়ে দশ বার হলো, বুড়ো গিন্নি বললে স্টোভের উপর থেকে, 'ও কারা এলো ?'

সারা গাঁ পিছু-পিছু ধাওয়া করে ছোঁড়ারা এখন ফটকের নিচে মেয়েদের নাগাল পেয়েছে। শুয়োরের ছানাটা নাকের ভিতর দিয়ে শব্দ করে। স্টোভের তলা থেকে মুরগির বাচ্চাগুলি ডেকে উঠতে চায়।

শেষকালে দুপক্ষের হাত শূন্যে উঠে মিলে যায় একে-অন্যের সঙ্গে ; ক্ষান্ত হয় দারাদরি। বাড়ির কর্তা খুব খুসি, ফিরিয়ালাদের জোচ্চুরি করে খুব ঠকিয়েছে। ফিরিয়ালারাও খুব খুসি, বাড়ির কর্তাকে ঠকিয়েছে জোচ্চুরি করে। কর্তা আবার তাদের খাওয়ায়, শুয়োরের মাংসের সঙ্গে গমের রুটি, মাখন, দুধের সর, ফ্যান আর ভেড়ার মাংসের ঝোল। তারপর তাদের নিয়ে যায় পাড়ার সরাইখানায়, চাঁদের আলোর ভডকা খাওয়াতে।

সরাইখানার দেয়ালের উপরকার লোহার ঝাপরি থেকে ছোট-ছোট খড়ের কুটো ধূসর বাতাসে উড়ে বেড়ায়। সমস্ত গ্রাম জুড়ে কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে। তাতারদের পাড়ায় কুটির থেকে কুটিরে দলে দলে লোক লুঠেলদের পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রাণহীন ফিন্‌রা দাঁড়িয়ে থাকে, কারুরই সঙ্গে কোনো ছেলেপিলে নেই, একেকটা কাঠের কুঁদোর মতো। ছোট-ছোট জানলার ফাঁক দিয়ে শেষহীন প্রান্তর দেখা যায়। প্রান্তর থেকে শীতের বাতাস বইতে থাকে, ঝরে বৃষ্টি, কাঁদে পৃথিবী। সরাই-খানায় চাষারা চাঁদের আলোর ভডকা খায়, আর আধ-মাতাল হয়ে তাতার কমিশারের কাছে যায় সর্ষের ছাড় আনবার জন্যে, যে-সর্ষে তারা বিক্রি করেছে। কাঠের গাদার নিচে লুকিয়ে রাত করে সে-সর্ষে গাড়িতে করে চালান হবে।

বহু-বহুবার কুর্ডিয়ুমের ভিতর দিয়ে লাল আর শাদা চলে গেছে, আর সমস্ত মাঠ-ঘাট চূর্ণবিচূর্ণ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কুর্ডিয়ুমের লোকেরা শস্যের তলায় প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে বলতে হয়, তাদের আছে শুয়োরের পাল, ভেড়ার পাল, শস্য খেয়ে যারা বেঁচে থাকে ; চকমকির আলোই তাদের আগুন আর সেই চকমকি তারা ঠোকে ইস্পাতে আর পাথরে, থাকে তারা অর্ধনগ্ন। প্রান্তরের উপর দিয়ে বিশাল ভয়াল তরঙ্গে লুঠেলদের দল ছুটে আসে, আর আসে প্রতিদ্রোহী! দূরস্থিত দগ্ধ বাড়ির আগুনে কালো রাত্রি করাল হয়ে ওঠে, বেজে ওঠে বিপদ-ঘণ্টার ভয়ধ্বনি। কুর্ডিয়ুমে যুবক বলতে আর কেউ নেই, কেউ গিয়েছে শাদার দলে, কেউ গিয়েছে লালের।

গোধূলি। তিরিশ বছরের সৈন্যের বৌ একটা লোককে দাঁড় করায়। যক্ষ্মার শেষ আভায় জ্বলছে সেই লোক। তাকে ইসারা করে বলে সেই বৌ, 'এসো আমার সঙ্গে। এখানে এখন কেউ নেই। আমি তোমাকে শস্য দেবো। স্নানের সব তৈরি।'

আর সেই স্নানের ঘরে, রক্তাক্ত সন্ধ্যাচ্ছটায় লোকটা দেখে মেয়েটার পেটে আর কোমরে গোলাপী রঙের সিফিলিসের গুটি।

সেই গোধূলিতে মিনার থেকে মুয়াজ্জিন দীর্ণ কণ্ঠে ডাকে সবাইকে প্রার্থনায়। তাদেরই মতো চাষা সেই মুয়াজ্জিন। সেই গোধূলিতে মাদুর বিছিয়ে তাতাররা প্রার্থনা করে, পুবের দিকে, এশিয়ার দিকে তাদের চক্ষু। কাকের শেষ দল উড়ে চলে যায়।

আর ৫৭নং মিক্স্‌ড্‌ ট্রেন মাঠের উপর দিয়ে চলে যায় টিকোতে-টিকোতে, লোকে আর খাবার জিনিসে ঠাসা।

মার-জংশন, যেখানে কোনদিন ক্রু-র বদল হয়নি, গমগম করে ওঠে,

তরুণ কেরানির স্বপ্ন বুঝি বা সফল হয়। আবকারি বাসা নিয়েছে স্টেশনে, তাই ট্রেন এখন দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে। পুকুরে বা কুয়োয় জল নেই আর এক ফোঁটা। কতটা পথ হেঁটে সবাই তাই এখন নদীতে যায়। মানুষের নোংরা না মাড়িয়ে দুপা এগোও তোমার সাধ্যি নেই। জনস্বাস্থ্যের গাড়িগুলি রুগীতে ভর্তি। আবকারি ট্রেন থাকে, যে ট্রেনের ফোকরে-ফোকরে মেশিন-গানের গম্ভীর নাক উঁচিয়ে আছে, ভেসে আসে ফূর্তির গান, ডজনখানেক হার্মোনিকার আওয়াজ—আর চার দিকে কান্না আর কাকুতি, প্রার্থনা আর অভিশাপ। আবকারির বড় কর্তার সঙ্গে কেরানির বেধে গেছে খিটিমিটি—সে জানে কাকে বলে কানে-কানে কথা বলা—ইচ্ছে করলে সে দশ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে চব্বিশ ঘণ্টারো উপর। যে-রাত্রে আলোর অভাবে আবকারির লোকেরা কাজ করে না সে রাত্রেই ইচ্ছে করলে সে স্টেশনে আনতে পারে ট্রেন, ছাড়তে পারে ট্রেন। আর তার এখন মেয়েমানুষ আছে, মদ আছে, টাকা আছে, নতুন-নতুন কাপড় আছে, সব চেয়ে সেরা তামাক আছে, চকোলেট আছে, এখন সে কথা বলে ফিল্ডমার্শালের মতো, কাটা-কাটা, প্ল্যাটফর্ম ধরে নিষ্কর্মার মতো এখন আর তার টানা-পোড়েন করবার সময় নেই।

মানুষে আর ময়দায় আর ময়লায় ঠাসা সেই ট্রেন, ৫৭ নং মিক্‌সৃড ট্রেন, হেঁটে-হেঁটে চলে যায়। মরুমাঠের উপর রাত নামে, নামে বরফের চাঙড়, বাতাস ঘুরপাক খায়, ঝরঝরাতে থাকে মালগাড়ির দল। রাত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শীত। মার-জংশনে জ্বলে লাল আলো, জ্বরের বিবর্ণ আভার মতোই ভয়ংকর। গাড়িগুলির মধ্যে লোকের উপর লোক বসে, লোকের উপর লোক দাঁড়িয়ে, কেউ ঘুমোয় না, তবু কী ভীষণ স্তব্ধতা। শূন্যগর্ভ রাত্রে ট্রেনটা ক্রমে থামে আস্তে-আস্তে, চাকাগুলো যন্ত্রণাহতের মতো কাতরায়। আগুন জ্বলে এখানে-সেখানে, আর সেই বরফে আগুনের

মাঝে লোকেরা চট বিছিয়ে বসে জড়ো হয়ে। স্টেশনের ঘরটা মড়ার মতো নিঝুম। কালো কালির রাত্রি। গার্ডরা একত্র হয়ে বসে। মিক্‌স্‌ড ট্রেন নং ৫৭, বরফ, ঝড়। দুটো মেয়ে-পুরুষ চলে যায়, ফিরে আসে। এক মুহূর্তের জন্যে কেরানি দরজার কাছে আসে, ফিল্ডমার্শালের মতো কী একটা বলে যেন কাউকে।

চুপচাপ।

ফিসফিসানি।

তারপর গার্ডরা গাড়ির মধ্যে ছুটে উঠে পড়ে।

গাড়িগুলির মধ্যে কালো কালির অন্ধকার। কে একটা গার্ড তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কেউ কথা বলে না।

তারপর···

'এ কী ?' কে জিগগেস করে।

গার্ড জোরে নিশ্বাস ফেলে ; যেন কী দেখে সে খুসি হয়ে ওঠে।

বলে সে নিচু গলায়, 'মেয়েদের আমি চাই। এই হুকুম। বিয়ে হোক বা না হোক, সব চেয়ে যারা ভালো, তাদেরকে পাঠাতে হবে লাল-ফৌজের কাছে ··· উপায় নেই ···'

কেউ কথা বলে না গাড়ির মধ্যে, গার্ডের নিশ্বাস ছাড়া শোনা যায় না আর কারু নিশ্বাস।

'কি বলো মেয়ের দল ?'

স্তব্ধতা।

'যেতেই হবে মেয়েদের। বাঁচবার ঐ একমাত্র উপায়।' কে বললে রুক্ষ গলায়, 'মনে রেখো, সঙ্গে আমাদের ময়দা আছে।'

তারপর আবার স্তব্ধতা।

'সত্যি মানিয়োস্‌, আমাদের যেতে হবে ?' বেহালার ছেঁড়া তারের মতো শোনায় সেই আওয়াজ।

আস্তে-আস্তে মেয়েরা ট্রেন থেকে নেমে আসে, এগিয়ে চলে অন্ধকারে আর বরফে, আর তাদের পিছনে দরজাগুলি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েরা কথা না বলে আঁট হয়ে দল পাকায়, প্রতীক্ষা করে। কোথাও কাছে টেলিগ্রাফের তারে শব্দ হয়। কে আসে এগিয়ে, দেখে তাদেরকে, বলে ফিসফিস করে, 'তৈরি সব? এসো আমার সঙ্গে—উপায় নেই তা ছাড়া—ময়দা বাঁচাতে হবে। আমাদের বাঁচাও তোমরা, মেয়েরা। যে সব মেয়েরা খুব ভালো, তারা নাই বা গেলে—হুঁ, বুঝলে—?'

লাল ফৌজের ট্রেনের শেষ গাড়ির কাছে মেয়েরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সৈন্যের ঘাগরা-পরা একটা যুবক নেমে আসে, বেল্ট নেই সেই ঘাগরায়। 'আ, মেয়েরা! দাঁড়িয়ে আছে বুঝি অনেকক্ষণ?···আমরা কতগুলো স্কার্ট চাই···মাইনে যদ্দিন না পাই। কিন্তু এ কি, এ এক দঙ্গল যে। কী আশ্চর্য, আমরা অতগুলি চাই না—হা ঈশ্বর। তোমরা নিজেরা তোমাদের থেকে ভালো চেহারার ক'টি বেছে দাও, আর দেখো, সুস্থ হয় যেন।'

রাত্রি। ধীরে-ধীরে বরফ পড়ছে। শব্দ উঠছে টেলিগ্রাফের তারে। চেঁচাচ্ছে বাতাস। আগুনের শিখা থেকে বেরুচ্ছে স্ফুলিঙ্গ।

স্টেশনের আফিসে কেরানিকে ছেঁকে ধরেছে গার্ডরা, মোলায়েম করে করছে অনেক খোশামোদ, কি করে তার খাতির কিনবে চলছে তারি কুৎসিত প্রতিযোগিতা। দিচ্ছে ফল, মদ আর সিগারেট, তুলো আর সিল্কের কাপড়, চা।···রাত কাটাবার জন্যে কেরানি তার ফিল্ডমার্শালী গলায় বলছে সব নোংরা গল্প আর গার্ডরা কিৎকিৎ করে হাসছে।

ভোরবেলা ৫৭নং ট্রেন বাঁশি দেয়, ঠেলা মেরে শরীরে সাড়া আনে, তার-পর মাটি পিষতে-পিষতে মার-জংশন পেরিয়ে চলে যায়।

খাদ্য, আবার খাদ্য···

বাইরে, খোলা মাঠের মধ্যে, দেখা যায় কবর, যার থেকে এই স্টেশন-জংশনের নাম। কোনো-না-কোনো দিন মার-এর কাছে কে একজন খুন হয়েছিলো, আর তার কবরের প্রস্তরখণ্ডের উপর কে এক অজানা হিজিবিজি অক্ষরে লিখে রেখেছিলো :

তোমারি মতন আমিও ছিনু ভাই,
আমি যা হয়েছি তুমিও হবে তাই।

বরফ পড়ে ঢেকেছে সেই কবর আর ঢেকেছে প্রান্তহীন প্রান্তর, শুধু পাথরের সেই লেখার কটি শব্দ শুধু এখন দেখা যাচ্ছে :

আমিও ছিনু ভাই…

ভালেন্‌টিন্ কাতায়েভ্

ছোরা

কে কী রকম লোক যদি জানতে চাও তবে চলে এসো রবিবারের বুলেভার-এ। সন্ধে ছ'টা থেকেই সে-রবিবার পাসকা ককুস্কিন স্থরু করেছিলো বেড়াতে। প্রথমেই সে এক বোতল বিয়ার খেয়ে নিলে। যাতে জীবন সম্বন্ধে অভিনিবেশ তার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, বেড়ে যায় তার আত্মবিশ্বাস।

তারপর এক বুড়ির দোকান থেকে কিনলো কতকগুলি তাজা সূর্যমুখী ফুলের বিচি আর বড়ো রাস্তা ধরে স্থরু হলো তার পায়চারি। রাস্তায় একটা বেদিনী মেয়ের সঙ্গে দেখা।

'খাসা ভদ্রলোক, তাজা ভদ্রলোক,' বললো সে গুনগুনিয়ে, 'দেখি তোমার হাত। আমি বলে দেবো কার জন্যে কাঁদছে তোমার হৃদয়, কী ভাবছো তুমি মনে-মনে। সব বলে দেবো, কিচ্ছু লুকোব না—শুধু এক পেনি দাও আমাকে বকশিস। দেখো ঠিক হবে আমার কথা, আর যদি না বলতে দাও আমাকে, তোমারই বেড়ে যাবে দুঃখ।'

পাসকা কী ভাবলো খানিক। বললো, 'দেখ, মেয়ে, হাত দেখে ভাগ্য বলাটা নিছক গাঁজাখুরি। তবে এই নাও বকশিস। যাই হোক, বলো দেখি কী আছে আমার অদৃষ্টে।'

রঙচঙে স্কার্টের পকেটে পয়সা ফেলে কালো-কালো দাঁত দেখিয়ে হাসলো সেই বেদিনী মেয়ে।

'একজনের সঙ্গে তোমার দেখা হবে আনন্দের, কিন্তু তাতে তোমার

হৃদয়ে লাগবে যন্ত্রণা, এক প্রৌঢ় দাঁড়াবে তোমার পথ আটকে, কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না। খালি ছোরা দেখে ভয় পেয়ো, কেননা এই ছোরা থেকেই আসবে তোমার দুঃখ। বন্ধুদের দেখে ভয় পেয়ো না, ভয় তোমার শত্রুদের থেকে। আর দেখছি সবুজ একটা টিয়ে-পাখি তোমার জীবনে আনবে মহোৎসব। নিজের পথ ধরে ঠিক চলে যাও, আর সুখী হও।'

খুব বিজ্ঞের মতো ভঙ্গি করে চলে গেলো সেই বেদিনী।

চোখ মটকে তাকিয়ে পাসকাও গেলো তার নিজের পথে।

রাস্তায় যত স্ফূর্তির জিনিস পাচ্ছে, সবই সে দেখছে চেখে-চেখে। প্রথমেই সে একটা ওজন নেবার যন্ত্রে উঠে দাঁড়ালো, দেখলো ওজনে সে চার পুড, পনেরো পাউণ্ড। কিছু পরে পায়ে ভর দিয়ে বসে মেপে দেখলো তার গায়ের জোর, মিটারের কম্পমান স্ঁচ ঠেকলো গিয়ে শক্তিমান সাবালক লোকের ঘরে।

তারপর আর একটু হেঁটে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট দিয়ে মেপে দেখলো তার নার্ভের শক্তি, তার মানে, মুঠো করে চেপে ধরলো সে ছোট পিতলের হাতল, আর তার মাংসের ভিতরে কুরে-কুরে গিটের মধ্য দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো পিঁপড়ের সার, শিরা-উপশিরায় যেন বইতে লাগলো সোডা-ওয়াটারের স্রোত, হাতলের সঙ্গে লেগে রইলো হাতের তালু, কিন্তু যাই হোক, প্রমাণ হলো, জোরালো তার নার্ভ।

শেষকালে গাছে-ঝোলানো একটা ছবির দিকে পিঠ করে বসলো সে চেয়ারে। ছবিটা হচ্ছে কামেন্নি ব্রিজ থেকে মস্কৌ ক্রেমলিনের দৃশ্য। বসলো সে এক পা আরেক পায়ের উপর তুলে, মুখে একটা পাশবিক ভঙ্গি নিয়ে। আর সেই অবস্থায় সে ফোটো তোলালো। তারপর মিনিট দশেক পর তারা যখন তাকে সেই নরম পাতলা একটুকরা পিজবোর্ড দিলে, তখন নিজের চেহারাটা পাসকা দেখলো অনেক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, ভয়ংকর খুশি হয়ে। সেই ডোরা-কাটা টুপি, সেই চেনা নাক,

তার পা-ঢাকা, ঘাড়-খোলা শার্ট, তার জ্যাকেট—সব একেবারে নিখুঁত—সত্যিই সে ভারি খুশি, ভাবতেই পাচ্ছে না সে এত চমৎকার দেখতে।

'না, তত খারাপ নয়।' বলে ভিজে ফটোটা একটি নলের মধ্যে পুরে হ্রদের দিকে নৌকোর মুখে চলতে লাগলো।

এখন সব সুখের চরম, দরকার কতগুলো জুৎসই মেয়ে জোগাড় করে নৌকো করে বেড়ানো। কিন্তু এমনি ঘটনার টান, নৌকো ছাড়িয়ে সে চলে এলো একটা চেনা চালাঘরের দরজায়। সামনে একটা ভিড় আর ভিতরে ঠুং-ঠাং শব্দ আর উঁচু গলার হাসি।

'ব্যাপার কী?' কনুইএর ঠেলায় সামনে এগিয়ে গিয়ে জিগগেস করলে সে এক লালফৌজের লোককে।

'চাকতি। ভারি মজার। যদি ঠিক ফেলতে পারো চাকতি, পেয়ে যাবে একটা সামোভার।'

জনতার মাথার উপর দিয়ে পাসকা তাকালো সেই চালার মধ্যে, বাতিতে ঝলমল করছে আগাগোড়া। পিছনের দেয়ালটা চট দিয়ে ঢাকা। তিন সার তাক, তাদের গায়ে-গায়ে ছোরা বেঁধা। নানা রকমের প্রাইজ রয়েছে সাজানো, ছোরাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে—নিচের তাকে মিষ্টি আর কেকের ঝুড়ি, মাঝের তাকে য়্যালার্ম-ঘড়ি, হাঁড়ি আর কড়া আর টুপি, আর বাকিটাতে আধা-অন্ধকারে প্রায় সিলিঙের সমান উঁচু বহু দামী জিনিসের স্তূপ : দুটো বালালাইকা, একটা টুলা সামোভার, ক্রোম লেদারের নি-বুট, একটা টলস্টয়ী সার্ট, একটা ইটালিয়ান হার্মোনিকা, একটা দেয়াল কোকিল-ঘড়ি আর একটা গ্রামোফোন। যে তাকের ছোরার গায়ে চাকতি ছুঁড়ে আটকে রাখতে পারবে, পাবে তুমি সেই তাকের প্রাইজ। কিন্তু ভীষণ শক্ত ছোরার গায়ে চাকতি বসানো, ছোরাগুলো স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে চাকতিগুলোকে ছুঁড়ে

ফেলে দেয় বাইরে। ভারি মজার।

কনুইএর উপর ভর করে পাসকা আরো এগিয়ে এলো। বেড়ার ধারে রূপোর চশমা-পরা বুড়ো একটা লোক বসে,চাকতির জন্যে পয়সা নিচ্ছে, চল্লিশটে এক শিলিং। লালমুখো একটা ছোঁড়া, সামনের চুলগুলি ঘামে ভিজে লেপটে গেছে কপালের উপর, আর মুখে মূর্খ একটা রাগ, তার শেষ ডজন ছুঁড়ছে। তার গায়ের কোটটা খুলে ঝুলে পড়েছে। তার মোটা-মোটা আঙুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই লোহার চাকতি, বাজছে গিয়ে ছোরার গায়ে, আর নিচে প্রতীক্ষমান বস্তার মধ্যে পড়ছে ঠিক গড়িয়ে। ছেলেটা বেগুনী হয়ে গেলো। চাকতি যেই লাগছে, অমনি ছোরা ইস্পাতের ঝংকার তুলে কাঁপছে অস্পষ্ট ভাবে, আর চাকতি থেকে অদ্ভুত ভাবে ঘাড় সরিয়ে নিচ্ছে।

'দূর ছাই ছোরা আর চাকতি।' অবশেষে ছেলেটা হাল ছেড়ে দিলো। 'দেড় রুবল আমার বেরিয়ে গেলো, অথচ এক থলে কেক পর্যন্ত পেলুম না।' লজ্জায় শীর্ণ মুখ করে বেরিয়ে গেলো সে।

'গেলো রোববার দশ রুবল খেলে একজন পেয়েছিলো একজোড়া বুট।' কে একটা ছোট ছেলে বললে ভিড়ের মধ্যে থেকে।

'আচ্ছা, আমি একবার দেখি।' গায়ের চাপ দিয়ে বেড়ার দিকে এগিয়ে এলো পাসকা। 'দেখি এবার।'

বুড়ো লোকটা এগিয়ে দিলো কয়েকটা চাকতি।

'বেশ', খুব একটা চালিয়াতের ভঙ্গিতে পাসকা বললে, 'নিচের তাকে যদি লাগাতে পারি তবেই আমার এক ঝুড়ি মিষ্টি, কেমন?'

'হ্যাঁ, তোমার।' বুড়ো বললে শান্ত স্বরে।

'আর যদি একটু উপরে লাগাতে পারি, তবে একটা য়্যালার্ম-ঘড়ি।'

বুড়ো মাথা নাড়লো।

'চমৎকার। আর যদি আমি একটা সামোভার চাই, তবে সিলিঙের

নিচে ঐ প্রথম ডাকের ছোরাতে আমাকে চাকতি বসাতে হবে। তাই না ?'

'আগে এক টুকরো কেকই পাও, পরে না হয় বকবক করো।' কে বললে ভিড়ের থেকে।

বেড়ার গায়ে ফটো রেখে পাসকা দুদিকের লোককে কনুইএর গুঁতোয় হটিয়ে দিলে। বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে তাক করছে, অমনি তার হাত কেঁপে উঠলো, আর আঙুল গলিয়ে চাকতিটা মেঝের উপর পড়ে গড়িয়ে চললো। পাসকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেলো একটা বরফের ঢেউ। ডাকের পাশে, চেয়ারের উপর, ধারালো পোশাকে সাজগোজ-করা একটি মেয়ে, কোলের উপর দুখানি হাত নিখুঁত ভাবে জোড়-করা। আর এত সুন্দর যে পাসকার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মেয়েটা চট করে উঠে কুড়িয়ে আনলো চাকতিটা, আর পাসকার মুখের দিকেও না তাকিয়ে এগিয়ে দিলো হাত বাড়িয়ে, তারপর হঠাৎ অস্ফুট রেখায় একটু হাসলো ঠোঁটের সূক্ষ্ম কিনারে, শুধু এক দিকে—আর তাতেই হলো পাসকার সর্বনাশ।

'কী হলো হে ? চলে এসো, নাও সামোভার।' চার পাশের লোক উঠলো হৈ-হৈ করে।

পাসকার সম্বিৎ ফিরে এলো আর পরের পর ছুঁড়তে লাগলো চাকতি, কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি শুধু মেয়েটার নোয়ানো চোখের পাতার দিকে আর পাতলা ঠোঁট দুটির দিকে—যেন নিখুঁত করে দুভাগ করা একটি চেরি। যখন পর-পর চল্লিশটে চাকতিই ছোঁড়া হয়ে গেলো, মেয়েটি একে-একে কুড়িয়ে নিলো সেগুলো, আর একটিও কথা না বলে ঝুলিয়ে রাখলো বেড়ার গায়ে। শুধু হাসলো না এবার। ধূসর চোখে তাকালো একবার পাসকার দিকে, আর কানের পিছনে ঠেলে দিলো একগুচ্ছ স্খলিত চুল।

আরেক বাজি। আবার পর-পর উড়লো চাকতির ঝাঁক। এলোমেলো। জনতা উঠলো বিদ্রূপ করে, পিঠের দিকে চেপে ধরলো পাসকাকে। ছোরাগুলো মাছির মতো তখনো ভোঁভোঁ করছে। আঙুল কুঁকড়ে বুড়ো নাক চুলকোচ্ছে উদাসীনের মতো।

টাটকা অতগুলো টাকা খুইয়ে পাসকা মনমরা হয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, জনপথের থেকে দূরে লেবু গাছের নিচে-নিচে গোলাপ গাছের ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটতে লাগলো। ঝাপসা কুয়াসায় আচ্ছন্ন এখন হ্রদ। তার দুহাতে সে অনুভব করছে একটা নতুন সজীবতা। আগুনের মালায় জলের উপর জ্বলছে সিনেমার প্রতিবিম্ব। ছাঁটা-চুল মেয়েরা জোড়ায়-জোড়ায় চলে যাচ্ছে তার পাশ দিয়ে, বাহুর সঙ্গে বাহু বাঁধা, চুলে নীল বা সবুজ চিরুনি গোঁজা। আর ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে, হাসছে খিলখিল করে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ার ভান করছে—সত্যি চমৎকার সে দেখতে—কিন্তু দৃকপাত না করে হেঁটে যাচ্ছে পাসকা, বুকের মধ্যে গভীর কী চিন্তা, আর মুখে গান :

'বলেছিলো বেদের মেয়ে, বলেছিলো বেদের মেয়ে,
বেদের মেয়ে বলেছিলো, যখন সে হাত দেখেছিলো।'

রাত্রে সে প্রেমে পড়লো, চূড়ান্তভাবে, অপ্রত্যাহার্যরূপে।

সেই মাস ভরে প্রত্যেক রোববারই পাসকা যায় সেই চালাঘরে, চাকতি ছুঁড়তে। তার মাইনের অর্ধেক যায় উড়ে। ছুটি নেয় না, খোয়ায় তার পালা, দেহে-মনে অসুস্থ হয়ে ওঠে। প্রতিবারই মেয়েটি চোখ নামিয়ে চাকতিগুলো এগিয়ে দেয়। এমনও হয় মাঝে-মাঝে, মেয়েটি হাসে, যেন আপন মনে হাসে। আবার এমনও হয়, যখন ভিড়ের মধ্যে পাসকার সঙ্গে হঠাৎ তার চোখোচোখি হয়, সে টকটকে লাল হয়ে ওঠে, আর এত লাল হয়ে ওঠে যে পাতলা জামার তলা থেকে তার বুক দুটিকে দেখায় ঘন কালো পিচ-ফলের মতো। কিন্তু, যতই চেষ্টা করুক পাসকা,

ফাঁকা একটিও মুহূর্তও পায়না মেয়েটির সঙ্গে কথা কয় ; কখনো আছে বা জনতার বাধা, কখনো বা চশমার তলা থেকে সেই বুড়োর সন্ধিৎসু বিরুদ্ধ দৃষ্টি, আঙুল বেঁকিয়ে নাক চুলকোয় আর যেন বলে পাসকাকে, এদিকে ঘেঁসো না, এই মেয়ে তোমার জন্য নয়।

কিন্তু একদিন, অল্প কজন লোক শুধু আছে এখানে-ওখানে ছিটিয়ে, বুড়ো গেছে কট: দুষ্টু ছোঁড়াকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে, পাসকা—জোরে ঘা খাচ্ছে তার হৃদপিণ্ড—জিগগেস করলে মেয়েটিকে, 'মাপ করো, তোমার নাম কী ?'

'লিউডমিল্লা', মেয়েটি বললে ফিসফিসিয়ে। বললে, দ্রুত একটু বা উত্তেজিত ভাবে, 'আমি চিনি তোমাকে, এক দিন বেড়ার ধারে ফেলে গিয়েছিলে তোমার ফটোগ্রাফ। আমি রেখে দিয়েছি তা তুলে, আর তার সঙ্গে আমি সত্যি প্রেমে পড়ে গিয়েছি, এত তা চমৎকার।'

বলে বুকের মধ্যে আঙুলটি ঢুকিয়ে দিলে, সেখানে একটি হারের লকেটের সঙ্গে ছোট্ট চৌকো ভাঁজ-করা একা পিজবোর্ডের টুকরো। তার চোখ কাঁপতে লাগলো, গাঢ় লাল হয়ে গেলো তার মুখ।

'আর তোমার নাম কী ?'

'পাসকা। আমার সঙ্গে যাবে তুমি কলিসিয়মে ? একটা চমৎকার ফিল্ম চলছে সেখানে—"দশলাখী মেয়ে।" পয়লা কিস্তি—'

'অসম্ভব। বাবা যেতে দেবে না।'

'পালিয়ে চলো না।'

'কী সর্বনাশ ! যদি যাই আর ফিরতে দেবে না আমাকে। মা আরো খারাপ, সুকারেভকা বাজারে তাঁর স্টল। তুমি জান না কী নির্মম কড়া আমার বাপ-মা শুনলে শিউরে উঠবে। স্ট্রেটেনকায় আমরা থাকি, রাস্তার নাম প্রসভিরনি পেরেয়ুলক, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দুনম্বর, হাতার বাঁয়ে।'

'তারপর—লিউডমিল্লা, ডার্লিং—'

'আমি কিছু জানি না। শিগগির, শিগগির তোমার চাকতি ছোঁড়, বাবা ঐ আসছে।'

ছুঁড়তে সুরু করার আগেই বুড়ো এসে পড়েছে, লাঠি হাতে, মেয়ের দিকে অত্যন্ত হিংস্রদৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে। তাই এবারো জুটলো না কিছুই পাসকার। পরের রবিবার এসে দেখলো চালাঘর বন্ধ, ঝাঁপ-ফেলা। শুধু একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'আমেরিকার চাকতির খেলা—ভাগ্য পরীক্ষা করুন।' আর এক কোণে গোলাপী লেজওয়ালা সবুজ একটা টিয়ে-পাখির ছবি, ঠোঁটে ধরে আছে একটা চাকতি। এলো-হাওয়া লেবু গাছের হলদে পাতা ঝরিয়ে এনে স্তূপীকৃত করছে চালার চারপাশে। ফুলের বিছানাগুলো দেখাচ্ছে এখন হিমপঙ্কিল, ধারে-পারে লোক নেই একজনও ঃ এখন পূর্বশীত।

তখন পাসকার মনে পড়লো সেই বেদিনীর কথা ঃ 'এক বুড়ো হবে তোমার প্রতিবন্ধক···ছোরার থেকে পাবে অনেক বৈফল্য···আর সবুজ টিয়ে আনবে তোমার সৌভাগ্য।' আর তার এত রাগ হলো সেই বেদিনীর উপর, বলবার নয়। ঘুসি বাগিয়ে ভয় দেখালো সে সেই টিয়েকে, চলে গেল যেখানে খুশি, পরিত্যাক্ত 'বুলেভার' ধরে শূন্য মনে, তার মনের ভিতরে এখন সেই শূন্য হাওয়া।

স্ট্রেটেনকায় চলে এসে পেল সে সেই প্রসভিরনি গলি। মেঘঢাকা শূন্য একটা শরতের দিন। আর সন্দেহ নেই, ধ্বসে-পড়া গির্জের উল্টো দিকে সেই ডুনম্বরের বাড়ি। হাতায় নেমে বাঁয়ে ফিরলো পাসকা, তারপর ভেবে পেলো না যায় কোনদিকে। সেই সময় বেজে উঠলো একটা সারং, আর সেই সারঙের উপর বসে আছে একটা সবুজ টিয়ে, সবুজ লেজ ঝুলিয়ে, চেরি-রঙের পাতার ভিতর থেকে স্পষ্ট গোল চোখে পাসকার দিকে তাকিয়ে।

একটু পরে তেতলার ছোট একটা জানলা গেলো খুলে, বেরুলো একখানি কচি হাত, কাগজে-মোড়া কি একটা মুদ্রা পড়লো এসে তার পায়ের কাছে। দু প্রস্ত কাচের জানলার ওপারে দেখলো সে লিউডমিল্লাকে, খুশিভরা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, সার্সির গায়ে গোলাপী গাল রয়েছে লেপটে, আঙুল দিয়ে হাত দিয়ে বাহু দিয়ে তাকে ইসারা করছে, কিন্তু কী সে ইসারার অর্থ! পাসকাও হাত তুলে ইসারা করে বলছে তাকে চলে আসতে, দুত্তোর বাপ-মা, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না আমি! কিন্তু তখুনি লিউডমিল্লার সামনে দাঁড়ালো এক মোটা গুঁফো স্ত্রীলোক, গায়ে টার্কিশ শাল, ছোট জানলাটা বন্ধ করে দিলো শব্দ করে, আর ঘুসি তুলে শাসালো পাসকাকে।

লেজ গুটিয়ে পাসকা বাড়ি ফিরলো, দিন পনোরো কাটালো দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে। রাত্রে প্রসভিরনি গলির ধারে-ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অন্ধের মতো হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগলো লোকের গায়ের উপর, মেজাজ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় সপ্তাহে, যখন রবিবার এলো ফিরে, পাসকা ভিজে চায়ের পাতায় তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করলো, বাঁধলো গোলাপী টাই, বার্নিশ করলো তার গুল্ফচ্ছদ, আর দুর্ধর্ষ ষাড়কে ধরতে গেলো তার দুই শিঙে, সোজাসুজি মেলে দিতে হাত, খুলে দিতে হৃদয়। লিউডমিল্লা আদ্ধেক দরজা খুলে তাকে দেখে হাঁ হয়ে গেলো, আঁকড়ে ধরলো হৃৎপিণ্ডের কাছটা। কিন্তু পাসকা সোজা এগোলো শোবার ঘরের দিকে, যেখানে ওর বাপ মা খেয়ে-দেয়ে উঠে চা খাচ্ছে। বললে, 'নমস্কার। মাপ করুন বাবা, মা মাপ করুন। সত্যি-সত্যি বলছি লিউডমিল্লাকে ছাড়া আমার বাঁচা অসম্ভব। যখুনি তাকে দেখেছি তখুনি আমার এ অবস্থা ঘটেছে। আপনাদের যা খুশি তা করতে পারেন, কিন্তু এই আমি, যা আমি। একজন সিক্সথ-ক্লাস ওস্তাদ কারিগর, তা ছাড়া আছে ওভারটাইম, মদ ছুঁইনা, ১২৯৩

সাল থেকে দলের একজন সভ্য, কোনো স্ত্রীর খোরপোষ দিতে হয় না, সব কিছুই সিধে, পরিচ্ছন্ন।'

অবিশ্বাস্য মুখবিকৃতি করে বুড়ো উঠলো চেঁচিয়ে, 'আমিও তোমার বাপ নই, আর আমার স্ত্রীও তোমার মা নন। ওসব ভুলে যাও।'

গম্ভীর মোটা গলায় মা বললেন, 'এ কেমন ধারা ব্যবহার, বাড়ির হাতার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, সারঙের বাজনা শোনা আর পরের বাড়িতে বলা-কওয়া নেই ঢুকে পড়া—এমন কাণ্ড বাপের জন্মেও দেখিনি। আর আমার মেয়ের জন্যে এই পাত্র! ভাবো একবার, সিক্‌স্‌থ ক্লাস কারিগর! কেন, গেল বছর মাইস্‌নিটস্কা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের ম্যানেজার এসেছিলো আমার মেয়ের জন্যে, তাকে আমি পত্রপাঠ ভাগিয়ে দিয়েছিলুম। বেরিয়ে যাও বলছি। আমরা আমাদের মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে দেবো। সে যে-কেউ নয়। আমরা এখানে কোনো কারিগর চাই না, বিশেষত পার্টি-কারিগর।'

উত্তেজিত কণ্ঠে বাপ বললে, 'শুধু চাকতির খেলায় একেক মরসুমে হাজার রুবল রোজগার করি। আর চারশ রুবল দামেরই আমার প্রাইজ আছে মজুত। লিউডমিল্লা এমন স্বামী চায় যার কিছু মূলধন আছে, যে আমার ব্যবসাটাকে একটু ফাঁপাতে পারবে। তার মানে হচ্ছে, সোজা কথা, বেরিয়ে যাও।'

'তার মানে, আমাকে বিয়ে করতে দেবেন না ওকে?' হতাশায় ডুবে গিয়ে পাসকা প্রশ্ন করলো।

'কোনোমতেই না।' বললে বুড়ো।

'বেশ, তাই।' কঠিন আতঙ্কময় কণ্ঠে বললে পাসকা, 'ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে যদি মূলধনই আপনি চান, তা হলে দেখাশোনা আমাদের এইখানেই শেষ। ব্যাপারটা আপনি মনে রাখবেন। আমি প্রমাণ করে দেখাবো আপনাকে···বিদায় লিউডমিল্লা, হেরোনা, ছেড়ে দিও না,

আমার জন্যে বসে থেকো।'

আর লিউডমিল্লা একটা সিন্দুকের উপর চুপ করে বসে রইলো, কচলাতে লাগলো হাত।

চোয়াল আঁট করে পাসকা নেমে এলো রাস্তায়, সুকারেভকা মার্কেটে গিয়ে একটা ধারালো ছোরা কিনলো। বাড়ি গেলো, দরজা বন্ধ করলো। শীত এলো, চলে গেলো। হ্রদের থেকে তাল-তাল বরফ নেমে এলো। পাসকা রোজ সময়মতো কাজে যায়, অকারণ পায়চারি করে সময় নষ্ট করে না, শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা নিজের ঘরে বন্ধ হয়ে থাকে আর তার প্রতিবেশীরা শুনতে পায় কম্পমান ধাতব শব্দ—সে কি বীণা বাজানো শিখছে? কেউ জানে না। এলো বসন্ত, এলো বরফ গলবার দিন। সূর্য গরম হয়ে উঠলো, পৃথিবী সবুজ হয়ে জন্মালো, গাছ এলো বেরিয়ে আর হ্রদে ভাসিয়ে দেওয়া হলো নৌকো। ফটোগ্রাফারের দল চাঁদিনী রাতের পর্দা খাটিয়ে লাগলো ছবি তুলতে। বুলেভারের সান্ধ্য জীবন সুরু হলো নতুন করে।

প্রতি রবিবার, সময়মতো পাসকা আসে হ্রদ ধরে, দেখতে সে চালাঘর আবার খুলেছে কিনা। না, খোলেনি। গোলাপী-লেজওয়ালা সেই সবুজ টিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চাকতি ধরে তেমনি বসে আছে সেই রোদে-চটা নীল তক্তার গায়ে, ঝরে পড়ছে তাজা লেবুর পাতা। পাসকাকে দেখাচ্ছে শীর্ণ, উদ্ধত। তারপর একদিন প্রসন্ন সকালবেলা দেখতে পেলো চালা-ঘরের দরজা খোলা। দরজার কাছে কতগুলো ভবঘুরে আছে দাঁড়িয়ে, ভেতরে জ্বলছে তেমনি বাতি। তেমনি আওয়াজ হচ্ছে চাকতির আর কলহাসির।

কাঁধের ঠেলায় ভিড় সরিয়ে পাসকা এগিয়ে গেলো কাছে, বিনয়ে নুয়ে পড়ে দাঁড়ালো বেড়ার গা ঘেঁষে। গালের হাড় দুটো কঠিন নগ্ন হয়ে উঁচিয়ে আছে, জ্বলছে দুটো লাল চোখ। লিউডমিল্লা কুড়িয়ে নিচ্ছে

চাকতিগুলো। পাসকা ঢোকামাত্রই তার গালের আভা গিয়েছে উড়ে আর সে আগাগোড়া স্বচ্ছ, লঘু হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি এসেছে ঘনিয়ে, পাতলা ঠোঁট দুটি ফুটে উঠেছে সুন্দর চেরির মতো। তার বাপ চশমা আঁট করে বসিয়ে যেন একটু পিছিয়ে গেলো বিরক্তিতে।
'মাপ করো কমরেড, আমাকে দাও।' যে ছেলেটা চাকতি ছুঁড়ছিলো তাকে একটু ঠেলে দিয়ে পাসকা বললে রূঢ়স্বরে। বুড়োর দিকে না তাকিয়েই তার মেয়েকে লক্ষ্য করে একটু মাথা ঝাঁকালো। যন্ত্রচালিতের মতো সে-মেয়ে জড়িয়ে ধরলো চাকতিগুলো। তার তুষারশীতল আঙুল গুলো ছুঁলো একটু পাসকা, বেঞ্চির উপর ছুঁড়ে ফেললো পয়সা, চাকতির দাম।
পিছন থেকে উঠল বিদ্রূপের ঢেউ। 'ঠেলাগাড়ি নিয়ে এসো, নইলো সামোভারগুলি নেবে কি করে?'
কে বললে তা লক্ষ্য করবারো চেষ্টা না করে পাসকা উদাসীনের মতো গভীর অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারলো একটা চাকতি। ছোরাগুলো একটাও নড়লো না। শুধু হলো কঠিন একটা শব্দ। ছোরা না ছুঁয়ে চাকতি ঠিক গিয়ে বসেছে। বুড়ো দ্রুত হাতে একবার তার নাকটা ঘষলো, তখন ভয় পেলো বা একটু, পাসকার দিকে এগিয়ে দিলে মিষ্টির প্যাকেটটা। পাসকা ঠেলে সরিয়ে রাখলো সেটা, পিছনে একটু হটে গিয়ে ছুঁড়ে মারলো দ্বিতীয় চাকতি, এমন ভাব যেন দেখেও দেখছে না চাকতি কোথায় গিয়ে পড়ছে। তেমনি নিখুঁত পরিচ্ছন্নভাবে চাকতি গিয়ে বসেছে ঠিক ছোরার গায়ে। আর বুড়োর দ্বিতীয় প্যাকেটটা এগিয়ে দেবার আগেই আরও তিন-তিনটা চাকতি পাসকা আরও তিন-তিনটা ছোরার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তেমনি নিঃশব্দে, নিটুট ভাবে। খেলার ঘরে নেমে এসেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।
বুড়ো ছোট-ছোট চোখে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছে পাসকার দিকে। গুবরে

পোকার মতো একবিন্দু কালো ঘাম গোল হয়ে জমে উঠেছে তার কপালে। প্যাণ্টটা যেন হঠাৎ ঢিলে, ঢাউস হয়ে গেছে। এড়ো পায়ে দাঁড়িয়ে বেঞ্চির উপর ঝুঁকে পড়ে বাজিয়ে চলেছে চাকতি, একটার পর একটা।

যেন সমস্ত পৃথিবী তার, এমনি ভাবে তাকিয়ে বললে, 'কি, লিউডমিল্লা এখন কার ?'

'তোমার জন্যে কক্‌খনো নয়।' বললে বুড়ো।

'নয় ? বেশ', ঘুমো চোখে পাসকা বললে, 'এই ছোঁড়া, পক্রভস্কার মোড় থেকে একটা কুলি আর ঠেলাগাড়ি নিয়ে আয় তো—সামোভারটা তুলে নিয়ে যাবে। একটু সরে দাঁড়াও দেখি হে—'

নিরেট ধাতুর মতো আঁট দেখালো পাসকার মুখ। কপালের উপর একটা শিরা ফুলে উঠলো। বাহুটা একটু তেরছা করে রাখলো। আঙুলের ডগা থেকে বিদ্যুৎ লাগলো ঝলসাতে। ছোরাগুলো ভনভন করে উঠছে যেমনি চাকতি লাগছে এসে তাদের গায়ে, গোল হয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। চেঁচিয়ে উঠছে জনতা, ফুলে ফেঁপে উঠছে। চার দিক থেকে ছেঁকে ধরছে এসে লোকের পর পর লোক। পাসকা তাকিয়েও দেখছে না কী তার লক্ষ্য যেন তার তাক করবারো দরকার নেই। চার দিকে অসংলগ্নভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। যেন ভয় লাগছে পাসকার দিকে তাকাতে। একটা চাকতিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না। পাঁচ মিনিটেই সব সাবাড় হয়ে গেলো। জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছলো পাসকা। জনতা সরে দাঁড়ালো তার পথ করে দেবার জন্যে—এসে পড়েছে ঠেলাগাড়ি।

'বোঝাই করো।' হুকুম করলে পাসকা।

'বা, কী হচ্ছে এ সব ?' তাকের দিকটায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো বললে প্রায় অসহায়ের মতো।

'কিছুই হচ্ছে না। ও সমস্ত মাল সোজা লেকের মধ্যে যাচ্ছে। আর, এই

হচ্ছে এত সবের শেষ।'

'কী মতলব তোমার ?' মেয়েছেলের মতো প্রায় কেঁদে উঠলো বুড়ো : 'আমার চার শো রুবলের মাল, তা ছাড়া, আমার জীবনের ব্যবসা।'

'তাতে আমার কী ? হাজার রুবলের মাল হোক না। ও সমস্ত মাল আমার। আমি এ চুরি করিনি। খেলে পেয়েছি, পরিষ্কার খেলে। আমার সাক্ষী আছে। সমস্ত শীত আমি মহলা দিয়েছি, অভ্যেস করেছি, এক ফোঁটা ঘুমুতে দিইনি নিজেকে। এখন জেতবার পর জিনিস নিয়ে যা খুশি আমি করবো। যদি ইচ্ছে হয়, রেখে দেবো ; যদি ইচ্ছে হয় ফেলে দেবো জলের মধ্যে।'

'নিশ্চয়। একশো বার।' উল্লসিত জনতার থেকে কে বললে, 'সব আমরা সাক্ষী। শুধু ভাই গ্রামোফোনটা ফেলে দিও না।'

ভিড়ের থেকে কেউ-কেউ এসে না বলতেই মাল চাপাতে লাগলো ঠেলা-গাড়িতে।

'চলো এবার।' বললে পাসকা।

'দাঁড়াও, কোথায় যাবে ?' চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ো : 'আমিই বা কি করে বাড়ি যাবো তবে ?···সত্যি এগুলো ফেলে দিও না জলের মধ্যে।'

'কেন দেবো না ? নিশ্চয়ই দেবো। চলে এসো ঘাটে।'

'নিয়তির প্রতি এতটুকু তোমার সম্মান থাকা উচিত।'

'নিয়তি হচ্ছে বিস্মৃত অতীতের ভস্মাবশেষ। ঠিক তোমার ঐ সবুজ টিয়ের মতো। আর, একটি কথা বলেছ কি, অমনি···' পাসকা তার প্রকাণ্ড ঘুসি উঁচোলো।

পিছনে আনন্দ-উদ্বেল জনতা, ঠেলাগাড়ি থামলো এসে হ্রদের ঘাটে। ক্রোম-লেদারের এক জোড়া বুট তুলে নিয়ে পাসকা ছুঁড়ে মারলো জলের মধ্যে।

জনতা হাঁ-হাঁ করে উঠলো।

'দাঁড়াও।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে বুড়ো, প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো। 'থামো।'

জিনিসের স্তূপের উপর দুই শক্ত হাত চেপে ধরে পাসকা বললে চোখ নামিয়ে, 'শেষ বার বলছি, শেষ বার। এ সব লোক আমার সাক্ষী। শেষ বার। আমাকে বিয়ে করতে দাও তোমার মেয়েকে, আর ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার জিনিস। তোমার দোকানের ছায়াও আর মাড়াবো না আমি। দেখ, আর যদি রাজি না হও, তোমার আমি সর্বনাশ করবো। লিউডমিল্লাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না কিছুতেই। কিছুতেই না।'

'তা হলে নাও তাকে।' বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো, রাগে থুতু ছিটোলো মাটির উপর। 'নাও, এক্ষুনি নাও।'

'লিউডমিল্লা, ডার্লিং।' পাসকা চেঁচিয়ে উঠলো, ফিরে দাঁড়ালো গাড়ি ফেলে।

কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লিউডমিল্লা, জনতার থেকে মুখ লুকিয়ে বাহুতে। তার কৃশ দুটি বাহু পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়।

'খেলা সাঙ্গ হলো এতক্ষণে। চলো এবার।' পাসকা লিউডমিল্লার কনুই স্পর্শ করলো সন্তর্পণে, যেন সে ঠুনকো পোর্সিলেনের তৈরি।

সেই সময় সমস্ত বুলেভার যূথীর গন্ধে গদ্গদ হয়ে আছে। সবখানেই জুঁই, চুলে আর জলে। লেবু গাছের ফাঁকে, ঘন মখমলের আকাশে বাঁকানো ছোরার মতো চাঁদ উঠেছে। আর তার টাটকা আলো হ্রদের জলে পড়ে জীবন্ত সোনার আঙটির মতো—বিয়ের আঙটির মতো—অসংখ্য, অগুনতি আবর্ত সৃষ্টি করছে।

তবু তোমরা বলো হৃদয়ের মহৎ প্রবৃত্তিগুলো সব পুরোনো, সেকেলে হয়ে গেছে। একেবারেই নয়, আমি তোমাদের বলছি হলফ করে।

ভেসেভলড ইভানফ

১

শিশু

মঙ্গোলিয়া হচ্ছে একটা বন্য পশু, তিমিরাবরণ। ওর পাথর বন্য পশু, ওর জল, এমন কি ওর যে গুবরে পোকা তা পর্যন্ত কামড়াবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।

মাঙ্গোলীয়র হৃদয় কেউ জানে না—সে ভেড়ার চামড়া পরে, তাকে দেখায় চীনার মতো, রাশিয়ান থেকে অনেক ফারাক, আর নর্কই-র মরুভূ ছাড়িয়ে তার বাসা। আর, এ সবাই বলে যে সে চীন পেরিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে ঢুকবে, সাত সমুদ্রের পারে অজানা কোনো নীল দেশে...

রাশিয়ার যুদ্ধে ইর্‌তিশ্‌ ছেড়ে যে সব কির্‌ঘিস্‌ মঙ্গোলিয়ায় চলে গিয়েছিলো তারা তাঁবু ফেলেছে এসে রাশিয়ানদেরই কাছাকাছি। তাদের মন জানে সবাই, হদিস পাওয়া যায় ঠিকঠাক। তারা হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে তাদের পশু, তাদের ছেলেপিলে, এমন কি তাদের রুগ্ন পরিজন।

নির্দয়ের মতো রাশিয়ানদের তাড়িয়ে আনা হয়েছে—তবু যা হোক তারা চাষা, মজবুত তাদের স্বাস্থ্য। তাদের বাড়তি দুর্বলতা ফেলে এসেছে তারা পাহাড়ের পাথরে—মরছে একটা এখানে, আরেকটাকে এখানে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাদের পরিবার, যন্ত্রপাতি, ঘরোয়া পশু—সব তারা দিয়ে এসেছে হোয়াইটদের। বসন্তের নেকড়ের মতোই তারা দুর্দান্ত। তাঁবুতে শুয়ে ভাবছে এখন তারা প্রান্তরের কথা, ইর্‌তিশের কথা...

তারা প্রায় পঞ্চাশ জন এখানে। সের্গেয়ি সেলিভানফ তাদের প্রধান, আর তাদের দলের নাম : 'কমরেড সেলিভানফের লাল ফৌজের দল।'
তারা শ্রান্ত, শ্রান্ত।
যখন তাদেরকে পাহাড়ের উপর দিয়ে তাড়িয়ে আনা হয়েছিলো, প্রাণহীন পাথুরে কালিমা দেখে তাদের ভারি ভয় হতো। এলো তারা সেই প্রান্তহীন প্রান্তরে—মনে হলো সে একটা নির্বিচ্ছেদ বিরক্তি : সেই ইর্‌তিশের মাঠ, বালি, খসখসে ঘাস আর কঠিন পাথুরে আকাশ। সব কিছু বিদেশী, কোনো কিছুই আপনার নয়। আর মাটি আচমা, বুনো।
আর কঠিন এই নারীহীন জীবন।
রাত্রিবেলা তারা গোল হয়ে বসে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে সৈন্যদের গল্প বলতো, আর যখন অসহ্য হয়ে উঠতো ঘোড়ায় জিন পরিয়ে ছুটতো তারা প্রান্তরে আর ধরে নিয়ে আসতো কির্‌ঘিস্ স্ত্রীলোক।
আর কির্‌ঘিস্ স্ত্রীলোকেরা তাদের রাশিয়ান অপহারকদের কাছে ছেড়ে দিতো নিজেদের।
ঘৃণ্য লাগে ওগুলোকে, কেননা ওগুলো নিঃসাড় আর চোখ খুলবেনা কখনই, যেন আঠা দিয়ে কে এঁটে রেখেছে ওদের চোখের পাতা। যেন গৃহপালিত পশুর সঙ্গে বাস করছে।
কির্‌ঘিস্‌রা এই ম্যুজিকদের ভয় করে, ঢুকে যায় মাঠের অভ্যন্তরে। রাশিয়ানদের দেখে তারা বন্দুক বা গুলতি উঁচিয়ে ভয় দেখায়, যুদ্ধের ডাক ছাড়ে কিন্তু গুলি ছোঁড়ে না। সাহস পায় না বোধহয়।

১

দলের ক্যাশিয়ার আফানাসি পেট্রভিচ শিশুর মতো কাঁদুনে। মুখ-খানাও শিশুর মতো, ছোট, গোলাপী, মাথায় চুল নেই একগাছা। কিন্তু পা দুটো লম্বা আর জোরালো, উটের মতো।

যখন সে ঘোড়ায় চেপে বসে তখন তাকে অদ্ভুত বিশ্রী দেখায়। মুখ তো দেখাই যায় না, আর চাউনিটা মনে হয় ক্রুদ্ধ, নির্দয়।

ভালো ঘেসো মাঠ খুঁজে বের করার জন্যে তিন জনকে পাঠানো হলো মরুপ্রান্তরে, সেলিভানফ নিজে, ক্যাশিয়ার আফানাসি পেট্রভিচ আর সেক্রেটারি ড্রেভেসেনিন।

ধোঁয়ার মেঝের মতো বালির পুঞ্জ উঠলো শূন্যে।

বইলো ঝাপটা-মারা ঝড়। পৃথিবীর উত্তাপ উঠলো কম্পমান আকাশের দিকে। মানুষের আর পশুর শরীর দুইই শক্ত আর ভারি, পাথরের মতো। শ্রান্তিকর।

কর্কশকণ্ঠে বললে সেলিভানফ, 'কোথায়, কতদূরে, কী রকম ময়দান ?'

জানতো আর-আররা, কিন্তু শ্মশ্রুহীন মুখগুলি স্তব্ধ হয়ে রইলো। যেমন প্রান্তরের ঘাস পুড়িয়েছে সূর্য, তেমনি যেন এদের চুল পুড়িয়ে দিয়েছে। বড়শি-বেঁধা ছোট-ছোট চোখগুলি তাদের প্রতপ্ত লাল।

শোকাকুল কণ্ঠে বললে পেট্রভিচ, 'নিশ্চয়ই ওখানে সব শুকিয়ে গিয়েছে।'

কান্নাগলা তার স্বর কিন্তু মুখে কান্নার আভাস নেই। শুধু তার বাহন যে ঘোড়া, ক্লান্ত আর স্ফীতশ্বাস, তারই চোখ দিয়ে দীর্ঘ একটি জলের ধারা নেমে এসেছে।

একের পর এক, বন্য ছাগলের পায়ের খুরে আঁকা পথ ধরে দলের লোকেরা চললো সে প্রান্তরের গহনে···

জ্বলছে বালি, বালির পর বালি। বইছে দম-বন্ধ-করা বাতাস। ঘাম যেন,

শরীরের ভিতরে থেকেই শুকিয়ে যাচ্ছে, চামড়া ফুঁড়ে বেরুতে পারছে না।

সন্ধের দিকে পশ্চিমের দিকে আঙুল দেখিয়ে সেলিভানফ বললে, 'এখেনে এসেছে আর কেউ ঘোড়সওয়ার।'

সুদূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে রাঙা বালির মেঘ।

'নিশ্চয়ই ওরা কির্‌ঘিস্‌।'

লাগলো তর্ক। ড্রেভেসেনিন বলছে, কির্‌ঘিস্‌রা পালিয়ে বেড়াবে, তাদের সাহসই হবেনা সেলিভানফের তাঁবুর দিকে পা বাড়ায়। আফানাসি পেট্রভিচ বলছে, এ কির্‌ঘিসই। এই ঘন ধুলোর ঝড় কির্‌ঘিস্‌দেরই ঘোড়ার খুরের কাজ।

কিন্তু যখন ওরা চলে এলো ধুলোর কাছে, তার সন্দেহ রইলো না, 'অচেনা লোক, বিদেশী।'

ঘোড়াগুলো যেন বুঝতে পারছে বাতাসে কী অজানা আশঙ্কা। হুকুম হবার আগেই তারা কান খাড়া করে গড়িয়ে পড়লো মাটির উপর, শুয়ে রইলো মড়ার মতো। অদ্ভুত, অসহায়; পা-গুলো বাঁশের খুঁটির মতো লম্বা। ওরা কি তবে লজ্জায় চোখ বুজে আছে?

সেলিভানফ আর পেট্রভিচ শুলো তাদের ঘোড়ার পাশে। পেট্রভিচ কাঁদছে, নাকের মধ্যে থেকে কাঁদছে। ওর কাঁদুনে স্বভাবের জন্য সেলিভানফ ওকে আশে-পাশে রাখে, আর ওর ছেলেমানসি কান্নার থেকেই সে আনন্দ পায়, পায় অন্যায় করবার প্রেরণা।

ধুলোয় রাস্তা গিয়েছে মুছে। শোনা যাচ্ছে চাকার শব্দ। দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার ধাবমান কালো কেশর।

'রাশিয়ান···অফিসার!' নিঃসংশয়ের মতো বললে সেলিভানফ।

লাল ফিতেওলা টুপি-মাথায় দুজন লোক বসে আছে গাড়িতে। ধুলোয় মুখ দেখা যাচ্ছে না। হলদে মেঘে যেন লাল নিশান উড়ছে। যতবারই

চাবুক উঠছে শূন্যে তত বারই দেখা যাচ্ছে ঊর্ধ্ব-উৎক্ষিপ্ত বন্দুকের মুখ। 'অফিসার···কোনো কাজে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই কানো অভিযানে···' বললে ড্রেভেসেনিন।

আরোহীসহ গাড়ি চলে যায় এগিয়ে। তেজী, উড়ন্ত ঘোড়া। চলে যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে, পুঞ্জিত ধুলোয় চাকার চিহ্ন ঢেকে রেখে।

পেট্রভিচ বললে তার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, 'ওদেরকে ধরে কয়েদ করে রাখো। কিংবা মারো ওদের।'

'শেষ কালে কি মার খাবে তুমি ?'

সব চেয়ে রাগ হচ্ছে ওদের এই কথা ভেবে যে অফিসাররা প্রায় একা বেরিয়েছে, রক্ষিসৈন্য ছাড়া। যেন ওদের কোনোই শক্তি নেই, যেন ইচ্ছে করলেই ওদেরকে, ম্যুজিকদেরকে, মেরে ফেলা যায়। একজন অফিসার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে প্রান্তরের চার ধার, কিন্তু কিছুই নজরে আসছে না, ধুলো, বাতাস, লাল পোড়া ঘাস, আর দুটো গুহার মুখে দুটো বড়ো পাথর, যেন ঘোড়ার মৃতদেহ।···কী রকম পাথর ওরা ?··· মৃতদেহ কি সত্য ?

গাড়ি, চাকা, আরোহী···চলে গেলো তারা লাল ধুলোর পথে।

লুকোনো লোক গুলি ছুঁড়লো অকস্মাৎ।···চেঁচিয়ে উঠলো। আবার গুলি ছুঁড়লো।

টুপি দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে গাড়ির মধ্যে গেলো পড়ে। খসে পড়লো লাগাম।

ঘোড়া দুটো ছিটকে লুটিয়ে পড়লো। কেশরে সাদা ফেনা লেগেছে। কাঁপছে তাদের পেশীগুলো—

'ওরা নিশ্চয়ই মরে গেছে।' বললে পেট্রভিচ।

এগিয়ে গেল ম্যুজিকরা, দেখলো নজর করে।

টুপিতে লাল ফিতেবাঁধা আরোহীরা দুজনেই মরে গেছে। কাঁধের সঙ্গে

কাঁধ ঠেকিয়ে তারা বসে আছে, মাথা দুটো পেছনে হেলা। একজন নারী। তার চুল পড়েছে ছড়িয়ে, তার সৈনিকের জামায় রেখায়িত হয়ে আছে তার স্তনের উচ্চতা।

'আশ্চর্য।' বললে ড্রেভেসেনিন। 'এ ওর নিজের দোষ। অমন টুপি পরবার ওর কোনো অধিকার ছিলো না। কে মারতে চায় মেয়েছেলেকে? সমাজের পক্ষে কতো দরকার তাদের।'

পেট্রভিচ থুতু ছিটোলো। 'তুমি একটি দৈত্য, তুমি একটি বুর্জোয়া।··· মাথায় তোমার কিছু নেই—শুধু গোবরে ঠাসা।'

'যাক, ঝগড়া নয়।' সেলিভানফ বাধা দিয়ে বললে, 'আমরা ডাকাত নই। আমরা সব লিখে নেব লিষ্টি করে, দাও এক টুকরো কাগজ আমাকে। এসব এখন জাতীয় সম্পত্তি।'

জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে সব চেয়ে আগে তারা দেখলো চীনে ঝুড়িতে একটি শিশু, থোকাথোকা চুল আর ফুরফুরে দুটি চোখ। বাদামী কম্বলের একটা ধার শক্ত করে মুঠিতে ধরা। বুকের দুধ খায় এমনি কোলের শিশু, কাঁদছে করুণ মিহি গলায়।

'এই যে, অনেক কথা আছে এর বলবার···'গদ্‌গদ গলায় বললে পেট্রভিচ।

স্ত্রীলোকটির প্রতি ওদের করুণা হলো, তাকে আবরণচ্যুত করলে না, কিন্তু পুরুষটাকে ওরা বালির মধ্যে গোর দিলো, নগ্ন করে।

৩

লুট-করা গাড়িতে চললো পেট্রভিচ শিশুটাকে কোলে নিয়ে, দোলাতে-দোলাতে, গান করতে-করতে।

তার মনে পড়লো তার সেই ছোট্ট গ্রাম লেবিয়াজির কথা, তার গরু-ভেড়ার পাল, তার পরিবার, তার ছোটছোট ছেলেপিলে, আর সে কাঁদলো চাপা গলায়।

শিশুটাও কাঁদলো।

চাকার তলায় তপ্ত শুকনো বালিও যেন কাঁদছে। দলের আর-আররা তাদের দৃঢ়পেশী মঙ্গোলীয় ঘোড়ায় চড়ে আসছে। জ্বলছে তাদের মুখ, জ্বলছে তাদের আত্মা।

রাস্তার ধারে-ধারে নাকদানা ফুটে আছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না বালির মতো। তিক্ত, বিষাক্ত বালি।

হে পথ, হে ছাগখুরচিহ্নিত পথ। হে বালু, তিক্ত বালু। মঙ্গোলিয়া বন্য পশু, তিমিরাবৃত।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো তারা সেই অফিসারের সম্পত্তি। কতকগুলি বই, তামাক-ভরতি একটা বাক্স, কতকগুলি ইস্পাতের ঝকঝকে যন্ত্রপাতি। একটা চারকোণা পিতলের বাক্স, তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ানো, বাক্সটায় অনেকগুলি ঘর।

হাত দিয়ে তারা অনুভব করে, ওজন নেয়—

ভেড়ার চর্বির গন্ধ পেলো তারা, খেয়ে নিলো অনেকটা, লেগে গেলো কাপড়ে। উঁচু গালের হাড়, পাতলা ঠোঁট, এসেছে তারা ডন-এর পারে কোনো কশাকদের গাঁ থেকে, লম্বা কালো চুল আর কড়া মুখ, দেখেছে তারা চুনের খনি। বাঁকা পা আর খনখনে গলা।

সেই তেপায়া যন্ত্রটা তুলে ধরে পেট্রভিচ বললে, 'এ হচ্ছে টেলিস্কোপ, দুরবীন, নিশ্চয়ই দাম পড়েছে দশ লাখেরো বেশি। ওরা চাঁদ দেখেছে এর মধ্য দিয়ে, দেখেছে সেখানে সোনার বালি। ধোবার দরকার করে না সে-বালি, ময়দার মতো ঝরে পড়ে, খাঁটি নিখুঁত সোনা। আর তোমার কাজ হচ্ছে বস্তার মধ্যে সে সোনা বোঝাই করা—'

আরেকজন, ও সহরে ছিলো কোনো সময়, জোরে হেসে উঠলো। 'বাজে কথা—'

'বাজে কথা?' পেট্রভিচ রেগে টং হয়ে উঠলো। 'শালা, মড়াখেকো—দাঁড়া।'

'কিসের জন্যে দাঁড়াবো?'

পেট্রভিচ রিভলভার তুলে ধরেছে।

'শ্‌শ্‌—' সেলিভানফ মাঝে পড়ে নিরস্ত করলো ওদের।

তামাক তারা সবাই ভাগ করে নিলো, যন্ত্রপাতিগুলো দিলো পেট্রভিচের জিম্মায়। কেননা সে যখন ক্যাশিয়ার তখন সে ওগুলো বদলে কিরঘিস্‌দের কাছ থেকে কিছু দরকারী জিনিস সংগ্রহ করবে।

ছোট-ছোট যন্ত্রপাতিগুলি সেই শিশুর চারধারে ছড়িয়ে দিয়ে পেট্রভিচ বলে, 'খেল এবার।'

শিশু সেদিকে ফিরেও তাকালে না। কেবল কাঁদছে। এটা দেয়, ওটা রাখে, এখানে শোয়ায়, ওখানে শোয়ায়, পেট্রভিচের ঘাম বেরিয়ে গেলো, তবু সেই ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত শিশুর কান্নার বিরাম নেই।

রাঁধুনে যারা, খাবার নিয়ে এলো। মাখনের আঠালো গন্ধ, ফ্যানের, কপির ঝোলের। বেরুলো সব জাঁদরেল কাঠের চামচ। পায়ের চাপে-চাপে বসে গেছে ঘাসের ডাঁট। হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠলো প্রহরী: 'শিগগির করো।...খেতে হবে আমাকে...আর কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।'

খাওয়ার শেষে মনে হলো, শিশুকেই কিছু খাওয়ানো হয়নি। কান্না থামেনি তার এখনো।

একমুখ রুটি চিবিয়ে নিলো আফানাসি। ভেজা, দলা রুটির থেকে একটি কণা তুলে সেই মুক্ত ছোট্ট মুখে সে পুরে দিলো। বললে, 'প্সিপি···খেয়ে ফেলো, গিলে ফেলো—ভারি মিষ্টি খেতে—'

কিন্তু বাচ্চা ফিরিয়ে নিলো তার মাথা, বুজে রইলো তার মুখ—কিছুতেই সে খাবে না। কর্কশ গলায় নাকের মধ্য দিয়ে সে কাঁদছে একটানা।

এসে পড়লো ম্যুজিকরা, তাকে ঘিরে ধরলো। মাথার উপরে মাথা, সবাই দেখতে লাগলো সে শিশুকে, সবাই চুপ।

গরম। যে ভেড়ার মাংস তারা খেয়েছে তারই চর্বিতে ঠোঁট আর গাল তাদের তেলতেলে দেখাচ্ছে। শার্টগুলো খোলা। খালি পা—মঙ্গোলিয়ার মাটির মতো হলদে।

'খাইয়ে দাও কিছু কপির ঝোল।' বললে একজন ম্যুজিক।

ঠাণ্ডা করলো কপির ঝোল। আফানাসি পেট্রভিচ তাতে আর একটা আঙুল ডুবিয়ে সে আঙুল শিশুর মুখে পুরে দিলো। চর্বি-মাখা সেই কপির ঝোল তার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়লো তার গোলাপী জামায়, তার পশমী কম্বলে।

সে খাবে না, সে কাঁদবে।

'একটা কুকুরের ছানা এর চেয়ে বেশি চালাক, সে তোমার আঙুল কামড়ে খাবে।'

'হবে না কেন ? একটা হচ্ছে কুকুর, আরেকটা হচ্ছে মানুষ—'

'এখন শুধু চিন্তা করলে চলবে না···'

তাঁবুতে গরুর দুধ নেই। ভাবলো ঘোড়ার দুধ খাওয়ালে কেমন হয়। অসম্ভব। মরে যাবে ছেলেটা।

ম্যুজিকরা তাদের গাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে

লাগলো তারা। আফানাসি পেট্রভিচ ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাঁধের উপরেও তারও ছেঁড়া জামা, তার ছোট-ছোট চোখও তেমনি অপরিচ্ছন্ন। শিশুর মতো দুর্বল ঘ্যানঘেনে তার গলা, যেন ঐ শিশুটাই কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাড়িগুলির চার পাশে।

'কী হবে এবার ?···কী উপায় আছে এর ? উপায় নেই ? কুত্তার বাচ্চারা, ভেবে একটা কিছু বের করতে পারিস নে উপায় ?'

তারা সব উঠে দাঁড়ালো, প্রশস্তস্কন্ধ বলবান বিশাল সব দস্যু, দেখালো নিঃস্ব অসহায়ের মতো।

'এ হচ্ছে স্ত্রীলোকের কাজ···'

'যা বলেছ···'

'একটা স্ত্রীলোকের হাত পেলে ও গোটা একটা ভেড়া সাবাড় করতো।'

'এ আর বলতে !'

সেলিভানফ জড়ো করলো এক দল আর বললে, 'অসম্ভব, ক্রিশ্চিয়ান শিশুকে পশুর মতো মরতে দেয়া হবে না। হ্যাঁ, জানি, বাপ ওর বুর্জোয়া, কিন্তু, শিশু, শিশুর কী দোষ ?'

ম্যুজিকরা সায় দিলো।

'না, শিশুর কোনো দোষ নেই। সে নিষ্পাপ।'

ড্রেভেসেনিন ফেটে পড়লো হাসিতে : 'ও বড়ো হোক, বড়ো হোক আমাদের সঙ্গে। উড়ে যাবে ও চাঁদের দেশে। সোনা কুড়িয়ে আনবে খুঁটে-খুঁটে—'

ম্যুজিকরা হাসলো না। আফানাসি পেট্রভিচ ঘুসি বাগিয়ে বললে, 'তুই একটা বোকা কুত্তা। আমাদের দলের একমাত্র ভাঁড়।' পা ঠুকে, হাত নেড়ে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো : 'গরু—ওর জন্যে গরু চাই একটা।'

সবাই বলে উঠলো সমস্বরে : 'গরু ছাড়া বাঁচতেই পারে না ও।'

'হ্যাঁ, গরু চাই।'

'গরু নেই মানে হচ্ছে ও নেই।'

'আমি নিজে যাচ্ছি গরুর জন্যে।' বললে আফানাসি।

'তার মানে, ইর্‌তিশে ফিরে যাচ্ছো, তোমার নিজের গ্রামে, লেবিয়াজিতে?' বললে ড্রেভেসেনিন।

'ইর্‌তিশে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। আমি যাচ্ছি কির্‌ঘিস্‌দের কাছে।'

'টেলিস্কোপ বদ্‌লে গরু আনবার জন্যে?'

'কি, আমার ঘুসি খাবে বুঝি একটা?'

প্রায় আবার একটা ঝগড়ার সূচনা।

'ঢের হয়েছে!' থামিয়ে দিলো সেলিভানফ।

ভোট নেয়া হলো। ঠিক হলো ড্রেভেসেনিন, আফানাসি পেট্রভিচ আর আরো তিনজন যাবে ঘোড়ায় চড়ে, কির্‌ঘিস্‌দের গ্রামে, একটা গরু ধরে নিয়ে আসবে। বরাত ভালো হলে, দুটো পাঁচটাও নিয়ে আসতে পারে, এদিকে মাংসের জোগানও শেষ হয়ে এসেছে।

জিনের সঙ্গে আটকে নিলো বন্দুক, মাথায় পরলো শেয়ালের লোমের টুপি, যাতে দূর থেকে তাদেরও মনে হয় কির্‌ঘিস্‌ বলে।

কম্বল জড়িয়ে শিশুটাকে রাখা হলো গাড়ির নিচেকার ছায়ায়। একজন যুবক ম্যাজিক বসলো তার পাহারায়, আর ছেলেটাকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও ব্যস্ত রাখবার জন্যে নাকদানের ঝোপে ছুঁড়তে লাগলো গুলি।

৪

বালি, নিরানন্দ, মঙ্গোলীয়। পাথর—নীল, নিরুত্তর। মাটি দিয়ে দুহাত বন্ধ করা।

বালির উপর দিয়ে ঘোড়া ছোটায় রাশিয়ানরা। রাত্রি।

বালিতে তাপের গন্ধ, বিষাক্ত সব্‌জির।

কির্‌ঘিস্‌দের গাঁয়ে কুকুর ডাকে নেকড়ের উদ্দেশে, অন্ধকারের উদ্দেশে।

নেকড়ে ডাকে অন্ধকারে, ক্ষুধা ও মৃত্যুর নির্দয়তায়।

কির্‌ঘিস্‌রা পালায় মৃত্যুভয়ে। কিন্তু পালাবে কি ওদের গরুর পালও ?

পচা টকো দুধের গন্ধ। শীর্ণ, ক্ষুধার্ত শিশুগুলি খোলা আগুনের কুণ্ডের কাছে বসে আছে। আশে-পাশে পাঁজর-বেরুনো চোখা-নাক কুকুর। খড়ের গাদার মতো দেখায় কির্‌ঘিস্‌দের তাঁবুগুলো। তাঁবুর দূরে একটা হ্রদ, পাতিঘাস। সেই সব ঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ ছুটে এলো বন্দুকের গুলি, অগ্নিকুণ্ড লক্ষ্য করে। উঠলো চীৎকার, ভয় ও বিস্ময়ের আলোড়ন···

জমাট পশমের কুঁড়েঘর ছেড়ে কির্‌ঘিস্‌রা বেরিয়ে এলো দলে-দলে, তুললো ভয়ের আর্তনাদ। রাত-দিন লাগাম-লাগানো ঘোড়া, চাপলো সে-সব ঘোড়ার উপর। মাড়িয়ে চললো তাঁবু। মাড়িয়ে চললো মাঠ। দিগ্বিদিকে। সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার ঃ 'আ-আই! লাল—শাদা—এসেছে রাশিয়ানদের দল। আ-আই!'

একটা শাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো পড়ে গেলো ঘোড়ার থেকে, ফুটন্ত কড়ার মধ্যে পড়লো তার মাথাটা, উলটে গেলো কড়া। দগ্ধ গায়ে মোটা গলায় কেঁদে উঠলো সে। দুপায়ের মধ্যে লেজ গুটোনো, একটা কোঁকড়া লোমের কুকুর নাক ডুবিয়ে দিলো সেই ফুটন্ত দুধে।

মেয়ে-ঘোড়াগুলো চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। যেন নেকড়ে পড়েছে, খোঁয়াড়ের ভেড়াগুলো এমনি ভয় পেয়ে গেলো। হাঁপাতে লাগলো গরুগুলো।

রাশিয়ানদের দেখে কির্‌ঘিস্‌ স্ত্রীলোকেরা সবিনয়ে আত্মসমর্পন করলে। কদর্য কণ্ঠে হেসে উঠলো দ্রেভেসেনিন, 'আমরা তা হলে মদ্দা ঘোড়া, বটে ?…সব সময়েই নয়…'

দুধে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চাবুকের শব্দ করতে-করতে সে কতকগুলি গরু আর বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চললো এক তাঁবুর দিকে। দড়ির বাঁধন খোলা পেয়েই বাছুরগুলো ছুটলো গরুর স্তনের দিকে, আর আনন্দে বড়ো বড়ো নরম ঠোঁট দিয়ে তার বাঁট টেনে ধরলো।

'কী ক্ষুধা ওদের…'

দ্রেভেসেনিন রিভলভার ছুঁড়ে একেক করে মেরে ফেললো বাছুর-গুলোকে।

গায়ে চক্কর দিয়ে পেট্রভিচও ফিরে যাচ্ছিলো দ্রেভেসেনিনের মতো, হঠাৎ তার মনে পড়লো, 'দুধ খাওয়াবার বোতল চাই একটা। কি আশ্চর্য, তাই ভুলে গেছি।'

বোতলের খোঁজে একেকটা তাঁবুর ভিতরে সে ঢোকে, আর বেরিয়ে আসে। তাঁবুর ভিতরকার আগুন কখন নিভে গেছে। পেট্রভিচ জ্বালিয়ে নিলো একটা কাঠের টুকরো, নাড়তে লাগলো চারদিকে যাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো ছিটকে পড়ে চার পাশে। আর সেই ধোঁয়ায় কাশতে-কাশতে খুঁজতে লাগলো সে দুধ-চুষে-খাবার বোতল। এক হাতে পুড়ছে সেই কাঠ, আরেক হাতে উদ্যত রিভলভার। কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না সেই দুধের বোতল। পশমের বিছানায় কির্‌ঘিস্‌ স্ত্রীলোকেরা গা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, বশ্যতার ভঙ্গিতে। চেঁচাচ্ছে তাদের ছেলেগুলো।

রেগে উঠলো পেট্রভিচ, এক তাঁবুতে যুবতী এক কির্‌ঘিস্‌ মেয়ের

উপর রুখে উঠে বললে সে কর্কশ কণ্ঠে, 'দুধ খাওয়াবার বোতল, একটা দুধের বোতল জোগাড় করে দিতে পারো না ?'

কাঁদছে সেই কির্ঘিস্ মেয়ে, খুলে ফেলেছে তার বুকের জামা···তার পাশে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো কাঁদছে তার ছেলে।

আফানাসি পেট্রভিচ হঠাৎ তার স্তন চেপে ধরলো। শিস্ দিয়ে উঠলো, বলে উঠলো গানের গলায়, 'পেয়েছি—দুধের বোতল। চমৎকার দুধের বোতল। শব্দ কোরো না। চমৎকার দুধের বোতল।'

মেয়েটাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো সে। অন্ধকারে বসালো সে মেয়েটাকে জিনের উপর, আর থেকে-থেকে অনুভব করতে লাগলো তার স্তন, যতক্ষণ না তাকে নিয়ে এলো সেলিভানফের আস্তানায়।

'যা চেয়েছিলাম, পেয়ে গেছি।' চোখে জল, পেট্রভিচ বলছে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে, 'যখন বলি, আমার ওটা চাই, ঠিক আমি তা জোগাড় করে আনি। মাটি খুঁড়ে আনতে হলেও।'

৫

আস্তানায় ফিরে এসে আফানাসি পেট্রভিচ দেখতে পেলো অন্ধকারে, সেই কির্‌ঘিস্‌ মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার নিজের শিশু।

'আসুক গে।' বললে ম্যুজিকরা, 'দুজনের জন্যেই যথেষ্ট দুধ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া গরু আছে, আর এ মেয়েটা তো আচ্ছা জোয়ান।'

কির্‌ঘিস্‌ মেয়ে বড্ড লাজুক আর কড়া, তেমনি সময়েই দুধ দেয় যখন কেউ তাকিয়ে নেই। তাঁবুতে পশমের বিছানায় বাচ্চা দুটো শুয়ে থাকে—একজন অবিচ্ছিন্ন শাদা আর একজন হলদেটে, কিন্তু কাঁদবার গলা তাদের এক।

এক হপ্তা বাদে, বৈঠকে, আফানাসি পেট্রভিচ্‌ অভিযোগ করলে, 'কমরেড, এ লুকোচুরি আমি সইতে পারছি না। কির্‌ঘিস্‌ মেয়েটা আমাদের ঠকাচ্ছে। শুধু নিজের বাচ্চাটাকেই দুধ দিচ্ছে সে। আর আমাদের বাচ্চাটাকে দিচ্ছে শুধু দু-এক ফোঁটা। উঁকি মেরে আমি দেখেছি কাণ্ডটা। তোমরা নিজেরাও দেখবে এসো।'

ম্যুজিকরা তাকালো গলা বাড়িয়ে। পৃথিবীর আর-সব শিশুর মতোই দুটো শিশু। একটা শাদা, আর একটা হলদে, পাকা ফুটির মতো। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় কির্‌ঘিসের তুলনায় রাশিয়ানটা অত্যন্ত কৃশ।

হাত-পা নেড়ে পেট্রভিচ বললে মুখ বেঁকিয়ে, 'আমি ওর নাম রেখেছি —ভাসকা···কিন্তু যখনই তুমি ওকে দেখ,···ছি ছি ছি, ঠকাচ্ছে আমাদের।'

'ও ভাসকা! তোমাকে দেখাচ্ছে যেন এক পা বাড়িয়ে আছ পরকালের দিকে।···' বললে হেসে ড্রেভেসেনিন।

জোগাড় করে নিয়ে এলো একটা লাঠি, আর গাড়ির বমের উপর সেটাকে বসিয়ে পাল্লা বানালে। দেখবে কে কার চেয়ে ভারি।

লাঠির দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে দিলে দুই শিশুকে, কোনটার ওজন বেশি।
ঝুলন্ত কাপড়ে বাঁধা বাচ্চা দুটো উঠলো চেঁচিয়ে। ওদের গা থেকে ভেসে এলো শৈশব-গন্ধ। কির্‌ঘিস্‌ মেয়েটা গাড়ির কাছে আছে দাঁড়িয়ে, কাঁদছে, কিছুই বুঝতে পারছে না বলে।

ম্যুজিকরা নীরবে পর্যবেক্ষণ করছে।

'ছেড়ে দাও এবার।' বললে সেলিভানফ, 'দেখি পাল্লা কোন দিকে বেশি ঝোঁকে।'

লাঠির থেকে পেট্রভিচ হাত সরিয়ে নিলো, আর তক্ষুনি রাশিয়ান বাচ্চাটা লাফ দিয়ে উঠলো শূন্যে।

'হলদে মুখো শয়তান।' রাগে অন্ধ হয়ে বললে আফানাসি পেট্রভিচ।

ভেড়ার একটা মাথার খুলি পড়ে ছিলো মাটিতে, তাই তুলে রাশিয়ান শিশুর পাল্লায় সে রাখলে। এতক্ষণে দুই শিশু সমান হলো।

কোলাহল করে উঠলো ম্যুজিকরা। 'এক মাথা বেশি দুধ খাইয়েছে সে নিজের ছেলেকে—প্রায় এক ভেড়ার মাথা।'

'কেউ নজর রাখেনি যে ছুঁড়ির উপর।'

'কী জাহাঁবাজ মেয়ে! আমাদেরটাকে খাওয়ায়নি একটুও!'

ম্যুজিকদের মধ্যে যারা একটু ভারিক্কি তারা বললে, 'কী করে নজর রাখা যায় সব সময়!'

'তা ছাড়া, ও হচ্ছে ওর নিজের বাচ্চার মা।'

মাটিতে পা ঠুকলো পেট্রভিচ, বললে, 'তা হলে তোমরা বলতে চাও কোথাকার একটা জংলী ভূতের জন্যে আমাদের রাশিয়ান শিশু মারা যাবে?...আমার ভাসকা মারা যাবে?'

তারা তাকালো ভাসকার দিকে। শুয়ে আছে সে কৃশ, নীরক্ত।

ম্যুজিকরা চিন্তিত হয়ে উঠলো।

তখন সেলিভানফ বললে পেট্রভিচকে, 'ওটাকে মেরে ফেলোনা কেন...

ওটাকে মানে, আরেকটাকে। ঈশ্বর ওকে দয়া করুন, ও মরুক···ওই কির্‌ঘিসের বাচ্চা। ও রকম ঢের-ঢের আমরা মেরেছি। একটা কমে আর বেশিতে কী আসে যায়?'

ম্যুজিকরা তাকালো ভাসকার দিকে, কথা না বলে চলে গেলো যে যার রাস্তায়।

আফানাসি পেট্রভিচ কির্‌ঘিস্‌ বাচ্চাটাকে পুরলো একটা ছেঁড়া ছালার মধ্যে।

মা স্থুরু করলো কাঁদতে। পেট্রভিচ তার গালে একটা চড় মারলো, জোরে নয়, আর চলে গেলো প্রান্তহীন প্রান্তরে।

৬

ছুদিন পরে। পায়ের আঙুলের ডগার উপর দাঁড়িয়ে একে অন্যের কাঁধের উপর দিয়ে ম্যুজিকরা উঁকি মারছে ভিতরে, দেখছে পশমের বিছানার উপর সেই কির্‌ঘিস্‌ মেয়ে ছুধ খাওয়াচ্ছে শাদা শিশুকে।

মেয়েটার বিনয়বিষণ্ণ মুখ, যই-বিচির মতো সরু চোখ, গায়ে লাল সিল্কের জামা, পায়ে মরক্কো চামড়ার বুট জুতো।

শিশুটা তার স্তনের মধ্যে আরামে মুখ গুঁজে থাকে, তার লাল জামা নিয়ে খেলা করে আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে পা ছোঁড়ে।

ম্যুজিকরা দেখে উচ্চরোলে হাসে।

কিন্তু সকলের চেয়ে স্নেহপ্রবণ আফানাসি পেট্রভিচ। নাকে কেঁদে বলে, 'চমৎকার নয় বাচ্চাটা ?'

কাপড়ের তাঁবুর বাইরে, কেউ জানে না কোথায় পাহাড় আর প্রান্তর, অজানা মঙ্গোলিয়া।

কেউ জানে না কোথায় চলেছে মঙ্গোলিয়া, ছুর্দান্ত পশু, তিমিরাবৃত।

অ্যালেকজান্ডার নেভিরভ

অকেজো আনড্রন

রাশিয়ার মাটিতে ঘাস আর গজায় না
আগের নিয়মে,
পুরোনো ধারায় ফোটেও না আর ফুল।

—লোকসংগীত

১

চালুনির ভিতর দিয়ে গুঁড়ো পড়ছে তেমনি ধুলো রোদ্দুরে চিকচিক করছে কুঁড়ে ঘরের চারপাশে। জানলার গোবরাটের উপর বসে একটা বেরাল থাবা দিয়ে চুলকোচ্ছে কানের পিছনটা। অনেক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের মার কাছে, ঘরের এক কোণে বসে।

'মা, মা গো, আমার ছেলে আনড্রনকে তুমি ভালো রাখো। বোকাটা যুদ্ধে গেছে—মরে না যায়।'

হাঁটু গেড়ে মাটিতে নুয়ে পড়ছে সে, গোড়ালি উঁচিয়ে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে গড়িয়ে, বেদনাময় হৃদয়ের নিবেদন। তার বোকা ছেলে, কচি ছেলে, তার কথা ভেবে এতটুকু তার স্বস্তি নেই।

জানলার ভিতর দিয়ে সন্ধ্যা উঁকি মারছে, লেগে থাকছে কুঁড়ে ঘরের দেয়ালে, আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে কালো মসলিনের পরদা। বেরালটা মুখ মুছছে। গ্র্যানি বললে তাকে ভয় দেখিয়ে, 'কাকে ডেকে আনছিস তুই, নোংরা, ছুঁচো কোথাকার! বেরিয়ে যা বলছি।'

তক্ষুনি দরজা গেলো খুলে, চৌকাঠে বেজে উঠলো ছোট-ছোট ঘণ্টার শব্দ। একটা কি উৎকট লাল জিনিস তার চোখে লাগলো। দেখতে পেলো সে একটা টুপি, মাথায় আঙুলের মতো একটা গজাল আর একটা পাঁচমুখো তারা। ভয়ে কুঁকড়ে গেলো গ্র্যানি।

'অলক্ষুনে বেরাল, কোত্থেকে ভূত ডেকে এনেছে ঘরের মধ্যে।'

ভয়ংকর সেই লোকটা টুপি খুলে ফেললো মাথা থেকে আর কেমন যেন তাকে তার নিজের ছেলের মতো দেখালো।

'গুড ইভনিং, মা।'

সেই স্বর, সেই আনড্রনেরই তো গলা!

'আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?'

'ও, ক্রাইস্ট, তুই, আনড্রোনুস্কা?'

ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো সে উদ্বেল বাহু দিয়ে, কাঁদলো, হাসলো, বাঁ গালের উপর খুঁজে পেলো তার সেই বাটুলের দাগ।

'দেখি, দেখি, কী অদ্ভুত হয়েছিস দেখতে।'

যখনই পা ফেলছে আনড্রন, ছোট-ছোট ঘণ্টা বেজে উঠছে। হেলছে ডাইনে—ঘণ্টা, বেঁকছে বাঁয়ে—আবার ঘণ্টা। ও যেন বাজছে শুধুই।

'কী বাজছে বল্ দেখি? কোনো খেলনা কিনে এনেছিস?'

'কী যে বলো তুমি মা। এ হচ্ছে জুতোর তলাকার কাঁটা।'

'ও! বোকা ছেলে! এই ভাবে টাকা উড়োচ্ছিস বুঝি?'

মিহাইলা, বাপ, গ্রামের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে। কখনো লম্বা পায়ে, কখনো বা থেমে থাকছে একদম। সেও শুনেছে আনড্রনের ঘণ্টার খবর, লজ্জায় মরে যাচ্ছে কি করে দেখা করবে ছেলের সঙ্গে?

আনড্রন কি আর বাপকে সম্মান করবে? আগের দিন আর নেই। এখন সব অন্য রকম।

'ছিঁড়ে গেছে আমার গাছের ছালের জুতো। কবে যে এরা চাষার পায়ে চামড়ার জুতো চড়াবে?' বলতে-বলতে সে ঘরে ঢুকলো।

খুকির মতো ছুটে এলো গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না। 'আনড্রন এসেছে।'

'খোঁড়া হয়ে যায় নি তো?'

'মুখে তোমার ছাই পড়ুক।'

মিহাইলা আনড্রনের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, খালি শার্টের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এত লাল!

'আয়, কোলাকুলি করি। নিরাপদে যে ফিরে এসেছিস, বেজায় খুশি হয়েছি।'

'তুমি কেমন আছ, বাবা?'

'তুই কেমন?'

আনড্রনের রিভলভার টেবিলের উপর পড়ে আছে, ছোট চামড়ার খাপে।

'কী আছে ওটাতে?'

'আগুনে-অস্ত্র।'

'গুলি ছোঁড়া যায়?'

'পনেরো গজ দূরে-দূরে দুটো পুরু তক্তা ফুঁড়ে চলে যেতে পারে এর গুলি।'

'শুনছ গো?'

গ্র্যানির গলা সরু, খুকির মতো: 'তুমি কী রকম লোক বলো দেখি। আসতে না আসতেই ওকে তুমি জেরা করতে সুরু করেছ, একটু জিরোতে দিচ্ছ না!'

সামোভারটা সানন্দে কোলাহল করছে। গ্র্যানি তাকে বললে তিরস্কার করে, 'পাজি। জ্বলছে দেখ না! কি, কোনো কু-র সূচনা নাকি? এত হাঁসফাঁস করছিস কেন নইলে?'

যেন বই পড়ছে এমনি গলায় অনাড্রন বললে, 'তুমি কী অদ্ভুত মা!

সামোভারের তো প্রাণ নেই।'

মিহাইলা চোক মটকে তাকালো গ্র্যানির দিকে।

'বুঝতে পারলে?'

আর গ্র্যানি তাকালো মিহাইলার দিকে।

'বুড়ো, হতচ্ছাড়া।'

অতিথিতে ভরতি আজ ঘর। এসেছে খুড়ো লিজার, ক্লিম আর তার স্ত্রী, এরোফেই আর তার স্ত্রী, আর এক সৈন্যের বউ—প্রহরভা—ফুলন্ত আফিং-গাছ। মাঠের উই-ঢিপির মতো বুক, খুব সরু শাদা ময়দায় তৈরি বাহু। ক্লিম আর এরোফেইকে দেখাচ্ছে ঠিক খাঁটি চাষার মতো—লম্বা, ঝাঁকড়া দাড়ি, চিরুনি পড়েনি কোনো দিন। ভানচাকে মানুষই বলা যায় না, পাৎলা গোঁফ আর দাড়িতে চার পাঁচ গাছার বেশি চুল নেই। তার স্ত্রীও বিশেষ সুন্দরী নয়, ডিগডিগে মেয়ে, পেটটা রয়েছে উঁচিয়ে, আর নাকটা ছুলিতে ঢাকা। প্রেম জানিয়ে-জানিয়ে তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে ভানচা, দীর্ঘ সব শীতের রাত্রি, তা ছাড়া আর কোনো কৌশলই তার জানা নেই।

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না ফিটফাট করে সেজেছে, কাঠের সিন্দুক থেকে খুলে গায়ে দিয়েছে নীল ছিটের ব্লাউজ, পাকা চুল বেঁধে নিয়েছে শাদা রুমালে। ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূরীর মতো। ঢেউয়ের মতো ফুলে রয়েছে মিহাইলার শার্ট, পেটের নিচে সিল্কের বেল্ট বাঁধা। যতদূর সম্ভব সেও নিজেকে ফিটফাট করেছে। এমন কি, দাঁড়ি আঁচড়ে নিয়েছে একটু।

অনেক দিন ধরে আস্তাবলে পুরে রাখা ঘোড়ার বাচ্চার মতোই সামোভারটা। বাঁ নাকের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে আর সশব্দে নাচাচ্ছে ঢাকনিটা। কাপ আর ডিস পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছে। অতিথিদের কথোপকথন প্রায় কোলাহলের কাছাকাছি।

'আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আনড্রন মিহাইলিচ, তুমি যে ফিরে এসেছ।'

'দয়া করে চিনিটা ঢেলে নিন।

'কোন কোন শহরে গিয়েছিলে বলো তো?'

'বারো-বারোটা বড়ো শহর আমি দেখেছি।'

'ককেশাসে গিয়েছিলে?'

'ককেশাস আমাদের এলাকায় নয়; জর্জিয়ান আর মেনসেভিকসরা সেখানে আছে।'

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না আতিথিদের এমন ভাবে খাওয়াচ্ছে যেন এটা বিয়ের উৎসব।

'কিছু চিনি নিন। নিন কিছু চিনি।'

এরোফিভার কানে-কানে না বলে পারলো না: 'জানো, দেড় সের চিনি এনেছে ও সঙ্গে করে।'

'দেড় সের!'

কথা কইছে কাপ-ডিস, কথা কইছে অতিথিরা।

'আনড্রন! চাষা বলে আমাকে কি আর সম্মান করবে? বন্ধু বলে নেবে আর কখনো?'

'দাঁড়াও। আমার একটা ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। মানে, ঈশ্বর সম্বন্ধে। আচ্ছা আনড্রন নিহাইলিচ, ঈশ্বর আছে কি নেই?'

'ঈশ্বর? ঈশ্বর ধাপ্পা।'

কী ভীষণ! কী বিশ্রী! টি পট থেকে চা ঢালতে গিয়ে ম্যাট্রিয়নার ভুল হয়ে গেলো কোথায় রয়েছে কাপ। আনড্রনের কথা তার কাছে দুরূহ কিন্তু উদ্বেগজনক।

'তা হলে ধর্ম একটা সরকারী ইস্তাহারের সামিল?'

'ঠিক তাই।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'নিশ্চয়। ধর্ম হচ্ছে অশিক্ষিত জনগণের কুসংস্কার।'

পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। তার পর—আর কিছুই নেই। লিজার এক দিকে মাথা হেলিয়ে বললে, 'যদিও তোমার সঙ্গে আমি একমত, তবু এ আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয় না, যাই হোক, জীবনে ধর্মই হচ্ছে সার জিনিস।'

'কিছু না, কিছু না।'

ভানচা উঠলো চেঁচিয়ে : 'তা হলে কে বৃষ্টি দেয় জিগগেস করি?'

তার স্ত্রী টেনে ধরলো তার জামার হাতা। বললে, 'তুমি চুপ করো। শোনো, অন্যেরা কী বলে।'

ক্লিম বললে আবেদনের সুরে, 'আমাকে কিছু বলতে দাও, আনড্রন। একটু থামো, লিজার। শুনছ, এরোফেই? বৃষ্টি—বৃষ্টির কথা ভাবি না। বিজ্ঞান বলে, ও ইলেকট্রিসিটি থেকে আসে। আমি ভাবছি ধনতন্ত্রের কথা। ও সাংঘাতিক জিনিস। সমস্ত ল্যাণ্ড ডিপার্টমেণ্ট না ও ভূমিসাৎ করে দেয়।'

টেবিলের উপর দু-কনুইএর ভর রেখে এরোফেই বললে, 'সত্যি কি তাতে বাধা হচ্ছে কিছু?'

'প্রতি পদে বাধা।'

'সম্রাজের শত্রু!'

আনড্রন সান্ত্বনা দিলো ওদের। বললে, 'ধনতন্ত্রকে ভয় কোরো না কমরেড। কবে ওকে আমরা ধূলিসাৎ করে দিতাম যদি মধ্যবিত্তরা না আমাদের বাধা দিতো।'

চা ঢালতে গিয়ে গ্র্যানি ম্যাট্রিয়নার দ্বিতীয় বার ভুল হয়ে গেলো, কোথায় রয়েছে কাপ। কী কথা, কী ভাষা!

নড়াচড়া করছে আনড্রন, আর টেবিলের নিচে বাজনার আওয়াজ হচ্ছে। রুমাল নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে প্রেহরভা, গরম লাগছে খুব।

'আনড্রন ! বলশেভিস্ট পার্টি কি ?'

'সব চেয়ে পাজি পার্টি।' বললে মিহাইলা, 'কী করে আমাদের সব শস্য হাত করলো সেবার, শোননি ? চামড়ার টুপি-পরা একটা লোক এসে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। বললে, তোমরা চাষারা হচ্ছ কাস্তে, আর আমরা যারা শহরে থাকি, তারা হচ্ছি হাতুড়ি। এসো আমরা একত্র হই।'

ভানচা জোরে হেসে উঠলো : 'কী রসিকতা !'

লিজারের মাথা গরম হয়ে উঠলো উত্তেজনায়। 'কমিউন আমাদের এখানে একজন শিষ্য পাবে না।'

'কেন পাবে না শুনি ?'

'আমি বলছি।' মিহাইলা এলো এগিয়ে।

'তুমি চুপ করো, বাবা।'

অপমানের মতো লাগলো মিহাইলার। 'আমাকে চুপ করতে বলছিস তুই কোন সাহসে ? আমি তোর বাপ নই ?'

'আমার গায়ে হাত তুলো না বলছি, বাবা।' আনড্রনের গলা আরো চড়ে গেলো : 'ভানচা, বাবার হাত চেপে ধরো।'

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না ছুটে এসে মিহাইলার পিঠে মারলো এক কিল : 'তুমি নেশা করেছ, নির্লজ্জ কোথাকার।'

ক্লিম বললে আবেদনের সুরে, 'একটা ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে। কমিউন সম্বন্ধে লিজার যা বলছে তা হচ্ছে পয়সাকড়ির দিক থেকে। ধরো মই, ধরো কাঁটা, ধরো আর সব চাষবাসের যন্ত্রপাতি—কিছুই আমাদের নেই ধরতে গেলে। কমিউন যদি এসব জোগায় আমাদের, আমাদের কোনোই আপত্তি নেই। ঠিক নয়, এরোফেই ?'

'একশো বার।' টেবিলের উপর কিল মারলো ভানচা।

মিহাইলা তার বিছানায় বসে হাঁকপাঁক করতে লাগলো। 'ককখনো

মেনোনা আনড্রনের কমিউন !'

'আর লোক হাসিও না, বাবা। ওসব পাতি মধ্যবিত্তদের মতোই তোমার ছোট মন।'

বিছানাটা মিহাইলা ছুঁড়ে মারলো মেঝের উপর : 'এরোফেই, মেনো না আনড্রনের কমিউন !'

প্রহরভা ঘুমুতে পাচ্ছে না, তার যেন জ্বর হয়েছে। চোখের উপর জ্বলছে আনড্রনের শার্ট, তার জুতোর কাঁটার শব্দ গায়ে যেন তার কাঁটা ফোটাচ্ছে। শিরায়-শিরায় রক্ত জোরে বইছে, ঘুরে-ঘুরে বইছে। বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠছে, কি যেন তার নেই। কি যে তার নেই তা সে নিজেই জানে না।

এই বোধহয় প্রেম !

বাড়িতে-বোনা কম্বলটা গায়ের থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রহরভা বিছানার উপর উঠে বসলো, সেমিজ ছাড়া আর কিছুই নেই তার গায়ে। এত গরম লাগছে তার। তার হৃদয় কাঁদছে···কাঁদছে, কে না জানে কিসের জন্যে কাঁদছে তার হৃদয়, যে-হৃদয় পায়নি একটুও আদর কোনো দিন ! কে তাকে দোষ দেবে বলো ?

ছোট-ছোট ঘণ্টার আওয়াজ হচ্ছে বাইরে। কাছে আর জোরে, জোরে আর কাছে। কেন লোভ দেখাচ্ছ অসহায় স্ত্রীলোককে ? সত্যি, সম্পূর্ণ তার আবৃত হবার আগেই, সামনে আনড্রন, হাসছে মৃদু-মৃদু।

বললে, 'ভয় পেয়েছ, আনা স্টেফানোভনা ?'

চারটি শব্দ, চারটি পেরেকের মতো। একটা বিদ্ধ করলো তার বুক, একটা মাথা, একটা হাত, বাকিটা পা।

একেই বলে প্রেম !

আনড্রন বসলো তার বিছানায়, প্রহরভার ইচ্ছা নেই, চেতনা নেই।

তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে দু-দুবার ডেকে গেলো মোরগ—তারা শুনলো না। প্রহরভার বুড়ো মা দুধ দুইতে গেলো—তারা দেখলো না। বাড়িতে-বোনা কম্বলের নিচে তারা খেলা করছে আর হাসছে।

'আনড্রোন্নুস্কা! ডার্লিং। এবার বাড়ি যাও।'

'আনন্নুস্কা! ডার্লিং! আরো একটু থাকতে দাও আমাকে।'

'লোকেরা দেখে ফেলবে। মন্দ বলবে।'

'লোকেদের আমি ভয় করি না।'

আনড্রনের শার্ট যেন সমস্ত ঘরে আগুন লাগিয়েছে। বিছানার উপরে জ্বলছে খোড়ো চাল, জ্বলছে উঠোনের চার পাশের কঞ্চির বেড়া, প্রভাত জ্বলতে জ্বলতে দিনের আলো হয়ে গেছে।

'আনড্রোন্নুস্কা! ডার্লিং! খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত থাকো বিছানাতে।'

'আনন্নুস্কা! ডার্লিং! আমাকে একটা খুব ভালো করে চুমু দাও।'

এক দিন গেলো, গেলো এক সপ্তাহ—আনড্রন ডাকেনি ঈশ্বরকে।

মিহাইলা জিগগেস করলো স্ত্রীকে, 'কী করি আমি ওকে নিয়ে?'

'একটু অপেক্ষা করো। কয়েক দিনের মধ্যেই ওর বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে আসবে।'

এক দিন, এক সপ্তাহ, অপেক্ষা করলো মিহাইলা—তবু আনড্রন বসলো না প্রার্থনায়।

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না তাকে বললে, 'তুমি আজকাল প্রার্থনা করো না কেন, আনড্রোন্নুস্কা?'

ছেলে বললে, 'ওসব ছেড়ে দাও। মানুষ তো জন্মেছে বাঁদরের থেকে।'

মিহাইলা রাগে উপচে পড়লো: 'কোন বইয়ে লেখা আছে শুনি?'

'তা তোমাকে বলে লাভ কি? তুমি কি পড়তে পারো?'

'তা হলে তুমি গির্জেয় বিশ্বাস করো না?'

'গির্জে ? গির্জে তো ধম্মের থিয়েটার। যে কোনো পার্ট আমাকে দাও, আমি করে আসতে পারি।'
আরো রেগে উঠবার জন্যে মিহাইলা এক ঢোঁক ভডকা খেয়ে নিলো। তার কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'তোকে কে জন্ম দিয়েছে শুনি ?'
'প্রকৃতি।'
'কোন প্রকৃতি ? বল্।'
আনড্রন দেখলো যে মিহাইলা আস্তিন গুটোচ্ছে। হেসে বললে, 'এগিয়ো না বলছি, ঠ্যাঙাবো কিন্তু।'
'বাপকে ঠ্যাঙাবার তোর অধিকার আছে ?'
'আমি মাকে মারতে পারি না, কিন্তু তুমি যদি অমন করে ঘুসি বাগাও, তা হলে তোমাকে মারবো।'
'কুত্তার বাচ্চা কোথাকার !'
আনড্রন বাপের হাত ধরে ফেললো। বললে, 'এ সব আর চলবে না বাবা। মা, একটা বেল্ট এনে দাও তো, বাবার হাত দুটো কসে বেঁধে ফেলি।'

রাস্তায় লিজারের সঙ্গে মিহাইলার দেখা।
'সব গোল্লায় গেছে, লিজার-খুড়ো।'
'কেন, কী হয়েছে ?'
'ঈশ্বর নেই, গির্জে নেই, বাপ-মা হচ্ছে বাঁদর···'
'ছেলেটাকে বিয়ে দিয়ে দাও—একা থাকা কোনো কাজের কথা নয়।'
আনড্রনকে বোঝাবার জন্যে লিজার নিজে গেলো। চালার নিচে, ছায়ায়, আনড্রন আর প্রহরভা বসে আছে। জুতার কাঁটা নিয়ে খেলা করছে একজন, আর একজন ছোট্ট রুমাল নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে আর প্রতিবেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।
'সুপ্রভাত, আনড্রন মিহাইলিচ। সভা করছ বুঝি ?'

'জীবন সম্বন্ধে কথা বলছি, লিজার-খুড়ো।'

'কথা বলবার বিষয় বটে। কী মনে হয় তোমার আমাদের জীবন সম্বন্ধে ?'

'আপনারা যে ভাবে চালাচ্ছেন তাতে আমি মোটেই খুশি হতে পারছি না। আপনাদের মধ্যে মোটেই বিদ্রোহবোধ নেই।'

লিজার হাসলো। 'তুমি খুব চালাক সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি তুমি বিয়ে করতে, তা হলে খুব ভালো হতো। স্বামীর অধিকার নিয়ে পারতে দাঁড়াতে।'

'ভালো হতো কী করে ?'

'খুব ভালো হতো। যদি বিয়ে করতে, তবে অনেক জিনিসে তোমার মন বসতো। আনমুস্কা, আমাদের একটু গোপন কথা আছে।'

প্রহরভা উঠলো চলে যেতে, কিন্তু হাত ধরে রইলো আনড্রন। বললে, 'না, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আজকালকার মেয়ে সমস্ত তর্কে ও কথায় যোগ দেবে।'

লিজার এক দিকে মাথা হেলিয়ে বললে, 'ওকে যদি অন্তত তুমি ভুল পথে না নিয়ে যাও, তা হলে কি ভালো হয় না ?'

'তুমি ভারি অদ্ভুত লিজার-খুড়ো।'

'তার মানে ?'

'তার মানে নেই। আমি গির্জের বিয়েতে বিশ্বাস করি না, আমি মেয়েদের দেখি সহকর্মিণী বলে, কমরেড বলে।'

বাড়ি ফিরে গেলো লিজার, যেন গরম স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এমনি চেহারা। রাস্তায় নেমে এসে পিছনে তাকিয়ে থুতু ছিটোলো খানিকটা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিহাইলা জিগগেস করলে, 'ছেলেকে পারলে জপাতে বিয়ে করবার জন্যে ?'

'প্রায়।'

এক দিন গেলো, এক সপ্তাহ গেলো—আনড্রন ঘোড়াটাকে একেবারে মাটি করেছে।

গ্রামের আর-আর ঘোড়ার মতোই ছিলো সেই ঘোড়া। জিরজিরে পায়ে হেঁটে যেতো মাঠের উপর দিয়ে, মাদি-ঘোড়া দেখে নাকের মধ্যে শব্দ করে উঠতো। ঠুকরে-ঠুকরে পিঠের লোম নিয়ে যেতো দাঁড়কাক, সমস্ত পেটে পোকা থুকথুক করতো। আর-আর ঘোড়ার মতোই দামড়া ঘোড়া। কিন্তু এখন—এখন সমস্ত মাটি কাঁপে তার ছোটার দাপে। আর যখন আনড্রন ছোটে তাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে, কেউ বলতে পারে না এ কি কোনো কসাক না স্বয়ং শয়তান? যদি মুরগির বাচ্চা একটা চলে আসে পথের উপর সে স্বচ্ছন্দে সেটাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। যদি একটা হাঁস অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, থেঁৎলে দিয়ে যায় সেই হাঁসের পাখনা। জানলা দিয়ে কোনো বুড়ি তাকে দেখলে তখুনিই ক্রুশের ভঙ্গি করবে। যুবতী কোনো মেয়ে বাড়ির ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসেই ভুলে যাবে কোথায় সে যাচ্ছিলো। আনড্রনের শার্ট জ্বলছে যেন আগুনের মতো। যেই নাড়ছে তার পা, ঘণ্টা বেজে উঠছে। মাথার উপরে কাৎ-করা তার টুপি—সমস্ত গ্রামে তার মতো এমন লোক আর দেখেনি কেউ কখনো।

মেয়েদের বুকে ব্যথা করে উঠছে, রক্তে এসেছে জোয়ার।

মিহাইলা খুব দুঃখিত, ঘোড়াটার জন্যে দুঃখিত, কী করা যায় আনড্রনকে নিয়ে?

উঠোনে এসে মিহাইলা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এ কার ঘোড়া ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছে পথ ভুলে? লেজে ফিতে, কেশরে ফিতে, মাথার উপর লাল কাগজের ফুল!

'হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা।'

ইচ্ছে হলো সব সাজসজ্জা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু সামনেই আনড্রন।

'বোকামি কোরো না বলছি।'

মিহাইলা মনমরা হয়ে বললে, 'ঘোড়াটাকেও লজ্জা দিচ্ছ কেন ?'
'তুমি কিছু লেখাপড়া শেখনি, বাবা।'
ছেলেকে ভাঙবে এমন শক্তি মিহাইলার নেই। নিজে ভেঙে পড়বে, এও অসহ্য, লোকে কী বলবে ? কুঁড়ে ঘরের বাইরে মিহাইলা চুপ করে বসে থাকে, তার মাথাটা যেন এক বস্তা বালি। তাকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ডাকছে একটা চড়ুই, গুনগুনাচ্ছে মাছি। মোরগ মুরগীকে খাইয়ে দিচ্ছে শস্যের টুকরো আর কথা কইছে তেজী গলায়। কেউ—কেউ এরা বোঝে না মানুষের দুঃখ। যে পোকাটা মানুষের পায়ের তলায় পিষে মরে যায় তারও কাছে জীবন হয়তো মধুর। কিন্তু মিহাইলার মন যেন গরম জলে-ভর্তি এক জগ জল। ঘোড়াটাকে বোকার মতো দেখাচ্ছে, আর সে দেখতে পাচ্ছে না, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যাওয়া সইতে পাচ্ছে না সে। গ্লানিতে মন ভরে উঠেছে যখনই ভাবতে চাচ্ছে সে নিজের কথা, আনড্রনের কথা। কেন ঐ তারাওলা টুপি ? কেন ঐ লাল শার্ট ? ঐ হচ্ছে দুঃখের প্রতীক। কেউ কিছু বলতে পারে না, আর মিহাইলা তো সেই কেউর চেয়েও কম।

গ্রামের তিন বুড়ো মোড়ল এসে হাজির : সিয়েনিন, মার্কোনিন আর পটুঘিন। তিনজনেরই দাড়ি বর্শার ফলার মতো ওঁচানো, বসেছে তারা আনড্রনের বিচারে, সেই উদ্ধত, দুর্বিনীত, ধর্মত্যাগী আনড্রন। মেঝেতে লাঠি ঠুকছে আর বলছে সব তারা ন্যায়ধর্মের কথা।
'ছেলের সম্বন্ধে সব খোলাখুলি বলো শুনি।'
অপরাধী ছাত্রের মতো মিহাইলা দাঁড়ালো সেই গ্রাম্য সালিশের কাছে। বললে, 'কী বলবো আমি ? আমি কিছুই জানি না।'
'না, তুমি জানো।'
'সবই জানি, কিন্তু আসলে কিছুই জানি না।'

'এ হতেই পারে না।'
পটুঘিন হচ্ছে প্রধান বিচারক। ডান হাতে লাঠি তুলে বাঁ পায়ে কি লিখলো সে ধাঁধার মতো অক্ষর।
'তোমার সঙ্গে আমরা ঝগড়া করতে আসিনি। বন্ধুর মতোই কথা বলতে এসেছি। তোমার ছেলে এক মাস হলো এসেছে—এসে এ পর্যন্ত বিস্তর পাপ করেছে, প্রায় দু বস্তা ওজনের মতো হবে। ওর দোষেই গাঁয়ের ছেলেরা হয়েছে অবাধ্য, মেয়েরা শাসন মানছে না। বিয়ে না করেই এক-সঙ্গে ঘুমুচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করছে না ঈশ্বরের কাছে। শুনেছ, এমন আইন আছে কোথাও?'
'আমার সময় এমন আইন তো ছিলো না।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললে সিয়েনিন।
'শুনেছি তুর্কীদের নাকি এ রকম আইন আছে…'বললে মার্কোনিন।
ছোট ছেলের মতো মিহাইলা দাঁড়িয়ে। 'আমার কী দোষ? বলতে চান কি আমিই খুব খুশি ওর ব্যবহারে? আমাকে জিগগেস না করেই ও পরেছে ওই লাল শার্ট। লাল তারা আঁটবার আগেও আমার মত নেয়নি। আমার কী ক্ষমতা ওকে বাধা দিই? বুটের তলায় পোকার যেমন ক্ষমতা, আমারো তেমনি।'
পটুঘিন দাড়ি উঁচিয়ে প্রশ্ন করলে, 'কবে যাচ্ছে ও?'
'যাচ্ছে না, এইখানেই থাকতে চায়।'
'এখানে?'
'হ্যাঁ, এখানে।'

তিন বিচারক স্তব্ধ হয়ে গেলো, নুয়ে পড়লো তাদের মাথা। এই হচ্ছে মানুষের দুঃখের চেহারা!
বাজে-পোড়া তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের নিচে। তাদের

পাতায় মর্মর নেই, কাউকে চঞ্চল করে তোলে না। নেই একটিও সবুজ পাতা, নেই এতটুকু কৌতুকোচ্ছল রোদের ঝিকিমিকি। বিদ্যুৎদগ্ধ সেই তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর হয়ে।

তিন মোড়লের বুকের মধ্যে বাজছে যেন প্রায় হাতুড়ির ঘার মতো : 'সে থাকতে চায় এখানে!'

কুমারীরা বিয়ের আগেই ঘুমুবে, যুবকেরা কথা শুনবে না গুরুজনের। ঘোড়ার লেজে ঝুলিয়ে দেবে লাল ফিতে, কেশরে বুনট করবে, যেন চলেছে কোনো বিয়ের শোভাযাত্রায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটবে, যেন শয়তানকে দেবে মুক্তি।

বিছুটি গজায় মাঠে—কে দেখে তা?

সমস্ত মাঠ জুড়ে চাষার দুঃখ—লাগবে এ কিসের প্রয়োজনে?

তারা উঠেছে বাড়ি যেতে, উঠোন পেরিয়ে আনড্রন ঢুকছে ঘরে।

'দাঁড়াও মার্কি! শোনো কুজমা!'

তিন জোড়া চোখ দিয়ে তাকালে তারা সেই দুর্বিনীতের দিকে, সেই ছন্ন-ছাড়া অকেজোকে শাসালো তারা দাড়ি দেখিয়ে। আনড্রনের মুখ দেখতে পাচ্ছে না তারা, দেখছে শুধু তার লাল শার্ট। বেলুনের মতো ফাঁপা তার প্যাণ্ট, গোড়ালিতে ঘণ্টা-বাঁধা জুতো পায়ে। মোটেই দেখাচ্ছে না আর চাষার ছেলে বলে। কী কুক্ষণে যুদ্ধে গিয়েছিলো সে—বাপ-মার পক্ষে কী ঘোরতর দুর্দিন! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে যে, এ আরো বেশি দুর্ভাগ্য। অনেক ভালো হতো যদি সে না ফিরতো একেবারে।

আনড্রন মুখ ধুলো, মাথা ধুলো। ছোট কাঠের সিন্দুক থেকে বার করলো আয়না। আর আঁচড়াতে সুরু করলো গোঁফ, ধার দুটো যাতে চোখা, খাড়া হয়ে ওঠে।

গোল্লায় গেছে একেবারে!

দু-হাত দিয়ে ঘরের কড়ি ধরে ঘুরপাক খেতে লাগলো সে ডনবীরের

মতো, একবার উপরে আরেকবার নিচে এমনি করে মাথায় চক্কর খাচ্ছে সে। যে কোনো মুহূর্তে যেন কাঠটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে। বুড়ো তিনটে সরে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের দিকে, যেন পাথর ব'নে গেছে।

'হা ভগবান! মানুষে কতদূর মূর্খ ই যে হতে পারে।'

খেলা থামিয়ে হাসলো আনড্রন। 'নিশ্চয়ই তোমরা জানো না কি করে করতে হয় এই কসরৎ।'

পটুঘিন ভুরু কুঁচকোলো। মুখে একটা তিরস্কারের কথা—প্রহরভা ঢুকলো ঘরে। জরির-পাড়-বসানো সুঁচের-কাজ-করা ব্লাউজ গায়ে, রঙ-চঙে শাল, চুনট করা সঞ্জাব-বসানো স্কার্ট পরনে।

'সুপ্রভাত!'

আনড্রন তার সঙ্গে করকম্প করলে। 'বোসো।' বেজে উঠলো তার পায়ের ঘণ্টা।

প্রহরভা যেন খুশিতে উথলে পড়ছে। গরম লাগছে তার, শাদা রুমালে মুখ মুছছে বারে-বারে।

পটুঘিন থুতু ফেললো এক গাদা।

'আনকা, তোমার লজ্জা করে না?'

'লজ্জা করবে কেন? কেন, কী করেছি?'

'যা তুমি করছ মোটেই তা ভালো নয়। তোমার স্বামী শুধু বিদেশে—মরে যায় নি।'

'আমার স্বামীটি বিশেষ সুবিধের নয়, দাদামশায়।'

লোহার শেকল দিয়ে তুমি ঘোড়া বাঁধতে পারো। লোহার খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারো ঘোড়ার বাচ্চা। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের কাঁধে ভূত চেপেছে তাকে ঠেকাবে কি করে?

নেই তেমন শৃংখল। এমন কোনো আদেশও নেই যার সেই শক্তি আছে।

মেঝের উপর লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে চললো সেই বুড়োরা, নোয়ানো পিঠে, একের পিছনে আরেক। নিঃশব্দে নামলো উঠোনে, উঠোন থেকে বেরুলে তেমনি নিঃশব্দে। দাঁড়ালো তারা রাস্তায় এসে।

'বলে কি! এখানেই থাকতে চায়।'

ভানচার স্ত্রী বড্ড ঠাণ্ডা-মেজাজি। ছ বছর তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু কোনো দিন স্বামীর প্রতিবাদ করেনি। যখন রেগে চেঁচিয়ে উঠেছে ভানচা, তখনো সে আপত্তি করে নি। যখন তাকে মেরেছে ভানচা, তখনো মুখ থেকে বেরোয়নি একটিও মৃদু আওয়াজ। চমৎকার স্ত্রী!

যেমন লোকে চায়।

তারা যেমন খুশি দিন কাটাচ্ছে—তাতে লোকের কী?

কিন্তু হঠাৎ কি একটা ঘটলো।

ভানচা অস্থির হয়ে উঠেছে—লুকেরিয়া বাড়ি নেই। বেরিয়ে আসছে উঠোনে, নেই সেখানে; বেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়—কোথায় লুকেরিয়া! কুকুরগুলি কি মেয়েটাকে খেয়ে ফেলেছে? রাগে ভানচার মুখ আকুঞ্চিত হয়ে আছে। বসছে এসে বিছানায়—বাড়িতে বোনা মোটা কম্বলে স্ত্রীর গন্ধ, কিন্তু স্ত্রী নেই। বালিশের মধ্যে মুখ লুকোচ্ছে, সেখানেও সেই স্ত্রীর গন্ধ, কিন্তু স্ত্রী পলাতক!

'বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকলো রাত, কিন্তু লুকেরিয়ার ফেরবার নাম নেই। রক্ত ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে ভানচার। হাতে বোনা কম্বলের উপর শুয়ে সে ছটফট করছে, এ-পাশ ও-পাশ করছে।

'বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

চলে গেছে। যাক, তাতে কি? কার তাতে কী এসে যায়? ভানচার তা লক্ষ্য করাও উচিত নয়, আছে না চলে গেছে, কিন্তু কেন কে জানে,

থেকে-থেকে অস্থির লাগছে তার। ইচ্ছে করলো ঘোড়াটাকে ঘা কতক দিয়ে আসে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে দরজা খুললো। ঢুকলো লুকেরিয়া।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে জিগগেস করি ?'

লুকেরিয়া তাকালো স্বামীর দিকে। ভানচার মনে হলো এ যেন আগের লুকেরিয়া নয়। বিয়ে করে ছ বছর যার সঙ্গে ঘর করেছে এ সে নয়। এমন কি তার স্বর গেছে বদলে, এই সেই স্বর নয় যে-স্বর এত বছর ভুলেও কখনো প্রতিবাদ করেনি তার।

'অমন করে চেঁচিয়ো না, ইভান !'

ভানচার পায়ের তলায় মেঝেটা যেন পাক খেতে লাগলো, সমস্ত কুঁড়েঘরটা যেন উলটে পড়বে। স্ত্রীকে মারবার জন্যে হাত উঠলো তার, কিন্তু পলকে লুকেরিয়া তা সাপটে ধরেছে। বললে, 'আর আমাকে মারতে পরেবে না, ইভান।'

অদ্ভুত, অসম্ভব কথা।

'মারবো না ? একশোবার মারবো।'

'না, আর সইবো না তোমার মার। ছ' বছর আমার বিয়ে হয়েছে, কোনো দিন শুনিনি তোমার মুখে একটা ভালো কথা।'

ভানচা হাঁ হয়ে গেছে। সেই লুকেরিয়ার নাক, সেই তার ছুলি, কিন্তু লুকেরিয়া কোথায়! যে তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে, সে লুকেরিয়া নয়। এ একটা বেরাল। বেরালের চোখের মতোই জ্বলছে তার চোখ!

খুব দেমাক হয়েছে মাগীর। আচ্ছা, তেরিমেরি করে তো মারবো তখন ঘা কতক।

'খাবার তৈরি করো।'

খেলো তারা রাতের খাবার।

‘বিছানা করো।’

করলো বিছানা।

‘শোবে চলো।’

শুলো গিয়ে বিছানায়, কিন্তু তার দিকে পিছন ফিরে রইলো। ঘাড় ধরে টান মেরে ভানচা বললে, ‘এদিকে ফিরে শোও।’

ফিরে শুলো, কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়।

‘দাঁড়াও, পা-টা—’

লুকেরিয়া আবার শুলো পিছন ফিরে।

‘শুনবে না আমার কথা?’

‘তোমাকে আমি আর চাইনা, ইভান।’

ভানচা হাঁ হয়ে গেলো। আবেগে ফুলছে তার নাকের বাঁশি। তার দাড়ির চার-চারটে লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

‘তোমার কি শরীর ভালো নেই?’

‘না, তা নয়। তুমি সময়-অসময় বোঝো না।’

‘না, এই সেই আগের লুকেরিয়া নয়। যে ছ বছর তার সঙ্গে বিয়ের বাঁধনে বাঁধা।

‘এদ্দিন পরে এই কথা?’ তার পাঁজরে মারলো এক ঘুসো। বিশেষ যে লাগেনি তা বেশ বোঝা যায়, তবু বেরালের মতো লুকেরিয়া ফোঁস করে উঠলো।

‘আমাকে মেরো না বলছি।’

‘বা, বেশ বলেছ।’

দু জনে বসে রইলো বিছানায়, চুপ করে। বাইরে বাজছে কোথায় একর্ডিয়ন, মেয়েরা গান গাইছে। সব আগের মতো, যে যার জয়গায়। প্রস্কুভরফের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রস্কুভরফ তার টেবিলের সামনে বসে আছে আর তার স্ত্রী পেটিকোট পরে ছুটোছুটি করছে। রাতের খাবার

খাচ্ছে তারা, সন্দেহ নেই। তারপর তারা শুতে যাবে। চাষার বাড়িতে যেখানে যেটুকু দরকার সব হুবহু, ঠিকঠাক। শুধু লুকেরিয়া আর ভানচাই বিছানার উপর আছে বসে, কারু মুখে কথা নেই।

জিগগেস করলো ভানচা, 'কোথায় গেছলে শুনি ?'

লুকেরিয়া বললে ঠাট্টার সুরে, 'আমার পীরিতের লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'গলাটা মুচড়ে দেবো একেবারে।'

'দাও দেখি তো।'

এই সুরু হলো। যেই তার ঘাড়ে হাত দেবে ভানচা, লুকেরিয়া লাফ দিয়ে উঠলো। বললে, 'যদি আমাকে আর মারো, আমি চলে যাবো এখান থেকে।'

'কোথায় যাবে শুনি ?'

'আমার মার কাছে।'

বা, বেশ কথা ! বিবাহিত মেয়ে থাকবে বাপের বাড়ি !

'ওসব কথা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে ?'

আর লুকেরিয়া এমন ভাবে উত্তর দিলো যেন সে স্বামী কাকে বলে শোনেনি কোনো দিন।

'এ সবে আমার আর রুচি নেই। মেয়েদের প্রতি তোমার একটুও বিবেচনা নেই।'

তাই সে-রাত কাটলো তাদের পরস্পরের দিকে পিঠ করে।

ফিলিমনফের ঘরে ঘটলো এর চেয়েও কেলেংকারি। ছোট বউ তার ঘাগরা গুটিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি ছেড়ে, যেন দল ছেড়ে গরু গেলো বেরিয়ে। তার ভাইরা, লাল সৈন্যরা, টেনে নিয়ে গেলো তার ট্রাঙ্ক, যেন ও একটা মৃতদেহ। স্বামী ফিলিমনফ তাকিয়ে রইলো, তার হাত কী

অদৃশ্য শক্তি দিয়ে বাঁধা !

এ মন্দ পরিহাস নয়।

কাল তার স্ত্রী ছিলো—আজ নেই। কাল সে ফিলিমনফের প্যাণ্ট সেলাই করে দিচ্ছিলো, আজ কেউ নেই সেলাই করবার।

যেন শয়তানের খেলা।

দাঁতে দাঁত ঘসে ফিলিমনফ ঘুরে বেড়ায় ঘরের মধ্যে।

একটা চড়ুই পাখির স্ত্রী আছে, একটা তেলাপোকার স্ত্রী আছে। মেয়েমানুষ ছাড়া তার জীবন কাটবে কি করে? রাগে জ্বলতে-জ্বলতে গেলো সে ইসপলকমে—গ্রাম্য সমিতির আফিসে। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সর্ববাদিসম্মত অবস্থায় আনড্রন সভাপতি হয়েছে ইসপলকমের, নির্বাচনের সময় আনড্রনের জন্যে ফিলিমনফও হাত তুলেছিলো। না তুলেই বা কি করে, আনড্রন বারোটা বড়ো-বড়ো শহর ঘুরে এসেছে।

'কী কাজ তোমার, কমরেড?' আনড্রন জিগগেস করলো।

'একটা বড্ড বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটেছে আমার আর আমার স্ত্রীর মধ্যে।'

'কী ঘটেছে?'

বললে ফিলিমনফ। আনড্রন সোভিয়েট আইনের কার্যবিধির বই খুলে বসলো।

'মেয়েদেরকে এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে, জোর করে তাকে তোমার সঙ্গে থাকতে রাজী করাতে পারবে না। তাকে মারতে পারবে না পর্যন্ত। মোটকথা, এত দিন যা ভেবেছ মেয়েদেরকে, আর তা তারা নয়। জোর করে কিছুই করানো যাবে না তাকে দিয়ে।'

'যদি আমি মোকদ্দমা করি?'

'কিচ্ছু লাভ হবে না। আমরা তোমার বিচার করবো, আর আমাদের আইন আমাদের।'

ফিলিমনফ তাকালো এক বার সেই আইনের বইর দিকে—প্রকাণ্ড বই

—নিশ্চয়ই তোমার সাধ্য নেই যে ওটাকে ডিঙিয়ে যাও। ইচ্ছে হলো সেই স্ত্রীলোকটার মাথার উপরে এটাকে আছড়ে ভাঙে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তার হাত বাঁধা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলো সে রাস্তায়—একেক পা-ফেলায় একেক মাইল। বাড়ি ছেড়ে, পালান ছেড়ে চলেছে তো চলেইছে, কোথায় তা কে জানে! গ্রাম পেরিয়ে এসে বসলো সে এতক্ষণে।

একটা যে চড়ুই, সেও তার বউকে ঠোকর মারে। মোরগ মুরগীকে। ফিলিমনফই বা মারবে না কেন? সব শয়তানের কাণ্ড। পুরুষই তৈরি হয়েছে প্রভু বলে। অন্য কোনো ধরন কি সম্ভব? ঘোড়াকে না মারলে চলে কখনো? স্ত্রীলোককে ঘুষা না দিলে সে কথা শুনবে তোমার?

হাত মুঠ করে চেঁচিয়ে উঠলো সে: 'খুন করবো সবাইকে। তারপর জেল হয় তো হবে।'

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়নার মন ভয়-ভয় করছে। যেন কি ক্রমেই এগিয়ে আসছে—ঝড়, দুর্ভাগ্য। পাকস্থলীর মাঝখানে সমস্ত দিন ধরে তার ব্যথা। চেষ্টা করে প্রার্থনা করতে, কিন্তু প্রার্থনার কোনো কথাই তার মনে আসছে না। আসছে যত সব মলিন কথা, প্রার্থনা নয়। ভাবলো একবার ক্ষেতের কথা—কপি কেটে শুকিয়ে গুছিয়ে রাখবার সময় এলো। ভাবছে বাছুরটার কথা—ওকে এখন খেতে দিতে হয়। যত সব বাজে নোংরা কথাই বারে-বারে তার মনে আসছে। সামনের কোণে সেণ্ট নিকলাইর দিকে তাকালো কিন্তু সেণ্টকে যেন আজ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না। হয় গ্র্যানির চোখে কিছু হয়েছে, নয় তো সেণ্ট গিয়েছে বদলে। সত্যি, আরেক রকম চেহারা।

ইচ্ছে করে গির্জেয় যায়, প্রার্থনা করে—কিন্তু ধর্মযাজক গিয়েছে চলে। আনড্রন যখন ছোট, ছুটোছুটি করবার মতো বয়স, তখন থেকে আছে সেই

যাজক—প্রায় বারো বছর। তারপর আনড্রন যখন বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখনো সে টি ঁকে আছে—আরো তিন বছর। আনড্রন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললে, 'চাই না আমরা ধর্মগুরু।'

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না উঠলো কেঁদে, বললে, 'না, ধর্মগুরু চাই বৈকি।'

'না, চাই না।'

সিয়েনিন আর মার্কোনিন, পটুঘিন আর মিহাইলা—সবাই চাইলো তাকে বিরত করতে, 'আমরা চাই তাকে।'

আনড্রন তেমনি একগুঁয়ে: 'না, কিছুতেই না।'

যাজককে তার বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিলো—কত লোক ফেললো কত চোখের জল। গ্রামের বুড়িরা কাঁদলো অঝোরে, বুড়োরা শুধু মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। 'ভালো হবে না এর।' লাগলো সবাই বলাবলি করতে।

চার দিকে শোকাকুল লোক, যাজক তৈরি করলো তার গাড়ি। ঘোড়া জুতলো, গাড়ির পিছনে ঝুলিয়ে দিলো কেটলিটা, গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলো তার স্ত্রী আর ছেলে-পিলে—চললো বেদের মতো।

'আপনারা যাঁরা গোঁড়া খ্রীস্টান, আপনারা যখন আমাকে চান না, আমাকে তখন চলে যেতে হয় এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছেন—আমার ছেলে-পিলে বউ আছে—আমাকে খেতে হবে তো।'

সেই থেকে গির্জের দরজায় তালা পড়েছে, বাজছে না আর ঘণ্টা। অলিন্দে বাছুরগুলি খাচ্ছে গড়াগড়ি, পায়রারা কূজন করছে ঘণ্টাঘরে। আর ঘণ্টার আওয়াজ নেই, তাই নিশ্চিন্তে চলেছে তাদের কূজন। কমিউনের তালা ঝুলছে এখন দরজায়—কারু সাধ্য নেই তা খুলে নেয়। গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না স্বপ্ন দেখতো যে সে খুলে নিচ্ছে ঐ তালা, গোপনে ঢুকছে সেই পবিত্র নিঃশব্দতায়। হাঁটু গেড়ে বসছে প্রার্থনায়, দুর্বহ পাপের বোঝা চেপে বসেছে তার বুকের উপর, ডাকছে ঈশ্বরকে: 'আমাদের ক্ষমা করো, ঠাকুর, আমরা, যারা তোমার থেকে দূরে সরে

আছি। আমরা, যারা পাপ করেছি তোমার সামনে, ভেঙেছি তোমার আইন। অনন্ত নরকে আমাদের নিক্ষেপ কোরো না, দগ্ধ কোরো না তোমার অভিশাপের অগ্নিশিখায়। হে ঠাকুর, আমাদের উপর রাখো তোমার স্বর্গের আশীর্বাদ।'

কিন্তু সেণ্টরা কেউই তাকায় না তার দিকে। তাদের মুখগুলো কালো, ভুরুগুলো কুঞ্চিত। তাদের ঘিরে উঠছে না আর সেই ধূপধুনোর গন্ধ। পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ, তাদের সামনে জ্বলছেও না আর একটা মোমবাতি। ডাকাতের মতো তাদেরকে আজ বন্দী করে রেখেছে তিন মাস।

'আমার এই বোকা অকেজো আনড্রনকে ক্ষমা করো, প্রভু। তার হাতেই তালা লাগিয়েছে, তার কণ্ঠস্বরই বিপথে নিয়ে গেছে ছেলেদেরকে। আর বুড়োরা হচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার মতো, তারা দশ গজ এক দিকে হাঁটে তো, বিশ গজ হাঁটে অন্য দিকে। এক চক্করে দশ গজ হাঁটাই তাদের দৌড়—তার বেশি নয়।'

আনড্রনকে গর্ভে বহন করেছিলো গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না, সেই ছিলো এক দুঃখ। অরেক দুঃখ, যখন তাকে সে কোলে নিয়ে ঘুরেছে। এখন সে নিজের পায়ে হাঁটে—এও আরেক দুঃখ তার। সেই দুঃখ বাড়ছে আকাটা ঘাসের মতো, না-হাঁটা পথের মতো ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কোন নদীর জলে ডোবোবে এই বেদনা? দুদিন ধরে সে কাঁদলো, কিন্তু ডোবাতে পারলো না। এক সপ্তাহ ধরে কাঁদলো, পারলো না ডোবাতে। প্রতি বিন্দু অশ্রুর সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে তার তীব্রতা। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় সে দুঃখকে, রাস্তার জনতার দিকে তাকিয়ে। সমস্ত জীবন অপরিমেয় বেদনায় বোঝাই করা।

'হে প্রভু, ক্ষমা করো আমার ছেলে, অকেজো আনড্রনকে।'

ইস্পালকমের আফিসে বসে আনড্রন হুকুমের উপর হুকুম জারি করছে।

'আগের যাজকের বাড়িতে স্টেজ খাটানো, নানান রকম নাটক হবে। ছুতোর কুজমা ভারমেয়েভ আর মিস্ত্রি টিহন বেলিয়াকফকে দলে আনতে হবে। প্রহর চেরেমুসকিনের থেকে আদায় করতে হবে পাঁচ-পাঁচটে ভারি তক্তা—কমিউনের কাজে।'

ছোট জিভে চেরেমুসকিন আপত্তি করে—বড়ো জিভটা অসাড় হয়ে গেছে। টিহন আর কুজমাও তাই, তাদেরও বড়ো জিভ আর বেরুতে পাচ্ছে না।

'তোমাদের আছে একজন পরিচালক।'

আপত্তি করে লাভ নেই—সমাজ তোমাকে প্রতিদ্রোহী বলবে।

ইসপলকমের সম্পাদক আরো এক আদেশ জারি করলো : লাল ফৌজের স্ত্রীদের সমস্ত জমি এক্ষুনি-এক্ষুনি চাষ করতে হবে, তৈরি করতে হবে শীতের বীজ বোনার জন্যে।

সমস্ত গ্রাম ছোট-ছোট জিভে ঘ্যান-ঘ্যান করে ওঠে।

'আছে তোমাদের শাসনকর্তা।'

কিছুই করা যায় না। টিহন আর কুজমা কুড়ুল দিয়ে কাঠ ফেড়ে যাজকের ঘরে খাড়া করে স্টেজ। যাজকের সেই পুরোনো ঘর ককিয়ে ওঠে, ককিয়ে ওঠে তক্তাগুলো, ভিতরের দেয়ালগুলো গুঁড়ো হয়ে যায়। পিছনের পায়ে বেকায়দায় চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে আটখানা তক্তা প্রহর এনে পৌঁছে দেয়—কমিউনের কাজের জন্যে। টুপির নিচে তার চোখ জ্বলতে থাকে, চেপে বসে থাকে তার দাঁতের সঙ্গে দাঁত।

কেউই কিছু করতে পারে না।

লাল ফৌজের স্ত্রীদের জমি চষতে হয় চাষাদের, শীতের বোনার জন্যে। বিস্ময়ে তারা বিরক্তির শব্দ করে।

'কী চমৎকার ব্যবস্থা!'

ব্যবস্থাটা তারা পছন্দ করে না কিন্তু তবু তাদের চষতে হয় জমি। কেউ

চায় না কেউ তাদের প্রতিদ্রোহী বলে।

পৃথিবী ঘুরছে এখন উলটো মোড়ে, সূর্য উঠছে পশ্চিমে। আনিউটকা পানফিলভা হাতে একটা লিখন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পার্ট মুখস্ত করছে :

'আ, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, ভলোডিয়া! এই অবস্থায় আমি পারছি না—পারছি না থাকতে···'

বাপ দেখছে মেয়ের ভুতুড়ে ভাবভঙ্গি। ধমক দিয়ে উঠলো : 'থাম বলছি।'

মেয়েটা দাঁত দেখিয়ে বললে বোকার মতো : 'আমাকে বকছ কেন বাবা?'

'তাকাতে পাচ্ছি না তোর দিকে।'

'পার্ট মুখস্ত করছি। এ বইয়ের আমি হচ্ছি নায়িকা।'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'আর কয়েকদিন ঘোরো না কমিউনিস্টদের সঙ্গে। খুব ভালো পার্ট দেবে অভিনয় করবার জন্যে।'

রাগে বাপ তার জুতো ঘসে বললে, 'যদি ছেলে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরিস, ধড় থেকে মাথাটা ছিঁড়ে ফেলবো বলে রাখছি।'

না, কিছুই নেই করবার।

ভানচা দেখলো লুকেরিয়া শব্দ না করে ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছে অনবরত।

'কি বলছ বিড়-বিড় করে?'

'পার্ট মুখস্ত করছি।'

দশ বছর ধরে জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো। কুড়ি বছর ধরে জীবন দাঁড়িয়ে ছিলো এক জায়গায়। ভেবেছিলো এমনি পঞ্চাশ বছর আরো দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু না, গেছে, বদলে গেছে। কবে যে গেছে কেউ

বলতে পারে না। এ বছর না আর-বছর? স্টোভ তেমনি জ্বলছে, ঘেউ-ঘেউ করছে তেমনি গাঁয়ের কুকুর—ঠিক সেই আগের মতো। কিন্তু এক চোখ বন্ধ করে আরেক চোখ দিয়ে দেখ, দেখবে কী সে জিনিস, কোথায় সে জিনিস, ঠিক তুমি কিছুতেই ধরতে-ছুঁতে পাবে না।

ইসপলকম আফিসে বসে ভাবছে আনড্রন, 'চাষারা নিজের ইচ্ছায় মেনে নেবে না। যেমন চাই তেমনি করতে হবে তবে। লিখতে হবে পরোয়ানা।'

প্রকাণ্ড দোয়াত তার সেক্রেটারির। আগের আমলে এক দোয়াত কালিতে এক বছর যেতো, এখন রোজই কিছু-কিছু ঢালতে হচ্ছে।

আনড্রনের নিজের দল আছে—এর চেয়ে ভালো দল আর সে কী ভাবতে পারে? কাঠের ঠ্যাংওয়ালা গ্রিসকা কপচিক—ভিক্ষুক। আসকা মাজলা—আরেক ভিক্ষুক। ফেডকা বাদলিয়া—সে তিন নম্বর। কিন্তু কিছুই আসে যায় না তাতে। আর সেই জন্যেই তো তাদেরকে সবাই কমিউনিস্ট বলে—কেননা কিছুই তাদের নেই। কিন্তু মিসকা পটুঘিন কি করে চিনলো তাদেরকে? যুবক সংঘে নাম লিখিয়ে সভ্য হয়েছে। আর সেই সংঘের পার্টি হচ্ছে প্রতি রাত্রে। আসছে যুবক, আসছে যুবতী—দলে-দলে। শুধু কুমারী নয়, বিবাহিতারাও, লুকিয়ে-লুকিয়ে।

রাত দশটা, ভানচা বাড়ি ফিরছে। দুধারের কুঁড়েঘরে ঘুমিয়ে আছে সবাই। চাষার জীবনে ঘুমিয়ে থাকবারই সময় এখন। শুধু সেই যাজকের ঘরে, তক্তা খাটিয়ে—যে-তক্তা চেরেমুসকিনের থেকে এনে কুজমাকে দিয়ে চৌরস করা হয়েছে—তার উপর যুবকসংঘের ছেলে-মেয়ে লাফালাফি করছে। মুখ বাড়িয়ে দেখলো ভানচা, ঐ ওখানে লুকেরিয়া, হাসছে, ফেটে পড়ছে হাসিতে।

'দেখ মাগীর কাণ্ড!'

এত রেগেছে খানিকটা সে থুতু ছিটোলো, লাথি মারলো মাটির উপর। 'আমাকে দিয়ে একটা কেলেংকারি কাণ্ড ঘটিও না বলছি। নিজেই জানো, আমি শান্ত নিরীহ লোক। যদি একবার ধৈর্য হারাই, তা হলে কিন্তু তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

অন্ধকারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে লুকেরিয়া হাসে। 'খুব বলেছ। গরুটা হারিয়ে গেছে, খুঁজতে বেরিয়েছিলাম—শেষে দেখলাম ওখানে আলো জ্বলছে।'

'গরু! শেষকালে যদি লালচুলো একটা বাছুর হয়—তোমাকে বলে রাখছি আগে থেকে—'

তবু লুকেরিয়া ধৈর্য হারায় না, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসে।

'আরো একটু যাবো ওখানে?'

ভানচা দাঁড়ায় তার পথ আটকে—তার সমস্ত হৃদয় মুখের কাছে এসে উপচে পড়ে। কী করবে এই স্ত্রী নিয়ে? যদি মারে, তবে চেঁচাবে।

আর কী তার মিনতি: 'আমার উপর রাগ কোরো না ইভান, তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই। যদি ভেতরে যেতে না বলো, যাবো না আমি।'

কথা আছে, মেয়েমানুষ হচ্ছে বেরালের মতো। এক থাবা দিয়ে আঁচড়ায় আরেক থাবা দিয়ে আদর করে। কোন কালে সে সত্য কথা বলেছে? পুরুষের উচিত তাকে প্রহার করা।

প্রহরভা ভুলে গেছে তার স্বামীর নাম। ক্ষেপে উঠেছে তার নবীন রক্ত—আর তাকে রোখা সম্ভব নয়। আনড্রনের কাছ থেকে সে যত রাজ্যের আজগুবি কথা শিখেছে: সংস্কৃতি, সমানাধিকার, আরো কত কী। যদি খালি কুমারী মেয়েরাই শুনতো ও-সব কথা, কিছু, এসে যেতো না, কিন্তু বিবাহিত মেয়েরাও শুনছে। শুধু যুবকেরা হলে কিছু হতো না,

বুড়োরা পর্যন্ত ডিঙিয়ে যাচ্ছে বেড়া। এরোফেইর কী চমৎকার স্ত্রী ছিলো! খাঁটি সোনা। কত দিন সে স্টোভের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে যতক্ষণ না তার স্ত্রী বলেছে তাকে একটা মিষ্টি কথা।

'ওঠো গো ওঠো, খাবার সময় হয়েছে।'

টেবিলের উপর ঢাকা ছড়িয়ে দিয়ে বলেছে আবার সেই স্নিগ্ধ সুরে: 'ওঠো, কপির ঝোল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

শান্ত জীবন ছিলো এরোফেইর। ভেবেছিলো মৃত্যু পর্যন্ত যাবে বোধহয় এমনি শান্তিতে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসছে সে, ঘরের চিমনি থেকে উঠছে তখন ধোঁয়া···

এরোফেই গর্ব করে বলতো নিজেকে, 'যে কোনো লোক আমার স্ত্রীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এক বাড়িতে। ঈশ্বর এমন স্ত্রীই যেন সবাইকে দেন।'

ফটকের কাছে এসে দেখে আনা জানলা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে যুবতী জাহারইয়া। কী ব্যাপার? নিরিবিলিতে অন্য সময় গল্প করবার কি তাদের সময় নেই? নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ব্যাপার, নইলে অমন জানলা দিয়ে মুখ বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। এরোফেই ভিতরে ঢোকে। জ্বলছে স্টোভ, আগুনের কাছেই কেটলিটা। পুড়ে যাচ্ছে কাঠ। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, নইলে কিছুই মানে হয় না এর।

'আনা, কী বাজে বকছ? আমার খবার কই?'

'দাঁড়াও। আমি ব্যস্ত এখন।'

আরো এক মিনিট কাটে।

'কাঠ যে পুড়ে যাচ্ছে। শুনছ?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আনা বলে, 'শোনো, ঘরে জল নেই। শিগগির, ছোটো, জল নিয়ে এসো।'

নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। এ ভাবে আর কোনো দিন তার সঙ্গে কথা কয়নি

তার স্ত্রী। সে গিয়ে জল নিয়ে এলো।

'মেঝেতে ঝাঁট পড়েনি আজ। একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে ঘরদোর সাফ করো, আমি ততক্ষণ আলুর খোসা ছাড়াই।'

'এতক্ষণ কী করছিলে তবে?'

'পাশুরকা জাহারইয়ার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সব ভুলে গেছলাম। মেয়েদের একটা সভা হচ্ছে, মেয়েদের বিভাগ সম্বন্ধে। আমাকে যেতে বলছে সেখানে। যাও এরোফেই, ঝাঁট দাও।'

এটাও বিশেষ কিছু নয়। কেননা স্ত্রী যখন অসুস্থ বা আসন্নপ্রসবা তখন স্বামীকে ধরতে হতে পারে ঝাঁটা। আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই, স্ত্রী যখন মেয়ে-বিভাগের সভায় যাবার জন্যে ব্যস্ত তখন কি ধুলোয়-ঝুলে ভূত সাজাটা স্বামীর কর্তব্য?

এরোফেইর চোখের নজর যেন ঠিক আসছে না। যেন কুয়াসা-কুয়াসা দেখছে, আনাকে, তার ঘর-বাড়িকে। বেঞ্চির উপর সে বসে, বেজায় গরম লাগে। সরে যায় অন্য জায়গায়, যেখানে আরো গরম। যেন অনাবশ্যক কিছু না ঘটে তাই সে শাসন রাখে নিজের উপর, বলে, 'আমাকে ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করবো কেন?'

'আমার রেগে ওঠবার আগে ওসব বন্ধ করো বলছি।'

আনা এবার বদলে গেলো চোখের পলকে। কোমরে দুই হাত রেখে মাথা বেঁকিয়ে সে বলে, 'শোনো এরোফেই, দুজনের জন্যে খাটবার মতো আমার শক্তি নেই। রাত্রে তোমাকে আদর করতে হবে, দিনে তদবির —চলবে না আর। আমি কী পাপ করেছি যে আমি একটুও বিশ্রাম পাবো না?'

এরোফেই শোনে আর তার বাঁ পা কাঁপে। যেন জ্বর হয়েছে এমনি ভাবে। এই তোমার মেয়েদের বিভাগ! একটা ইস্ক্রুপ আলগা হয়ে

আসে, আর সমস্ত যন্ত্র ভেঙে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে।...

পৃথিবী ঘুরছে বেমোড়ে, সূর্য উঠছে আকাশের উলটো দিক থেকে। বুড়ো সিয়েনিন মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু এমন জায়গা নেই যেখানে সে স্যাক্রামেণ্ট পেতে পারে। এভলাহা কনড্রাটিয়েভার ছেলে হয়েছে—কেউ নেই তাকে দীক্ষাভিষেক করে। চমৎকার ব্যবস্থা! পুরোনো আমলে তেরো-তোরোটি সন্তান সে প্রসব করেছে, কিন্তু কোনো দিন এমন বিপদে পড়েনি।

এভলাহার স্বামী, নিকানর, ঘরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারি করছে। সে শাপান্ত করছে লেনিনকে, আনড্রনকে, সমস্ত কমিউনকে। চাষাদের খরচে কী চমৎকার প্রহসন বানিয়েছে তারা!

তাকের উপর দেখতে পেলো একটা বড়ো বাটি। গোটা একটা শুয়োরের ছানা বেশ স্বচ্ছন্দে রাঁধা যায় তাতে।

পাশের গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসবে সে যাজককে? কত নেবে সে মজুরি? যেতে হবে গাড়ি হাঁকিয়ে, নিয়ে আসতে হবে তেমনি। না, সেই দীক্ষাভিষেক করবে তার নিজের ছেলের।

আগুন করলো, কিছু জল আনলো।

'কোনো ভাবনা নেই। আমি নাম রাখবো ওর ভানকা—বড়ো হয়ে হবে ও ইভান নিকানরিচ। একই কথা—যতক্ষণ না মরে সে বড়োই হয়ে চলবে শুধু।'

এভলাহা তাকালো বিস্ময়ে, বিছানা থেকে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি।'

'কেন, আমিই দীক্ষিত করবো ছেলেকে।'

'বাজে বোকা না। বাচ্চাটাকে বোকা বনতে দেবো না তোমার হাতে। তার চেয়ে থাক ও অদীক্ষিত।'

চেঁচিয়ে নিকানর তাকে শাপান্ত করে। 'বুঝলে, এবার থেকে ছেলে

হওয়া বন্ধ করো। আমাকে কি একশো বছর পর্যন্ত ভুগতে হবে? তুমি কি ভাবো পাশের গ্রামে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়াটা মুখের কথা?'

'আমার একার জন্যে ছেলে হয়? তুমি প্রত্যেক রাতে আমাকে জ্বালাতন করো না?'

'চুপ করো বলছি।'

'তোমার তো খুব সোজা কাজ, কেবল নিজের কথাই ভাবছ।'

নিকানর মুখ ভেঙচালো: 'আমাকে রাগিয়ো না এভলাহা। একেই তো আমি রগ-চটা লোক। আমার যখন রাগ হবে, তখন তুমি চুপ করে থেকো।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এই তিরিশ বছর আমি চুপ করে আছি।'

রগ-চটা এই নিকানর। এভলাহার বিছানার কাছে এসে বিস্ময়ে সে থেমে পড়ে। যদি তাকে সে বেজায়গায় মারে তবে নিশ্চয়ই জখম হবে তার—সে হবে আরেক বিপদ। ঘোড়া হাঁকিয়ে ছোটো হাসপাতাল—আবার ফেরো। তবু ওরা বলে—স্বাধীনতা! মেয়েদেরকে কি করে দেওয়া যায় স্বাধীনতা?

কাঠের কুঁদোর মতো সিয়েনিন শুয়ে আছে বিছানায়। চোখ বুজে শুধু অন্ধকার দেখে—চোখ খুলেও সেই অন্ধকার। তিনি মাস ধরে কেউ শোনেনি গির্জার ঘণ্টা। কেউ নেই তার কাঁধ থেকে পাপের বোঝা নামিয়ে দেবার, যে পাপ তার বুকের উপর চেপে বসে আছে। সজল চোখে বলছে সে সবাইকে, পাশের গাঁ থেকে যাজককে নিয়ে এসো, কিন্তু কেউ যাবে না।‍এই এখানকার ব্যবস্থা—বুড়ো আর রুগ্নরা পড়ে আছে নিজের হেপাজতে।

হে ঈশ্বর, দুর্বলকে দয়া করো। বুড়ো সিয়েনিন তোমার কাছে কোনোই অপরাধ করেনি। নিজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ পৃথিবী চলেছে উলটো মুখে।

কোন সুদূর শহরে জন্মেছে কী কমিউন, ছড়িয়েছে আর-আর শহরে, গাঁয়ে, খোরদা গাঁয়ে, জঙ্গলে, পর্বতে, মাঠে, রোগাচেভো গ্রামে পর্যন্ত গেছে, ডুবিয়ে দিয়েছে সমস্ত-কিছু, সকলের মাঝে এনেছে বিপর্যয়। চেঁচাচ্ছে বাপ, ছেলে, স্বামী, স্ত্রী। মরণাপন্ন বুড়োর দুর্বল কণ্ঠ কে শোনে?

কাঠের কুঁদোর মতো সিয়েনিন শুয়ে থাকে তার বিছানায় আর কর্তব্যের খাতিরে তার পাপ বিবৃত করে। হে ঈশ্বর, অনেক পাপ, স্বেচ্ছায় আর অনিচ্ছায়, কখনো কথায় কখনো কাজে, জ্ঞানে আর অজ্ঞানে। সমস্ত ঈশ্বরের কাছে উন্মুক্ত করে ধরে। দুটো বুড়ো খারাপ ঘোড়া বেচেছিলো একবার, কিন্তু খদ্দেরদের জানায়নি খারাপ বলে। একবার মেরেছিলো একটা কাহিল গরু, কিন্তু বলেনি খদ্দেরদের। কোনো শয়তান তাকে বশ করেছিলো। গির্জের টাকার বাক্সে সে রেখেছিলো একটা জাল-নোট। পড়েছিলো আরেক কোন শয়তানের পাল্লায়। অচেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দু-দুবার সে শুয়েছে। সেটা বেশি দিনের ঘটনা নয়—এই কমিউনেরই আমলে—হে ঈশ্বর!

সবাই বলছে তার আশে-পাশে, 'এ পাপ নয়।'

তার নিজের স্ত্রী মরে গেছে অনেক দিন। কেন কে জানে তার রক্ত উঠেছিলো উত্তেজিত হয়ে। শয়তান তার এক কান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গিয়েছিলো অন্য কান দিয়ে।

'এ পাপ নয় একেবারে।'

ভগবান, পাতকীকে পাঠিয়ো না অনন্ত যন্ত্রণায়। নিজের ইচ্ছায় সে পাপ করেনি, শয়তানই তাকে সারা জীবন প্রলুব্ধ বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

কাঠের কুঁদোর মতো সিয়েনিন পড়ে থাকে বিছানায়, বাঁ চোখ বোজা, ডান চোখে এক বিন্দু জল। চেষ্টা করেও খুলতে পারে না বাঁ চোখ। হাত তুলতে চায়, পারে না। তার বিছানার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্বেত কপোত—ভুল কি, ঈশ্বরের দূত, স্বর্গ থেকে পাঠিয়েছেন। কোণে দাঁড়িয়ে

আছে হিংস্র দৈত্য ; মাথায় ছাগলের শিঙ, জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখ। খুরের শব্দ করছে, তার কুকুরের লেজ নেড়ে চাইছে সে তাড়িয়ে দিতে পাখিটাকে।

শ্বেত কপোত পাখসাট দিচ্ছে আর সহজেই নিশ্বাস নিতে পারছে সিয়েনিন। দৈত্যের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে নরকের আগুন। দম বন্ধ হয়ে আসছে সিয়েনিনের। নম্রস্বরে বলছে সেই শ্বেত কপোত :

'আত্মা আমার।'

তীব্র স্বরে বলছে সেই দৈত্য :

'আত্মা আমার !'

খোঁড়া-লাঠি হাতে নিয়ে আসে এক বুড়ি। সিয়েনিনের হাতে মারে, হাত অসাড়। পায়ে মারে—পা অসাড়। মারে বাঁ দিকে—বিদায় মা, পৃথিবী। সমস্ত গির্জায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। চার পাশে গজিয়ে ওঠে বড়ো-বড়ো পাহাড়, গহন অরণ্য। তার ঘরের দরজায় লোকের করাঘাত আর সিয়েনিন শুনছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে দৈত্যের দৃষ্টির দীপ্তি।

'এ আমার আত্মা !'

কিন্তু কপোত সেই পাপলিপ্ত আত্মা এসে স্পর্শ করলো আর সেই আত্মা হয়ে গেলো শাদা এককণা তুষার, যে তুষারকণা শ্বেত কপোতের পাখা থেকে ঝরে-ঝরে পড়ে। বুড়ো সিয়েনিনের মুখে অসহ্য আনন্দ, আর সেই হাসি লেগে থাকে সেই মৃত ঠোঁটে।

গান গাইছে অনূঢ়া আর বিবাহিতারা—কেউ জানে না দুঃখের কী নাম, দুঃখের কী চেহারা। হয় তারা শুধু আনন্দময় জিনিসই দেখছে, নয় তো এমন কোনোই দুঃখ নেই, যা ওদেরকে থামাতে পারে গানের থেকে।

মাক্সিম ইভানিচ চল্লিশ বুশেল শস্য দিলো ইসপলকমের আদেশ অনুসারে আর ভাবলো রোগাচেভো এবার তার প্রভুসহ মারা পড়বে।

কিন্তু কিছুই হলো না।

ইসপলকমের আদেশ অনুযায়ী ট্রিফন সামইলিচ দিলো পঞ্চাশ বুশেল, ভাবলো প্রভুসহ রোগাচেভো গ্রাম রসাতলে যাবে।

কিন্তু কিছুই হলো না।

লিকিয়ান লুকিয়ানিচকে তারা নিয়ে গেলো বাধ্যতামূলক কুলিগিরির কয়েদখানায়, আর ভাবলো সূর্য নিবে যাবে এবার। কিন্তু সূর্য উঠলো ঠিক আগের মতো, বইলো আগের মতোই হাওয়া। নামলো বৃষ্টি, আকাশে তেমনি তারার চাকচিক্য, প্রহরীর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো নিশাচর চাঁদ, মাঠের দিকে বনের দিকে, কাছের গ্রাম ও দূরের গ্রামের দিকে চেয়ে-চেয়ে। নিজের জায়গা থেকে নড়েনি কিছুই। মেয়েরা রাত্রে বাড়ি আসে না, বিবাহিতারা বাইরে-বাইরে থাকে। অচেনা স্ত্রী অচেনা স্বামীর গা ঘেঁষে থাকে আর অচেনা স্বামী অচেনা স্ত্রীকে নিজের কোটের নিচে রেখে রাত কাটায়—যতক্ষণ না মোরগ ডেকে ওঠে। নিজের বাগানের আপেলটি সুন্দর, অন্যের বাগানেরটা আরো সুন্দর। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে পায়ে-পায়ে মাড়িয়ে গেছে, মাঠ ভরে গজিয়েছে এমন অনেক সরু রাস্তা। হেলান দিয়ে বসে গেছে, তার ছাপ লেগে আছে কঞ্চির বেড়াতে। দুজনের হেলান বেড়ার গায়ে, একজনের পিঠের চাপ ছাপ ফেলেছে দলিত ঘাসের উপর। একটি কিশোরীর দাগ, একটি যুবতীর, একটি যুবকের।

কিছুই করবার নেই।

মস্কৌ শহর, কাজান শহর, সামারা শহর। আর রোগাচেভো গ্রাম, হুডয়ারোভোও গ্রাম। গুজব উঠেছে মস্কৌর লোকেরা অসন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট কাজানের লোকেরা। রোগাচেভো তো হিংস্রতার জ্বলন্ত কটাহ।

হুঁসিয়ার আনড্রনের কমিউন!

শত-শত দাঁতে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবো আমরা। শত-শত হাতে থেঁতো

করে দেবো তোমাকে।

আর তাই যথেষ্ট হবে মনে কোরো না।

শত-শত পায়ে তোমাকে পিষে চ্যাপটা করে দেবো।

তাতেও খুশি হব না আমরা।

তোমাকে বেঁধে জীবন্ত পোড়াবো। ঘোড়ার লেজের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে ছুটিয়ে দেবো ঘোড়া। টেনে নিয়ে যাবে তোমাকে মাঠের উপর দিয়ে, পাহাড় আর গুহার উপর দিয়ে, রক্তলিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

নজর রেখো, আনড্রনের কমিউন!

তোমার সমস্ত অকীর্তি মনে রাখবে সবাই। চেরেমুসকিনের থেকে ছ-ছটা তক্তা নিয়ে গেছ তোমার কমিউনের কাজে, ইসপলকম থেকে ছাড়িয়ে আনা চাই নব্বুই বুশেল শস্য। ঘটা করে বাজবে আবার বড়ো ঘণ্টা, বাজবে ছোটগুলোও। শব্দের ভয়ে পালিয়ে যাবে পায়রা, চড়ুইগুলি ছিটকে পড়বে চার দিকে। গির্জার দরজা থেকে আনড্রনের তালা খসে পড়বে, ছুটে যাবে তার মুখ। কালামুখো সেণ্টরা উল্লাস করবে। যাজক পরবে আবার তার ইস্টারের জামা। জ্বলন্ত ধুনুচি তুলে ধরে সে বলবে তার পুনর্জীবিত কণ্ঠে—

'চিরকালের জন্যে, অনন্ত কালের জন্যে।'

'তথাস্তু।' সমস্ত রোগাচেভো এক কণ্ঠে ঘোষিত হবে।

যেমনটি যা ছিলো, তাই হবে সব। আগের মতো।

যাজকের ঘর থেকে রঙ্গমঞ্চ তুলে আনা হবে, লোকসানী তক্তাগুলো ফিরিয়ে দেয়া হবে চেরমুসকিনকে, আর সবাই অতীত সম্বন্ধে এই ভাবে আলোচনা করবে: 'সেটা না জানি কোন সাল?'

রোগাচেভো গ্রামে জ্বলছে সেই তপ্ত কটাহ। কাস্তে আর কুড়োলে শান দেয়া হচ্ছে, আনড্রনের কমিউনের বিরুদ্ধে চাষারা যুদ্ধ করবে বলে তৈরি হচ্ছে।

নিপাত যাক ওটা!

কিন্তু অনূঢ়া আর বিবাহিত মেয়েরা কমিউনের জন্যে লাল নিশান সেলাই করছে।

কিছুই তুমি বুঝতে পারবে না।

ইসপলকমের লোকেরা শহর থেকে সাটিনের টুকরো নিয়ে এসেছে। প্রধান দর্জি হচ্ছে আনমুসকা প্রহরভা। যাকে ঠেলে দিয়েছে এক কোণে, টেবিলের উপর বসিয়েছে এনে সেলাইয়ের কল, টেবিল-ঢাকনির মতো ছড়িয়েছে সেই সাটিনের কাপড়টা। ডাকলো সে মেয়েদের, বিবাহিতাদের কানে-কানে বললো কী জানি ফিসফিসিয়ে। যেন কার বিয়ের জন্যে তারা তৈরি হচ্ছে, তাদের নিন্দিত কমিউনের আজ বিয়ে। ঘটঘটিয়ে চললো সেলাইয়ের কল, খসখসিয়ে কাঁচি, আর মেয়েরা নীল রেশম দিয়ে বুনে চললো লাল বনাতের উপর ঃ

"সকল দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীর দল···"

একটি মেয়ে আসে, একটি বেরিয়ে যায়···কোন ছুটির পরব আজ? আছে আসকা মাজলা। আর ফেডকা বাদলিয়া, কেঠো পায়ে গ্রিসকা কপচিক—আনড্রনের প্রধান উপদেষ্টা। ডান হাতে লাঠি ধরা আর বাঁ-হাতে গোঁফে তা দিচ্ছে। সতেজ, প্রফুল্ল। তারও সাধ মেয়েরা তাকে পছন্দ করুক। তাই সে বাঁ পকেটে চিরুনি নিয়ে ঘোরে, তাই তার চুল এমন পাট করা। আসল মানুষ হচ্ছে মাথায়, পায়ে নয়, কোনো দরকারই নেই তার পায়ের দিকে তাকানোর। ঠিকই ছিলো পা, কিন্তু যখন সে গরিবদের জন্যে লড়ছে তখন বুর্জোয়াদের একটা গোলা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেলো একখানা। সোভিয়েট কারখানা তাকে কাঠের পা তৈরি করে দিয়েছে, দিয়েছে কালো রঙ লাগিয়ে, তার গোড়ায় লাগিয়ে দিয়েছে লোহার খুর, মজবুত করবার জন্যে।

কী আসে যায় তাতে?

আসল মানুষ হচ্ছে তার মাথায়!
মেয়েরা লাল বনাতের উপর সুঁইয়ের ফোঁড় দিচ্ছে আর গাইছে :

'আর আমাদের মুখ করিসনে মা,
আমরা এবার স্বাধীন হয়েছি ;
ইচ্ছে হলেই উঠে দাঁড়াই রুখে
ইচ্ছে হলেই শুয়ে পড়েছি।
কাটাবো রাত ইভানেরি সাথে,
তার যদি ফের ফুলে ওঠে মাথা,
চলে যাবো আরেক জনের হাতে,
আরেক ঘরে শয্যা আমার পাতা।'

চমৎকার ব্যবস্থা।

ভানচা লুকেরিয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথায় লুকেরিয়া! নিকানর খুঁজে বেড়াচ্ছে এভলাহাকে, কোথায় এভলাহা! এরোফেই জিগগেস করছে ঘরে ঘরে :
'দেখেছ আমার গিন্নিকে?'
খরগোসের পায়ের চিহ্ন ধরে চলেছে তিন শিকারী গ্রামের পথ ধরে। মাথায় তাদের ঘুরছে কেবল চাকার পরে চাকা। এক চাকা ঘুরছে—মনে হচ্ছে ভূতের কমিউন গুঁড়ো করে দেয়। আরেক চাকা ঘুরচে—মনে হচ্ছে কাউকে পায়ের চাপে পিষে মেরে ফেলে পোকার মতো। এই ভাবে বাঁচতে পারে তারা? একে ইসপলকম তার অদ্ভুত সব হুকুম জারি করে তাদের নির্যাতন করছে, তার উপর তাদের বউগুলো গিয়েছে বিগড়ে। ওদিকে শস্য আর পশমের আকারে খাজনা আদায় হচ্ছে, আর এদিকে বাড়ি-ঘর সব বেহাল, বিশৃংখল। দোরের গোড়ায় পড়ে আছে ঝাঁটাটা—কেউ রাখছে না সরিয়ে। বালতিটা খালি—কেউ জল ভরে

রাখছে না। পুরুষের জুতোর তলাকার কাদা কেউ আর ফেলে দিচ্ছে না বুরুশ করে।

এ-সব বেয়াদবির জন্যে ইচ্ছে করে না স্ত্রীকে মারতে?

অথচ ঐ তিন স্ত্রী, তিনটে ছুঁড়ির মতো আনমুসকা প্রহরভার সঙ্গে ওঠবোস করছে। যেন তাদের ছেলে-মেয়ে নেই, স্বামী ছিলো না কোনো কালে। ভুলে গেছে তাদের বাড়ি-ঘর, গরু-বাছুর, তাদের এত দিনের গৃহস্থালী।

কিন্তু আসল বিপদ তা নয়।

আসল বিপদ হচ্ছে তারা এমন ভাবে চলাফেরা করছে যেন সত্যি-সত্যিই তাদের স্বামী নেই। তারা আলোচনা করছে আনড্রনের বিষয়ে, গ্রিসকা কপচিকের সম্বন্ধে, আলোচনা করছে নীলে বুটি-তোলা লাল নিশানের কথা। নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের কথা কিছুই বলছে না। আনড্রন খুব ভালো লোক, গ্রিসকাও খুব ভালো, ভালো এমন কি লাল সাটিনের জমি, শুধু ভালো নয়, কিছুই নয়, তাদের স্বামীরা।

ভানচা সম্বন্ধে এমন পর্যন্ত বললে লুকেরিয়া:

'ও যা তার বেশি হবার আর ওর ক্ষমতা নেই, ঈশ্বর ওকে ক্ষমা করুন।'

আর নিকানর সম্বন্ধে এভলাহা বললে আরো খারাপ কথা: 'অসভ্যটা রোজ রাত্রে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে—ঘুমুতে দেবে না। আমি আরেক রকম হতে পারতুম যদি আর কারু সঙ্গে আমার বিয়ে হতো।'

ওরা হাসে আর ঠাট্টা করে।

'আমাদের ধর্মঘট করা উচিত।'

ইসপলকম আফিসে বসে আনড্রন হুকুমের উপর হুকুম জারি করছে। সমস্ত ঘর বিজ্ঞাপন-পত্রে আঁটা: থুতু ফেলা নিষেধ, ধূমপান করা নিষেধ, শাপ দেওয়া নিষেধ। জমি সম্বন্ধে, খাদ্য সম্বন্ধে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে।

যানবাহনের ট্যাক্স, খাদ্যের ট্যাক্স। জেলার, সমগ্র দেশের, খাদ্যপুষ্টিসংক্রান্ত বিভাগের আইনকানুন। আর সব-কিছু তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে, এক্ষুনি-এক্ষুনি। লেনিনের দস্তখত, কালিনিনের দস্তখত, আর আনড্রনের দস্তখত, সঙ্গে একটা লম্বা লেজুড়ে টান। শুধু লেনিন বা আনড্রনের দস্তখতে কেউ কিছু বলতো না, কিন্তু আনন্নুসকার সই রয়েছে নিচে। ভাবো একবার, আনন্নুসকা প্রহরভার সই। মেয়েদের বিভাগের সে হচ্ছে সভাপতি। আনড্রনের টেবিলের উপর নিশান, তেমনি আনন্নুসকার টেবিলের উপর, দুটো নিশানেই সোনালি থোপনা ঝুলছে। আনড্রনের টেবিলের উপর লেখা: 'সকল দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীর দল…'আনন্নুসকার টেবিলের উপরে: 'কমরেড, মেয়েরা…'

সামনের কোণে সেণ্ট নিকোলাই পঞ্চাশ বছর ধরে ঝুলছে। আনড্রন বললে, 'নিয়ে যাও ওটাকে। অন্ধকারাচ্ছন্ন জনগণের কুসংস্কার।'

কে কী করতে পারে!

রোগাচেভোর মিস্ত্রী টিহন বেলিয়াকফকে হুকুম দেওয়া হয়েছে: 'এক্ষুনি কাঠের ফ্রেম করে লাল রঙ লাগাও।'

নিকোলাইর জায়গায় আনড্রন রাখলো কার্ল মার্ক্স আর তার দুদিকে আর দুজনের ছবি। লেনিন আর ট্রটস্কি। মেয়েদের বিভাগে আনন্নুসকার হুকুমে মেয়েরা পাইনের পাতায় লাল সিল্কের ফিতে বেঁধে বানালো তিনটে মালা, পরিয়ে দিলো লেনিন, ট্রটস্কি আর মার্ক্সের ছবিতে।

বুড়ো পটুঘিন দোমনা করছিলো অনেক দিন থেকে। শেষে ঠিক করলো গিয়ে দেখে আসবে এক দিন। এলো সে ইসপলকম আফিসে—দেখলো, সবই সত্যি। কোণে একটা বুড়োর ছবি, যাজকদের মতো লম্বা চুল। তার দুদিকে আরো দুজন। একজনের চোখ অর্ধেক বোজা, আরেকজনের চশমা আর ছাগল-দাড়ি, চাষার মতোই মোটে নয়। পটুঘিন আরো দেখলো, পাইনের মালা, লাল সিল্কের ফিতে আর

সোনালি ঝোপ্পা-ঝোলানো নিশান। ছবিগুলির সামনে মোমবাতিই শুধু জ্বলছে না।

বিষণ্ণের মতো তাকিয়ে রইলো পটুঘিন। পরে থুতু ফেলে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় মিহাইলার সঙ্গে দেখা।

'গিয়েছিলাম তোমার ছেলের ভজনালয়ে। বেড়ে করেছে যা হোক—নতুন-নতুন সেণ্ট তৈরি করেছে। এর চেয়ে ভালো আর কী করা যায় বলো!'

অপরাধী স্কুলের ছাত্রের মতো মিহাইলা বললে, 'আমার কোনোই হাত নেই। তুমি তো জানো, আমি হচ্ছি নখের নিচে পোকা।'

তবে এতে কার হাত, কার ইচ্ছা? মিহাইলার হাত নয়, পটুঘিনের নয়, সমস্ত রোগাচেভো গ্রাম বলছে, 'আমাদের এতে মত নেই।' তবে কার মত?

গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না চেষ্টা করলো তার মাতৃত্বের শাসন চালাতে, যদি তার অকেজো ছেলে আনড্রনকে আনা যায় ফিরিয়ে। হেসে আনড্রন বললে, 'কিচ্ছু ভেবো না, মা। বুড়োদের বুঝতে অনেক দেরি হয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর তোমাকে আমি কোনো দিন কষ্ট দেবো না, কিন্তু আমি যা চাই তাই আমাকে করতে দাও।'

'কিন্তু তুই যা করছিস কেউই তা চায় না। সমস্ত লোক অসন্তুষ্ট···'

'তারা কিছুই বোঝে না, তাই তারা অসন্তুষ্ট···'

'তবে তুই কী? তুই খুব পণ্ডিত?' মিহাইলা চেঁচিয়ে উঠলো।

আনড্রনের ইচ্ছা করে না উত্তর দেয়। বললে, 'তুমি লিখতে-পড়তে জানো না, বাবা।'

ক'দিন ধরে মিহাইলা দাঁতে দাঁত এঁটে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে চুপ-চাপ। যখন বুকটা ঠেলে উঠছে রাগে তখন উঠে দাঁড়িয়ে চার দিকে তাকাচ্ছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। এক মুহূর্তের জন্যে পাথর ব'নে গেলো সে:

ঈশ্বরের মার ছবির পাশে কার্ল মার্ক্সের ছবি। এ আনড্রনের কাজ, যেখানে-সেখানে সে রাখবে তার নতুন দেবতাদের ছবি। সমস্ত বিদেশী ভূতের ছবি দিয়ে ঘর-বাড়ি সে আষ্টে-পৃষ্টে এঁটে দেবে আগাগোড়া।
কিন্তু যাই বলো, একলা কার্ল মার্ক্সের দোষ নয়।
মিহাইলা তাকাতে পাচ্ছে না চোখ তুলে।
একটা সেলাইয়ের স্ঁচ নিয়ে খুঁটতে স্থরু করলো সে সেই বুড়োর চোখ। শেষ করতেই হবে তাকে আজ, উপায় নেই, খুঁটে-খুঁটে সমস্ত বাড়ি-ঘর তার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে।
'শয়তানের দল! তোমরা এখন আমাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে এসেছ!'
গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না তার জামার আস্তিন ধরে টান মারলো, কান্নাচাপা গলায় বললে, 'পাপ কোরো না অমন, দোহাই তোমার, ক্রাইস্টের দোহাই।'
মিহাইলার ইচ্ছে হলো গ্র্যানির চোখ দুটো ঠুকরে উপড়ে ফেলে। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'
'ক্রাইস্টের দোহাই। পাপ কোরো না অমন।'
মিহাইলা ওঁচালো তার বাঁ হাত আর গ্র্যানি মেঝের উপর পড়লো হুমড়ি খেয়ে। মাথাটা তার ঠুকে গেলো বেঞ্চির গায়ে, হাত ছড়িয়ে পড়ে রইলো সে মেঝের উপর, মুরগির মতো। গাল বেয়ে সূক্ষ্মধারে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে, সস্নেহ মুখের কোণে ছোট একটি কুঞ্চিত রেখার কাছটায় জমে উঠেছে লাল হয়ে। মিহাইলা তাকালো গ্র্যানির দিকে—উঠছে না গ্র্যানি। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলো যদি সে উঠে তাকে গালাগাল দিতো, শাপশাপান্ত করতো, জর্জরিত করতো অপমানে, যদি বলতো, 'নির্লজ্জ কোথাকার।' কিন্তু, এ কি···ও যে একটা অস্ফুট আর্তনাদও করছে না।
মিহাইলা ভয় পেয়ে গেলো।

কাঁপতে লাগলো তার হাত-পা, বুঝতে পাচ্ছে না কী করবে। দেয়ালে চোখ-উপড়ে-ফেলা কার্ল, মেঝেতে গ্র্যানি ম্যাট্রিয়না, তার সস্নেহ মুখের কোণে রক্তের ক্ষীণ ধারা! মেঝেতে বসে পড়ে মিহাইলা গ্র্যানির জামার হাতা ধরে টেনে-টেনে শান্ত স্বরে ডাকতে লাগলো: 'এই বুড়ি! ম্যাট্রিয়না! কী হলো তোমার হঠাৎ?'

মনে হলো গ্র্যানিকে সে খুনই করে ফেলেছে বুঝি, কিন্তু না, তার ভয় দেখে ঈশ্বর তাকে দয়া করেছে। গ্র্যানি নিশ্বাস নিচ্ছে। তার গলা শুনে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলছে ঝাঁজালো গলায়: 'নির্লজ্জ কোথাকার।'

মিহাইলা আরাম পেলো অনেক।

গ্রামের রাস্তায় গুজব ছড়িয়ে পড়ছে: কসাকদের দেশে হয়েছে বিপ্লব, বিপ্লব ঘটেছে সাইবেরিয়ায়। অসংখ্যেয় সৈন্য নিয়ে চলেছেন সেনাপতিরা, গ্রামের লোকদের বন্ধনদশা দূর করবার জন্যে। কমিউন তাদের থেকে যে শস্য নিয়ে গেছে তা ফের ফিরিয়ে দেবে তাদেরকে। ফিরিয়ে দেবে তাদের ঘোড়া। সব কিছু। কসাকদের দেশে যে সেনাপতি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে, সে বলেছে স্পষ্টভাবে:

'কোনো চিন্তা নেই। যদি তোমরা আমাকে সাহায্য করো, আমি চোখের পলকে শেষ করে দেবো ওদেরকে। ওসব খাদ্যপুষ্টির বিভাগের মুখে আগুন! ছাই হয়ে যাবে সমস্ত বলশেভিক ছবি।'

আর যে সেনাপতি জেগেছে সাইবেরিয়ায় সে বলেছে আরো স্পষ্ট করে:

'আমরা শস্যের জন্যে দাম বেঁধে দেবো, যইর জন্যে। দাম না দিয়ে যে নেমে তার জন্যে চার মাসের জেল।'

আজ পাঁচ দিন ধরে স্টোভের উপর পটুঘিন শুয়ে, তার পিঠে বিচ্ছিরি একটা ব্যথা। সেনাপতিদের কথা তার কানে যেতেই ব্যথাটা অনেক

কম মনে হলো। দাঁড়ি আঁচড়িয়ে বেরিয়ে এলো সে রাস্তার উপর, যেন আজ ছুটির দিন।

সত্যিই, কমিউনের দেবতাদের শেষে আগুনে পুড়তে হবে?

ট্রিফন সামইলিচ বললে ফিসফিসিয়ে: 'এবার দেখাবে ওদের।'

ফিসফিসিয়ে বললে মাক্সিম ইভানিচ: 'মেরে জান নিকলে দেবে এবার।'

আটটা অটুট পাপের মতো আটখানা তক্তার ভার মনে-মনে বহন করছে প্রহর চেরেমুসকিন। তারা তাকে বিশ্রাম দিচ্ছে না, বারে-বারে ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে, খাবার সামনে থেকে টেনে সরিয়ে রাখছে। রাত্রে কিসের খোঁচা খেয়ে প্রহর লাফিয়ে উঠছে বিছানা থেকে, সামনেই সেই সেনাপতিরা—ছবির মতো স্পষ্ট, সঙ্গে তাদের কেরানি, কলম আর কাগজ হাতে নিয়ে।

'তুমিই চেরেমুসকিন?'

'হাঁ, হুজুর।'

'তোমার আটটা ভারি তক্তা ওরা নিয়ে গেছে?'

'নিয়ে গেছে।'

'সই করো এখানে।'

সে প্রায় মরে যাচ্ছে সেই আট-আটটে তক্তার ভারে। সুখ নেই, শান্তি নেই, ভুলে গেছে সে তার বাড়ি-ঘর, তার কাজ-কর্ম। ঘরে-ঘরে গিয়ে বলছে সে ফিসফিসিয়ে: 'বারো হাজার কসাক···সহজ কিস্তিতে জমি বিক্রি···যারা দলের বাইরেকার লোক তাদেরই বেশি সুবিধে···'

আনড্রন বসে আছে ইসপলকম আফিসে, পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ। ভুরু কুঁচকোনো, ঘাড়টায় টান ধরেছে। সে চোখের সামনে চাষাদের দেখছে না, জটিল দাড়িওলা সব চাষা, সে দেখছে তাদের

একত্রীকৃত অন্ধকার জীবনের ছবি। আনন্থসকার ঠোঁট দুটিও চাপা—সেও ভাবছে। কাঠের পা-ওলা গ্রিসকা কপচিক বলছে আনড্রনকে, 'চাষারা সব সেনাপতিদের জন্যে বসে আছে। তোমাকে ওরা পিষে ফেলতে চায়। কী উপায় করা যায় বলো।'

আনড্রন কথা কয় না। শুধু ফুলে ওঠে তার নাক, যেন সে উঠে আসছে কোনো উঁচু পাহাড়ের গা ধরে। তার লাল কলমের নিবটা সে ভেঙে ফেললো, আধখানা করে ভেঙে ফেললো কলমটা, ছুঁড়ে মারলো টেবিলের নিচে : 'কী বোকা সব!'

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকালো সে একবার পরিচিত পথের দিকে। ছেলে কোলে নিয়ে চলেছে কে এক মেয়ে, গেটের নিচে মাথা ঠুকছে একটা শুয়োরের ছানা। খড়ে-ছাওয়া চালের ভারে কুঁড়েঘরগুলি ঝুঁকে রয়েছে। পাঁক, গোবর, দারিদ্র্য। সমস্ত জীবন এই পাঁকে, গোবরে আর দারিদ্র্যে পঙ্কিল। বাধা দিচ্ছে বাবা, বাধা দিচ্ছে মা, প্রত্যেক ঘরের চার দিকের দেয়াল দিয়ে এঁটে ধরে রেখেছে চাষাড়ে বিদ্বেষ। ওদের কথা ভেবে দুঃখিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও উচিত নয় দুঃখিত হওয়া। এগিয়ে যেতে হবে আজ—বাপের বিরুদ্ধে, বন্ধুর বিরুদ্ধে, কমরেডের বিরুদ্ধে। এই জীবনের বিরুদ্ধে! মাথার মধ্যে চিন্তার ফিনকি দিচ্ছে আনড্রনের, কপালের দুই পাশের রগ ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়।

'কী বোকা সব!'

গ্রিসকা কপচিকের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জ্বলে উঠলো : 'আমি পিষে ফেলবো ওদের যদি আমাকে ওরা বাধা দিতে আসে। ছিঁড়ে নিয়ে যাবো ওদের মাথা, কোনো দয়া করবো না ওদেরকে। আমি জানি কী করছি। হ্যাঁ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।'…

তাই এবার যুদ্ধ তোমাদের জন্যে!

পটুঘিন ফের বসছে গিয়ে তার স্টোভের উপর—দুর্বল লাগছে। তার দুই পাশে দুই সেনাপতি দেখছে সে। তার দুই পাশে দুই সেনাপতি দাঁড়িয়ে বলছে তাকে, 'শোনো মার্কি, আমরা শস্যের জন্যে দাম বেঁধে দেবো। কি, তাতে স্থবিধে হবে না তোমার ?'

বুড়োর হৃদয় জল হয়ে গেলো, নিশ্চয়ই তাতে তার টাকার স্থবিধে হবে।

'চেয়ে দেখ, আনড্রনের থেকে এই হুকুম এসেছে।'

যেন একটা চোখ তার কাণা হয়ে গেলো। আরেকটার সামনে নাচতে লাগলো সব লাল-নীল আলোর ফুটকি। কোথায় যেন একটা ভীষণ গর্জন উঠলো—সে-চীৎকার ছড়িয়ে পড়লো রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। রোগাচেভোর চাষারা খেপে উঠেছে। তাদের চলার বেগে উড়ছে এখন ধুলোর ধ্বজা।

ছেলের বউ এসে বললে, 'কমিউনিস্টরা গোলার থেকে ধান নিয়ে যাচ্ছে।'

বাহাত্তর বছর বয়সের কথা ভুলে পটুঘিন বাজপাখির মতো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। খাড়া হয়ে উঠলো শিরদাঁড়া, ফুলতে লাগলো নাক। এলোমেলো চুলে বেরিয়ে পড়লো সে, দরজার আড়াল থেকে কুড়িয়ে নিলো তার ছোট কুড়ুলটা।

হাতে করে ঘোরাতে লাগলো সেটা।—যুদ্ধ! এক পাশে এক সেনাপতি, অন্য পাশে অন্য। বীজের দাম বাঁধা, দাম বাঁধা যইর।

পটুঘিন দেখলো আনড্রনের টুপি, লাল তারাওয়ালা—যেন তার পায়ের নিচেকার মাটি আগুনে পুড়তে লাগলো লাল হয়ে। চোখের সামনে নাচতে লাগলো সব বাড়ি-ঘর, কানে বাজতে লাগলো পেতলের রণ-বংশী। লাফিয়ে পড়লো সে আনড্রনের উপর, ওঁচালো তার সেই ভোঁতা কুড়ুল।

‘তোমাকে মেরে ফেলবো।’ চীৎকার করে বসে পড়লো পটুঘিন।
আনড্রন চোখের সামনে দেখলো, মূর্খ মৃত্যু, ভোঁতা ছোট একটা কুড়ুলের হাতে। পিছু হটে চামড়ার থলে থেকে বার করলো সে রিভলভার।
‘গুলি করবো তোমাকে।’
পাশ থেকে চমকে উঠলো একটা উকুনঠেঙা, সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো জনতা : ‘খুন করে ফেল ওকে।’
যুদ্ধ।
শূন্যে গুলি ছুঁড়লো আনড্রন, তার ইচ্ছে ছিলো না চাষাদের কারুর গায়ে লাগে। পটুঘিন বসে ছিলো রাস্তার উপর, আঙুল দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিলো বসে-বসে। সূঁচের মতো বিঁধলো তাকে গুলি, তার বুকের পাশে, যেন গরমের দিনে মশার কামড়ের মতো।
গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে চাষারা—যে ঘোড়া মরুমাঠের কোনো দিন বাঁক নিতে শেখেনি। চোখে তাদের জ্বলন্ত ঘৃণা, কাঁপছে মাটি তাদের খালি পায়ের নিচে। কসাকের দেশে জেগেছে এক সেনাপতি, সাইবেরিয়ায় আরেক। বীজের জন্যে দাম বাঁধা, দাম বাঁধা যইর জন্যে।
‘মারো।’
‘আমাদের ওক বৃক্ষের আরণ্যশক্তি
রক্তসিক্ত রুটি আমাদের···’
লোহার একটা কোদাল তুললো টারাস টিমফেয়িচ, কিন্তু তাক গেলো ফসকে। আনড্রনের মাথার টুপির উপরে যে লাল তারা তাতেই যেন চোখ গেলো ধাঁধিয়ে। টিমফেয়িচ মাটিতে পড়ে গেলো মুখ থুবড়ে, হাত-পা ছড়িয়ে। তারো কপালের মাঝখানে এসে লাগলো গুলির কামড়।
যুদ্ধ যুদ্ধই
কেঠো পায়ের গ্রিসকা কপচিককে ওরা তাড়া করলো রোগাচেভোর

রাস্তার উপর দিয়ে, যেন এক নেকড়ের পিছনে পঞ্চাশ কুকুর। চাষাদের হাতেই তার অবধারিত মৃত্যু, দেখতে পেলো গ্রিসকা, ছুটে গেলো সে আনড্রনের উঠোনে। কিন্তু মিহাইলা বন্ধ করে দিয়েছে ঘরের দরজা। মৃত্যুর ভয়ে গ্রিসকা আঁচড়াতে লাগলো সে-দরজা, কিন্তু খুললো না। উঠতে গেলো সে ছাদের উপর, কিন্তু তার কাঠের পা গেলো ফসকে।

মৃত্যু !

দশটা জোয়ান চাষা তাকে পেড়ে ফেললো মাটির উপর, ঘিরে দাঁড়ালো ঘন হয়ে। কুড়িটা হাতে ছিঁড়ে ফেললো তারা গ্রিসকার দেহ, কুড়িটা পায়ে থেঁৎলে দিলো তাকে পায়ের তলায় ফেলে। সঙ্গে-সঙ্গে টি্ফন সামইলিচকেও।

যুদ্ধ তো যুদ্ধই।

প্রহর চেরেমুসকিন ঢুকলো ইসপলকমের আফিসে, হাতে উকুনঠেঙা।

'মারো !'

বিঁধে নিলো সে কার্ল মার্ক্সকে, বয়ে নিয়ে চললো একটা ঝরা পাতার মতো। রাস্তায় ফেলে দিলো ছুঁড়ে—তারপর স্বুরু হলো নাচ। এমন নাচ আর কোনো দিন নাচেনি রোগাচেভো-গ্রাম, সে এখন শিস দিচ্ছে, গর্জন করছে, ডিগবাজি খাচ্ছে।

তারা ছিঁড়ে ফেললো আনমুসকার নিশান, আনড্রনের নিশান। টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়লো, স্থতো করে ফেললো।

তাই ! এই তো যুদ্ধ !

দেয়াল থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলো জমির ইস্তাহার, স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় ইস্তাহার।

তারপর মারো তাদের উপর লাথি !

বীজের জন্য দাম বাঁধা, যইর জন্যে দাম বাঁধা।

তারা ঢুকলো গিয়ে জেলার খাদ্যপুষ্টিসমিতির আফিসে, আসকা

মাজলাকে ধরলো গিয়ে রাস্তার উপর।
'পাপ করেছিস, এবার অনুতাপ কর।'
দেখতে পেলো আনমুসকার কুঁড়েঘর।
'পোড়াও।'
দেখতে পেলো আনড্রনের কুঁড়েঘর।
'আগুন লাগাও।'

গ্রামের দুপ্রান্তের দুই কুঁড়েঘর—কালো চালের উপর থেকে আগুনের জিভ মেলালো টকটকে। কালসিটে চুল মাথার উপরে খাড়া হয়ে উঠলো, গড়িয়ে পড়তে লাগলো অগ্নিবর্ণ অশ্রুবিন্দু। একটা খালি বালতি নিয়ে মিহাইলা ছুটোছুটি করতে লাগলো উদভ্রান্তের মতো, আনড্রনের ছোট্ট বাক্সটি নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো ম্যাট্রিয়না। এমন কেউ নেই তাদেরকে একটু সাহায্য করে তাদের জিনিস বাঁচাতে, কেউ নেই যে দমকল চালায়। লেজে লাল ফিতে-বাঁধা ঘোড়াটা ছুটে পালালো ভয়ে লাফাতে-লাফাতে। ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলো কালো মুরগির দল, ঘাড় লম্বা করে, পাখা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে।

মৃত্যু!

এলোমেলো হাওয়া চালের উপরকার কালসিটে চুল মুচড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে, চারদিকে ছড়াচ্ছে কুচিকুচি আগুনের কণা। মেতে উঠছে, লেলিয়ে উঠছে ক্রমশ। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন, কুড়ুল দিয়ে ভাঙছে কে জানলার কাঠামো, শব্দ হচ্ছে ভাঙা কাঁচের। টেবিল, বেঞ্চি, ডালা-খোলা সিন্দুক—সব ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। গামলা, বালতি, চেয়ার, চামড়ার কোট, বিছানা, হাঁড়িকুঁড়ি, জিন, কোদাল—সব ছুঁড়ছে জানলা দিয়ে।

আগুন!

ছুটে আসে দমকল, জলের পিপের গাড়ি। মেয়েরা চেঁচায়, কুকুর চেঁচায়,

চেঁচায় ঘোড়া। চীৎকার, আর্তনাদ, কোলাহল
আর একেই বলে যুদ্ধ।

বাতাস গেলো থেমে, সব শান্ত হলো আস্তে-আস্তে। গর্জমান নদী ফিরে এলো তার বিছানায়। অন্ধকার রাতে চাঁদ এলো উঠে, একাকী; মেঘের থেকে তাকালো পরিত্যক্ত মাঠের দিকে, দূর ও নিকট গ্রামের দিকে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে খাড়া হয়ে আছে কালিমাখা চিমনি, মাটির ভিতর থেকে উঠে আসছে অস্ফুট আর্তনাদ।

শ্মশানভস্ম।

এ কোনো তাতার সেনাপতির অভিযান নয়, এ এক চাষার বাহিনী, হাতে তাদের চোখা উকুনঠেঙা, ধারালো কুড়ুল।

দুঃখ আর দারিদ্র্য।

যেখানে তার বাপের কুটীর ছিলো দাঁড়িয়ে সেখানে, অন্ধকারে, আনড্রন দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। রুমালে-বাঁধা মাথা উঁচু করে তাকালো সামনের দিকে। দীর্ঘ দুর্গম রাস্তা পড়ে আছে সামনে—দুরারোহ। চাষাদের দুঃখের ভারে নুয়ে পড়েছে তার বুক, তাদের আর্তি আর অশ্রু হৃদয় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারু সাধ্যি নেই ওদের জন্যে দুঃখিত না হয়ে পারে, কিন্তু, যাই বলো, ওদের জন্য দুঃখিত হবার তার অধিকার নেই। দুর্গম পথ তাকে ডাক দিয়ে বলছে, এগিয়ে চলো, ও-সব নিচু কান্না আর কালো চিমনি মাড়িয়ে, ওদের চাষাড়ে দুঃখকে গ্রাহ্য না করে।

রুমালে-বাঁধা আনড্রনের মাথা ঝুঁকে পড়লো অবসাদে, মাথায় কি রকম একটা চাপা, শক্ত, ক্লান্তিকর যন্ত্রণা।

ওদেরকে করুণা না করে থাকা যায় না, কিন্তু তার উচিত নয় ওদেরকে করুণা করা, কিছুতেই নয়।

মিকায়েল জোশ্চেঙ্কো

নিরক্ষরা

স্বামী আর স্ত্রী, থাকে লেলিনগ্রাদে।

স্বামী একজন সোভিয়েট কর্মী, সুস্থ, সবল ও সতেজ, সমাজ-সচেতন, চালাক-চোস্ত—বুঝতে পারছো কী জাতের লোক আমি বোঝাতে চাচ্ছি—সমাজসাম্যবাদে অনুরক্ত—আর যা-যা বোঝায় সেই সঙ্গে।

আর যদিও সে সরল, গ্রামলালিত, উচ্চশিক্ষা কিছু পায়নি, তবু যত দিন থেকেছে সে শহরে, নেড়ে-চেড়ে শিখে নিয়েছে অনেক জিনিস, এমন-কি যে কোনো সভায় খাড়া হয়ে বক্তৃতা ঝেড়ে দেয়া। তর্কেও সে পরাস্ত নয়।

কিন্তু পেলাগেয়া, তার স্ত্রী, একেবারে নিরক্ষরা। আর যদিও সে স্বামীর সময়ে-সময়েই গ্রাম ছেড়েছে, শেখেনি কিচ্ছুই। এমন কি নিজের নাম পর্যন্ত পারে না দস্তখত করতে।

স্বামীর মন ভার হয়ে থাকে। প্রতিকার খোঁজে। নিজের সময় নেই স্ত্রীকে পড়ায়, তাই বললে এক দিন : 'শোনো, পেলাগেয়া, এবার লেগে যাও লেখাপড়া শিখতে নিজে থেকে। অন্তত নিজের নামটা সই করতে শেখ। আমাদের দেশ এখন অজ্ঞান আর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে, সমস্ত অশিক্ষার অবসান ঘটাচ্ছি আমরা, আর তুমি, একজন রুটির কারখানার ম্যানেজারের স্ত্রী, তুমি কাক দেখে ক বলতে পারো না। আমার জীবনে সুখ নেই।'

কী বলবে পেলাগেয়া !

'কী হবে আর বাজে বকে ! বিদুষী হবার আর আমার বয়েস নেই।

এতদিন চুপচাপ রইলাম, এখন আমার যৌবন যাচ্ছে ঝরে, শুকিয়ে, হাতের আঙুল শক্ত হয়ে উঠছে, এখন তুমি পেন্সিল ধরতে বলছো। কী হবে আমার লেখাপড়া শিখে! ও সব ছেলেমেয়েরা শিখুক যত খুশি। আমাকে শান্তিতে বুড়ো হতে দাও।'

স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'হা, পেলাগেয়া মাকসিমভনা!'

কিন্তু এক দিন—চেয়ে দেখ—ইভান নিকোলায়েভিচ সত্যি-সত্যি এক বর্ণমালা নিয়ে এসেছে।

'এই দেখ পেলাগেয়া, এ একেবারে নতুন রকমের বই, নতুন নিয়মে তৈরি। তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সব। আগে থেকেই আপত্তি কোরো না—'

পরদিন, সকালে, পেলাগেয়া হাসলো, যেন সে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, বইখানা উলটে-পালটে দেখলো, দেখলো পাশ থেকে, তারপর সরিয়ে রাখলো কুলুঙ্গিতে। 'ওখানেই থাক। যতক্ষণ না ছেলেদের কারুর দরকার হয়।'

সেখানে রইলো সে বই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কিন্তু এক দিন, বিকেলে, পেলাগেয়া তার স্ুঁচ-সুতো তুলে নিলো, তার স্বামীর কোটের হাতা গিয়েছে ছিঁড়ে।

কোটের নিচে সে হাত রাখলো, কী যেন উঠলো হঠাৎ খসখস করে। 'টাকা না তো?' ভাবলো পেলাগেয়া।

তাকালো সে পকেটের মধ্যে। চিঠি একটা। চমৎকার পরিচ্ছন্ন চিঠি, সুদৃশ্য খাম, সুন্দর ছাঁদের অক্ষর—চিঠির কাগজে এসেন্সের মৃদু গন্ধ—অডিকোলন বা অন্য কিছু।

পেলাগেয়ার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো।

ঘোরালো কোনো ঘটনার সূত্রপাত কিনা কে জানে। 'হয়তো আড়ালে কোনো মেয়ের সঙ্গে গুপ্তপ্রেম!' ভাবলো সে ভয়ে-ভয়ে।

তাকালো খামের দিকে, চিঠিটা বার করে এনে বেভাঁজ করে খুললো

সম্পূর্ণ—কিন্তু সাপ না ব্যাঙ, কিছুই হদিশ করতে পারলো না।
জীবনে এই প্রথম সে নিজেকে হতভাগিনী মনে করলো, সে পড়তে জানে না।
'এ আমার চিঠি নয়, কিন্তু আমাকে জানতে হবে এর মাঝে আছে কী! হয়তো এ থেকে বদলে যাবে আমার জীবনের ধারা, হয়তো আবার আমাকে গ্রামে ফিরে গিয়ে মাঠে কাজ করতে হবে।'
বেচারা বিরক্তিতে বেঁকে, সন্দেহে নুয়ে পড়লো। দ্বিধায় দুলতে লাগলো সারাক্ষণ। মনে হলো পরাভূত, অপমানিত বলে।
'নিশ্চয় আমি ইভান নিকোলায়েভিচের প্রতি ভীষণ আসক্ত, তাই এই চিঠিটার কথা ভেবে ঈর্ষাতে এমন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কী দারুণ লজ্জা, আমি পড়তে জানি না। যদি পারতাম পড়তে, বুঝতে পারতাম কোথায় আছি দাঁড়িয়ে!'
আর, তাই ভেবে সে কেঁদে ফেললো। স্বামীর সম্বন্ধে কত ছোট-খাট কথা তার এখন মনে পড়ছে। সত্যি, সম্প্রতি সে বদলেছে অনেক। সাজগোজ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিটা যেন একটু তীক্ষ্ণ হয়েছে, সকালে-সন্ধেয় ঝাড়ছে তার জামা—আগে কখনো দেখা যায়নি এই পরিপাট্য। আজকাল থেকে-থেকে বারে-বারে সে হাত ধুচ্ছে। নতুন একটা টুপি কিনেছে পর্যন্ত।
পেলাগেয়া বিমনার মতো বসে-বসে শুধু ভাবে, চিঠির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, কেঁদে বুক ভাসিয়ে। কিন্তু যেহেতু সে নিজে পড়তে পারে না সেই দুঃসহ লজ্জায় আর কাউকে দেখাতেও পারে না চিঠিটা।
শেষ কালে সেই কুলুঙ্গিতেই সেটাকে ফেলে রাখলো, সেলাই করলো কোট আর বসে রইলো চুপ করে, কতক্ষণে স্বামী বাড়ি ফেরে।
যখন স্বামী ফিরলো পেলাগেয়া বেদনার কোনো ভাবই আনলো না মুখে। বরং শান্তভাবে আলাপ করলো তার সঙ্গে, এমন কি এও বললে যে

লেখাপড়া শিখতে তার আপত্তি নেই, আকাট আহম্মক হয়ে থাকবার ভ্রান্তি সে আর সইতে পারছে না।

শুনে কী সুখী হলো ইভান নিকোলায়েভিচ!

'চমৎকার! আমিই পড়াবো তোমাকে।'

'সুরু করে দাও তবে এখুনি।'

পেলাগেয়া স্বামীর মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, তার সুন্দর-করে-ছাঁটা গোঁফের দিকে। তার জ্বলতে লাগলো হৃদয়, বুক ভরে উঠলো তিক্ততায়।

দু মাস ধরে পেলাগেয়া পড়ে চললো, দিনের পর দিন। অক্ষর ধরে-ধরে বানান, অক্ষর ধরে-ধরে অর্থভরা অদ্ভুত সব শব্দ, ছবির মতো সব চেহারা, শিখলো সে অনেক কথা, অনেক মানে। আর প্রত্যেক সন্ধ্যায় সে কুলুঙ্গির থেকে সংগোপনে বার করতো সে সুগন্ধি চিঠি আর উদ্ধার করতে চাইতো তার রহস্যময় নীরবতা।

কিন্তু তা সহজ নয় একেবারেই।

তিন মাস লাগলো পেলাগেয়ার সে প্রথম পাঠ আয়ত্ত করতে।

এক দিন সকালে, তার স্বামী কাজে বেরিয়ে গেছে, বার করলো সে সেই চিঠি, আর তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি সুরু করলো।

নিটোল অক্ষরের সারের উপর বারে-বারে পড়তে লাগলো সে হোঁচট খেয়ে। কাগজের অস্পষ্ট-হয়ে-আসা নিস্তেজ গন্ধ তাকে লুব্ধ করছে, উত্তপ্ত করে তুলছে।

প্রথমে পড়লো সে ঠিকানা : 'ইভান নিকোলায়েভিচ কুচকিন।'

তারপরে চিঠি :

'মাননীয় কমরেড কুচকিন,

যে-প্রথম পাঠের কথা বলেছিলাম তা পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। মনে হচ্ছে দুই কি তিন মাসেই তোমার স্ত্রী তা বেশ শিখে নিতে পারবে। দয়া করে

প্রতিজ্ঞা করো যে তার মধ্যেই পারবে তাকে শিখিয়ে নিতে। তাকে তোমার বোঝানো চাই লেখাপড়া না শিখে থাকাটা কী ভীষণ অপমানের ব্যাপার !

তুমি তো জানো আমরা যত শিগগির পারি সমস্ত দেশময় নিরক্ষরতার অবসান ঘটাবো, যত শক্তি আছে আমাদের সমস্ত প্রয়োগ করে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ঘরের কথা ভুলে থাকলে চলবে না।

এই কাজে যাতে তোমার সাহায্য পাই তা সর্বক্ষণ তুমি মনে রেখো।

সাম্যবাদীর অভিবাদন।

মারিয়া ভুখিনা'

দু-দুবার পড়লো চিঠিটা পেলাগেয়া। আবার নিজেকে তার অপমানিত মনে হলো, বসলো আবার কাঁদতে।

কিন্তু পরে, যখন সে ভাবলো ইভান নিকোলায়েভিচের কথা, আর মনে করলো কী সহজে, কী শান্তিতে এখন থেকে বইবে সময়ের স্রোত, জ্ঞানের মধ্য দিয়ে, প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখন সে ঠাণ্ডা হলো। দীর্ঘ কাল ধরে ভয় জাগিয়েছিলো যে চিঠি সেটা আর প্রথম-পাঠটা সে স্বচ্ছন্দে রেখে দিলো কুলুঙ্গিতে।

এমনিতে যা হয়নি, প্রেমে আর ঈর্ষায় তা হলো। পেলাগেয়া শিখলো এত দিনে পড়তে আর লিখতে, সহজ অনর্গলতায়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এ এক জ্বলন্ত পরিচ্ছেদ।

লেও ভাইসেনবের্গ

ঘুম-ভাঙানো ঘড়ি

মোড়ের মাথায় আটকা পড়লো আনড্রেয়ি। ছড়িয়ে পড়ছে বরফের গুঁড়ো, তার মধ্য দিয়ে চলেছে ব্যস্ত জনস্রোত, ট্রাম আর মোটর আর বাস, আর মাথার উপরে জ্বলছে একটা প্রকাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক ঘড়ি, সূর্যের মতো।

'দেখি ঠিক আছে কিনা আমার ঘড়িটা।' আনড্রেয়ি হাত রাখলো তার বুক-পকেটে। যে একটি গোল আকারের অনুভবে তার আঙুল অভ্যস্ত, পকেটে তার পরিবর্তে একটি শূন্যতার অনুভব। ব্যস্ত হয়ে সে খুঁজতে লাগলো আর-আর পকেট, সমস্ত পকেট, কিন্তু কোথাও ঘড়ি নেই। তার স্পষ্ট মনে পড়ছে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ঘড়ি ছিলো তার পকেটে; এখন গেলো কোথায়?

আনড্রেয়ি একেবারে থ হয়ে গেলো।

তার বাবার উপহার, এই ঘড়ি তার চিরকেলে সঙ্গী, তার স্কুলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে। পনেরো বছর ধরে তার সঙ্গে আছে, বুকের পাশটিতে। খোয়া গেলো একেবারে? বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। মনে হয় এখনো যেন বুকের পকেটের মধ্যে বসে টিকটিক করছে, তার হৃদয়ের প্রতিবেশিতায়। পা-কাটা লোক যেমন কাটা পা-টা অনুভব করে কল্পনায়, তেমনি করে-করেই মনে হতে লাগলো তার, যে, আছে সে-ঘড়ি তার নিজের জায়গায়, আগের মতন।

আবার সে পকেটে হাত দিলো। কিন্তু ঘড়ি নেই।

আনড্রেয়ির মনে পড়লো তার জীর্ণ খোল, কুঞ্চিত পাত, বার্ধক্যে হলদেটে

হয়ে এসেছে, মন্থর গতিতে চলেছে তার কালো হাত। তার অস্ফুট শব্দ এখনো যেন তার রক্তের স্পন্দনে। কখন থেমে যায় এই ছিলো তার ভয়। থেমে গেলে খুলে বসো ডালা, ধুলো উড়িয়ে দাও ফুঁ দিয়ে। আশ্চর্য, তার নিশ্বাসের তাপ পেয়ে আবার কেমন চলতে সুরু করে ঘড়ি, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, কখনো বা হাত-পা ছুঁড়ে।

বড়ো-বড়ো ফুলকিতে ঝরে পড়ছে বরফ, পথচারীর উপর, ট্রাম-মোটরের উপর। 'ঘড়ি, আমার ঘড়ি', সর্বক্ষণ মন ঘ্যান-ঘ্যান করছে। প্রকাশকের দোকানে যাচ্ছিলো সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে, গিয়ে আর কাজ নেই সেখানে। 'ঘড়ি আমার ঘড়ি।' রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, তাকাচ্ছে দোকানের জানলায়, আর চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ঘড়িকে। হঠাৎ চোখে পড়লো এক ঘড়ির দোকান, থরে-থরে লাইন ধরে-ধরে ঘড়ি সাজানো। পকেট-ঘড়ি, কব্জি-ঘড়ি। কাঁচের লাঠির উপরে কেউ ঝুলছে, পাখির মতো, কারু মুখ বা প্যাঁচার মতো গম্ভীর, কেউ যেন বা জ্বলছে চলবার প্রতীক্ষায়, কেউ বা ঝিমুচ্ছে, বসে-বসে, আর কেউ বা উদাস। আর মোড়ের মাথায়, ইলেকট্রিক ঘড়ির প্রকাণ্ড মুখপটে লাল অক্ষরে লেখা—'এই ঠিক সময়'।

'নতুন একটা ঘড়ি না কিনলে নয়।' আনড্রেয়ি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

যেন ঘড়ির দল এখুনি প্রাণ পেয়ে উঠবে। বিচিত্রকণ্ঠে কথা কয়ে উঠেছে তারা, একেক জনের একেক রকম ছন্দ। কোনোটা প্রশান্ত, কোনোটা কর্কশ, কোনোটা বা ফাজিল।

সময়ের একতান।

কোনোটার মধ্যে বা জুয়াড়ীর হৃদস্পন্দন, কোনোটাতে বা যন্ত্রের দুঃসাহস। কোনোটাতে বা শোভন গৃহসজ্জা, কোনোটা বা কোমল মিলন আর ব্যথিত বিচ্ছেদের সাক্ষী।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে সে ঘড়ি এমন সময় কার ছায়া পড়লো, নিজেরই

বিকৃত ছায়ার পাশে, ঘড়ির মুখাবরণের উপর। তারই মতো আর কেউ যেন ঘড়ির সম্বন্ধে আকৃষ্ট হয়েছে।

'এটা নিশ্চয়ই ব্রেগেট—' লেবেল পড়ে বললে আনড্রেয়ি।

তার প্রতিবেশী কবিতার একটা লাইন আওড়ালো : 'অক্লান্ত ব্রেগেট যতক্ষণ পর্যন্ত না বাজায় রাত্রিভোজের ঘণ্টা।'

কবিতার লাইনটা এত অপ্রত্যাশিত যে আনড্রেয়ি চমকে তাকালো তার পাশে, দেখলো সাদাসিদে একটি মেয়ে, গায়ে সাধারণ ধূসর রঙের কোট, লাল রঙের বেরে, হাতে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ। যেন উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করছে এমনি একটি হাসি মেয়েটির মুখে। আনড্রেয়ির অবিশ্যি রসিকতা করবার মেজাজ নেই।

'যে জিনিস বোঝো না তা বলতে আসো কেন?' উঠলো আনড্রেয়ি ঝাঁজিয়ে। মেয়েটার মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে আরো জোরের সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, কিচ্ছু বোঝো না।'

তবু তখনো সেই বিস্ময়ের ভাব।

'বেশ, বলো, ঐ যে কবিতার লাইনটা কায়দা করে আওড়ালে তাতে "ব্রেগেট" শব্দটার মানে কী?'

মেয়েটা দমলো না। বললে, "ব্রেগেট" মানে হচ্ছে পুরোনো ঘড়ি বা ক্রনোমিটার, আবিষ্কর্তার নামেই যার নাম। আব্রাহাম লুই ব্রেগেট—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে যার আবিষ্কার।'

চূড়ান্ত উত্তর, যতদূর ব্যাপক হতে হয়। আনড্রেয়ি আশ্চর্য হলো। ইচ্ছে হলো জিগগেস করে, 'কি করে জানলে?' কিন্তু তা না করে বললে নীরস গলায়, 'কিন্তু তবু তোমার ভুল হয়েছে ব্যাখ্যাটা। ঐ কাহিনীটাতে পুশকিন কি এই বলতে চেয়েছে যে মন খুলে হাসি-হল্লা করে যাও যতক্ষণ "ব্রেগেট", মানে ঘড়ি, ডিনারের ঘণ্টা না বাজায়!'

'ঠিক তাই।'

'তোমার মাথা। তোমার মুণ্ডু। পুশকিনের কল্পনা তোমার কল্পনার চেয়ে ঢের বেশি সূক্ষ্ম। এখানে "ব্রেগেট"' মানে মোটেই ঘড়ি নয়—পাকস্থলী।'

'পাকস্থলী!' মেয়েটির মুখ হাঁ হয়ে রইলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ—পাকস্থলী। পুশকিন এ-কথা আরো এক জায়গায় বলেছে—"পাকস্থলীই আমাদের আসল ব্রেগেট।" তাই না? তবে বুঝতে পারছো এবার কবিতার মানেটা? "বিনিদ্র পাকস্থলী যতক্ষণ না জানায় রাতে খিদে পেয়েছে!" বুঝতে পারছো এবার?'

'সত্যি, কী মজার।'

'বুঝতে পারছো, সময় আর পেট সমান তালে বাঁধা।'

'সত্যি।'

একসঙ্গে খেলো তারা তারপর—মেয়েটির নাম আনা—গেলো সিনেমায়, পরে বেড়ালো একসঙ্গে। বরফ পড়ছে, ভিজছে তাদের মুখ, কিন্তু ভিতরে তারা গরম।

'চলো, আমার ঘরে চলো।' বললে আনড্রেয়ি।

'দেরি হয়ে গেছে, এখন রাত প্রায় বারোটা।'

তাতে কি, আনড্রেয়ি পেড়াপীড়ি করতে লাগলো, গেলো দুজনে একসঙ্গে। ইলেকট্রিক কেটলিতে জল গরম করবার জন্যে সুইচ টিপলো আনড্রেয়ি, টেবিলে রাখলো কিছু বিস্কুট, আগুন জ্বালালো স্টোভে। ঘরের প্রশংসা করলো আনা, কিন্তু আনড্রেয়ির কোনো দিন মনে হয়নি তার ঘরে আছে কিছু প্রশংসার মতো। গরম চা তৈরি, স্টোভে টাটকা আগুন। অনেক কথা বললে তারা একে-অন্যকে, অনুভব করলো পরস্পরের মধ্যেকার গরমের আরাম। আনার বয়েস বাইশ, জারের আমলের এক নির্বাসিত রাজবন্দীর মেয়ে। সাইবেরিয়ায় ইয়েনেসেই নদীর পারে তার জন্ম। সমস্ত শৈশব তার কেটেছে সেই বুনো দেশে, এখন আবার বহু

বছর সে শহরে। সে এক ঘড়ির কারখানায় ল্যাবোরেটরিতে কাজ করে—তাই সে জানে অত "ব্রেগেটের" কথা। গল্পে মশগুল হয়ে অনুভব করছে তারা এক ভাষাহীন সুখের উষ্ণতা।

হঠাৎ পাশের ঘরের ঘড়িতে তিনটে বাজলো।

লাফিয়ে উঠলো আনা। রাত তিনটে ? হ্যাঁ, সত্যিই তো—রাস্তায় সমানে বরফ পড়ে চলেছে।

'আমাকে সকাল নটার সময় কাজে হাজির হতে হবে, কী করে বাড়ি যাবো ?'

'এখানে থাকো।' বললে আনড্রেয়ি। 'কৌচে তোমার জন্যে একটা বিছানা তৈরি করে দিচ্ছি।'

'ভয় হচ্ছে, বেশি ঘুমিয়ে ফেলবো। সকালে আমার বোন রোজ জাগিয়ে দেয়। ঠিক সময় উঠতে না পারলে বিপদ হবে।'

আনার মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো, অঙ্কের সমাধানে নিযুক্ত ছাত্রীর মুখের মতো। হঠাৎ যেন সমাধান মিলে গেছে এমনি সানন্দ ভাব এলো তার মুখে। যেন কি-একটা বুদ্ধি তার মাথায় এসেছে, তাই দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ। আনা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো তার চামড়ার ব্যাগ, দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বাক্সের ভিতর থেকে কি যেন বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

'কী করছো তুমি ?' স্তম্ভিতের মতো জিগগেস করলে আনড্রেয়ি। 'কী আছে ওটার মধ্যে ?'

দড়ি সরিয়ে খুলে ফেললো বাক্সটা। বেরুলো একটা য়্যালার্ম-ক্লক, ঘুম-ভাঙানো ঘড়ি। আদর করে আনা তুলে নিলো সেটাকে হাতে, যেন দোলনা থেকে তুলে শিশুকে কোলে নিচ্ছে। নিঃশব্দ, প্রাণহীন সে ঘড়ি।

'আমাকে ঠিক নটার সময় কাজে লাগতে হবে।' বললে আনা। 'কুড়ি

মিনিট সাজ করতে, আধঘণ্টা যেতে। আটটায় দিতে হবে য়্যালার্ম।'

পাকা, জানা হাতে সে ঘড়িতে চাবি দিলো। মুহূর্তে বেঁচে উঠলো ঘড়িটা। কানে লাগিয়ে আনা একবার শুনলো তার চলার স্পন্দনটা। খুব বলবান হৃৎপিণ্ড। তারপর য়্যালার্মে লাল কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিলো সে আটের ঘরে, দিলো য়্যালার্মের আলাদা চাবি। ঘণ্টার কাঁটাটাও নিয়ে গেলো আটে, আর তখনি সুরু হলো বাজনা। যেন গলা খুলে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ঘড়িটা, অনুরোধের সঙ্গে যেন আদেশ। চমকে উঠলো আনড্রেয়ি, আর হাসলো ঘড়িটার উদ্ধত প্রাবল্যে। যেন লাথি মেরে-মেরে নাচছে ঘড়িটা, আনার হাতের উপর, প্রাণবান শিশুর মতো। ভয়ংকর ও দুর্ধর্ষ শক্তি যেন ওর মধ্যে কাজ করছে।

'এই ঘড়ি কাছে রেখে কারু সাধ্যি নেই বেশি ঘুমোয়।' বললে আনা, গর্বিতের মতো।

কৌচে আনার বিছানা করে দিলো আনড্রেয়ি। তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে আনা ঘুমিয়ে পড়লো। আনড্রেয়ি তখনো অভ্যাস মতো বই পড়ছে। য়্যালার্ম-ঘড়ি চলেছে টিকটিকিয়ে, নড়ে-চড়ে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে তার কাঁটা, গোল হয়ে।

বই বন্ধ করলো আনড্রেয়ি, তাকালো কৌচের দিকে। ঘুমোচ্ছে আনা। আনড্রেয়ি শুনতে পাচ্ছে তার নিশ্বাসের শব্দ, আর তার চুলের ঢেউয়ে মুগ্ধ লাগছে নিজের দৃষ্টিকে। দিলে আলো নিবিয়ে, আর সেই অন্ধকারে শুনলো সেই য়্যালার্ম-ঘড়ির আওয়াজ আর দেখলো তার জ্বলন্ত দুই কাঁটা।

শেষকালে আনড্রেয়ির মনে হলো এ তার নিজের বুকের শব্দ, আর ও তার জ্বলন্ত-জাগ্রত চোখ। অন্ধকারে সে যেন ঘড়ির ধাতব শীতলতাটা অনুভব করছে। আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো সে টিকটিক, কাঁটার দীপ্তি গেলো ম্লান হয়ে, আর ঘড়ির কঠিন কাঠামোটা গেলো মিলিয়ে, যেমন আঙুলের

ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। কিম্বা আনড্রেয়ির শান্ত হয়েছে হৃদয়, মুদ্রিত হয়েছে চোখ আর সমস্ত শরীর বিশ্রামে গিয়েছে মগ্ন হয়ে। কে তল পাবে এই রহস্যের ? আঙুলের ফাঁকে জল ! আনড্রেয়ি ঘুমিয়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে একটা আতঙ্কিত শব্দ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে পড়লো, যেন ঘরের মধ্যেই চলছে ট্রাম, বাজছে উর্ধ্বশ্বাস দমকলের ঘণ্টা !

ঝিমুনো চোখের পাতা দুটোকে সজোরো টেনে কে ছিঁড়ে ফেলছে, গা থেকে টেনে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কম্বল, ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিচ্ছে বিছানার উপর, দেখ ঠিক আটটা বেজেছে। সতেজ শিশুর মতো তেমনি পা ছুঁড়ছে, নাচছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে-এগিয়ে। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত শব্দ। যেন গায়ের উপর এসে ঠেলা মারছে আনড্রেয়িকে।

আনড্রেয়ির ইচ্ছে ছিলো আরো কতক্ষণ ঘুমোয়।

'দুত্তোর ছাই !' তাকালো কৌচের দিকে, দেখলো আনার সেই এলোমেলো চুলের ঢেউ। য়্যালার্ম-ঘড়ি তেমনি অসভ্যের মতো প্রমত্ত শব্দে বেজে চলেছে, অনুরোধের স্বরে, আদেশের ধমকে। 'কী জঞ্জাল !' ভাবলো আবার আনড্রেয়ি।

'ও-পাশ ফের।' এত শব্দের মধ্যে থেকেও স্পষ্ট ফুটে উঠলো আনার কণ্ঠ।

আনড্রেয়ি শুনলো তার পোশাক পরা, দ্রুত অথচ ঠিকমতো পর-পর। শুনলো বিছানা সরিয়ে নিলো কৌচ থেকে। আনড্রেয়ি তখনো শুয়ে আছে, দেয়ালের দিকে মুখ-করা, দিচ্ছে সব দরকারি নির্দেশ। পাশের ছোট ঘরে আছে পরিষ্কার তোয়ালে, সাবান বাথরুমে, তাকের উপর শাদা প্লেটের উপর। জানলার কাছে রুটি আর মাখন। আনা গেলো মুখ ধুতে, কলের জল বেরিয়ে এসেছে ঝরনার জলের তোড়ে। আনড্রেয়ি তখনো শুয়ে। সজীব মুখে ফিরে এলো আনা।

'জানলাটা খুলে দিই। কী বলো ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। বললে আনড্রেয়ি, অসহায়ের মতো। ঠাণ্ডা হাওয়াকে তার ভীষণ ভয়, নাক পর্যন্ত টেনে আনলো কম্বলটাকে।

আরো সব নির্দেশ দিয়ে দিলো তাকে, কোথায় পাওয়া যাবে ছুরি, গ্লাশ আর প্লেট—গৃহস্থালীর টুকিটাকি। শুয়ে-শুয়েই হুকুম দিচ্ছে সে, আর জানলা দিয়ে ঝলকে-ঝলকে আসছে ভোরের বাতাস। আনা চা খেলো, টেবিল পরিষ্কার করলো, প্লেট ধুলো, এমন কি তৈরি করে রাখলো আনড্রেয়ির প্রাতরাশ। আরেক রকম কায়দায় তার কাজ, আরো অনেক দ্রুত—তার তুলনায় আনড্রেয়ি কত স্থূল, কত মন্থর।

'কেমন চটপটে !' ভাবলো আনড্রেয়ি। 'নিখুঁত কলের মতো।'

'আটটা বেজে কুড়ি মিনিট !' বললে আনা, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আনড্রেয়ি তাকালো য়্যালার্ম-ঘড়ির দিকে। 'এত শিগগির ? এক্ষুনি ?' ইচ্ছে করলো না তাকে ছেড়ে দেয়।

'হ্যাঁ, এখনো বেশ সময় আছে, ঠিক সময়েই পৌঁছুতে পারবো।'

পরলো কোট, লাল বেরে, দেখতে দেখতে হয়ে গেলো কাল রাত্রের সেই ঘড়ির দোকানের মেয়ে। আনড্রেয়ির ইচ্ছে করে না ওকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু শক্তি নেই ওকে আটকে রাখে।

'আনা, আজ রাতে আবার এসো।'

'ফোন করবো তোমাকে।' শূন্যে হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় আনা।

'ঠিক কোরো কিন্তু।' আনড্রেয়ি চেঁচিয়ে ওঠে।

বিছানার ভিতর থেকে তার গলা শোনায় কেমন ফাঁকা, অস্পষ্ট। ঘরের নিঃশব্দতার মধ্যে সে এখন একা। তবু কে যেন এক বিদেশী রয়েছে ঘরের মধ্যে। বুক তার দুলে উঠলো বুঝি। শুনতে পেলো সে টিকটিক। সেই য়্যালার্ম-ঘড়ি। ভুলে ফেলে গেছে আনা।

সাড়ে আটটা। 'এত শিগগির! এখুনি?'

ঘড়িটা ভুরু কুঁচকে তাকালো আনড্রেয়ির দিকে। ওর গত রাত্রের প্রফুল্লতা পালিয়ে গেছে কখন। ও এখন কড়া অভিভাবকের চোখে তাকাচ্ছে, ভঙ্গিটা অনেক কঠোর, ক্রুদ্ধ।

'দুত্তোর ছাই!' পাশ ফিরে আনড্রেয়ি আবার ঘুম দিলো।

নতুন করে ঘুম, গভীরতম ঘুম।

জাগলো গিয়ে বিকেল তিনটেয়।

রোজই সে খুব দেরি করে ওঠে—বিকেল একটা কি দুটোয়। আস্তে-সুস্থে পোশাক পরে, আস্তে-সুস্থে প্রাতরাশ খায়, বই পড়তে-পড়তে, তাকের মধ্যে বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে। তিনটের আগে কোনো দিন কাজে বসে না। আর, কাজ করেই বা কতক্ষণ। হয়, কোথাও যেতে হবে বাইরে, নয়তো কিছুতেই কোনো লেখা আসবে না মাথায়, কিম্বা দেখতে-দেখতে ডিনারের সময় হয়ে যাবে। বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসবে অনেক রাত্রে। রাত্রেই তার কাজ। দেরিতে ওঠা তার অভ্যেস হয়ে গেছে, আর তার পক্ষে যুক্তিও তার অনেক। কাজে সে এত লিপ্ত থাকে রাতে যে তিনটের আগে তার ঘুমই আসে না। সব সময়েই যে কাজ থাকে তা নয়, কিন্তু দেরি করে ওঠার অভ্যাস তার মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে।

সন্ধের সময় ফোন করলো আনা, বললে, আসবে রাত্রে। অনেক রাত পর্যন্ত কথা বললে দুজনে, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনেও সে এলো, থাকলো সারা রাত। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী হয়েই থেকে গেলো।

আনা তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে আরেক রকম আবহাওয়া। প্রফুল্ল, ক্ষিপ্র, তেজস্বী। দুজনের দুরকম জীবন।

কিন্তু য়্যালার্ম-ঘড়িটাকে দেখতে পারে না আনড্রেয়ি, যতই দিন যায় ততই সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক দিন ভোরে ওর ঘুম ভাঙায়, আলিঙ্গন থেকে ঘুমকোমল আনাকে ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, জেলারের

মতো নির্দয় ভাবে তাকে পোশাক ছাড়ায়, ঠাণ্ডা জলে স্নান করবার সময় আনার মধুর আর্তনাদগুলি পর্যন্ত শুনতে দেয় না। ভিজা রাস্তার উপর আনাকে সে টেনে নিয়ে যায় জোর করে, ঠেলে উঠিয়ে দেয় ট্রামে, ঘাড় ধরে নিয়ে যায় কারখানায়। সন্ধে পর্যন্ত সময়ের দাসত্বের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রাখে। আনড্রেয়ির মনে হয়, য়্যালার্ম-ঘড়ির এই উদ্ধত প্রভুত্বের কাছে আনা যেন নিজের ইচ্ছায় দাসী।

কিন্তু তার মধ্যে সেই ঘড়ি জাগিয়ে তুলছে রাগ, হয়তো বা ঈর্ষা। রোজ-রোজ ভালো লাগে না আনার এই দিনের বেলায় না-থাকা। এক দিন তাদের ঝগড়া হলো, আনড্রেয়ি বকলো আনাকে হৃদয়হীন বলে, তার স্বামীর চেয়ে তার কারখানার ক্রনোমিটার বেশি দামি বলে। এ রকম ভাবে এক সঙ্গে থাকার মানে হয় না, বললে আনড্রেয়ি। আনা গুছিয়ে নিলো তার জিনিস-পত্র, চলে গেলো তার পুরোনো ঘরে। আনড্রেয়ি ভেঙে পড়লো। সমস্ত অনর্থ-সর্বনাশের মূলে ঐ ঘৃণ্য য়্যালার্ম-ঘড়ি। আনড্রেয়ি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো, সন্ধের সময় ফিরে আসবে আনা, কিন্তু এলো না। একা-একা ঘুমিয়ে পড়লো আনড্রেয়ি। ঘুমোলো নেশাখোরের ঘুম, আচ্ছন্নের মতো। তবু সমস্ত ক্ষণ তার চেতনার এক অংশ যেন কান খাড়া করে রইলো কখন বেজে ওঠে সেই প্রত্যাশিত শব্দ। অদ্ভুত এই অর্ধ-অনুভূত চেতনা। এই প্রত্যাশিত শব্দ অপ্রার্থিত, তবু মন বসে থাকে উৎসুক হয়ে কখন না জানি বেজে ওঠে। সমস্ত ক্ষণ মনে হয়েছে ঘুমের মধ্যে বন্যার বাঁধ ভেঙে গিয়ে এই বুঝি সে শব্দের ঢেউয়ে ভেসে তলিয়ে যাবে। আরেকবার—আরেকটি বার শুনতে পেলে যেন সে আরাম পেতো। কিন্তু কী নিচল নিস্তব্ধতা!

দু দুটো সকাল কাটলো তেমনি শব্দহীন, ক্রমে-ক্রমে কাটলো দশটা আরো নতুন কুয়াসাচ্ছন্ন ভোর—শেষ পর্যন্ত এক মাস। অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগলো আনার স্মৃতি। আর আশ্চর্য, য়্যালার্ম-ঘড়িটার জন্যে একটু বা স্নেহ

বোধ করলো মনে-মনে, তার পলাতক পকেট-ঘড়িটার প্রতি স্নেহে। পুরোনো ধারায় বইতে লাগলো জীবনের স্রোত, আর আগের মতো ঘুমুতে লাগলো সে নিশ্চিন্ত হয়ে।

এক সন্ধ্যায় আনার সঙ্গে আনড্রেয়ির দেখা হয়ে গেলো থিয়েটারে, দুজনেই একা। সরু হাঁটা-পথে দেখা হয়ে গেলো মুখোমুখি। ঘাবড়ে গিয়ে আনড্রেয়ি চেষ্টা করলো পালাতে, কিন্তু পালানো সম্ভব হলো না। আবার তারা হাঁটলো এক সঙ্গে, থিয়েটারের অবসর সময়গুলোতে দেখা করলো পরস্পর, আর এমন ভাবে কথা বলতে লাগলো যেন কত দিনের বন্ধুত্ব, কোনো দিনই ঝগড়া হয়নি তাদের মধ্যে। আবার ঠিক করলো তারা, আবার এক সঙ্গে থাকবে, আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না। প্রথম রাতের মতোই আনড্রেয়ি বললে, 'চলো আমার ঘরে।'

আনা বললে, 'আজ নয়। রাত এখন প্রায় বারোটা।'

আনড্রেয়ি মিনতি করে বললো, 'চলো, একটুখানির জন্যে।'

আনা বললে, 'না, কাল।'

ঠিক এলো সে পর দিন, তার জিনিস-পত্র নিয়ে। সঙ্গে সেই মোটা মজবুত প্রাণীটা, আবার আগের মতেই তারা গল্প করলো অনেক রাত পর্যন্ত। আনা চাবি দিলো য়্যালার্ম-ঘড়িতে। তারপর তারা শুতে গেলো।

য়্যালার্ম-ঘড়ির চীৎকার ঘুমের গহন অতল থেকে টেনে তুললো আনড্রেয়িকে।

আনড্রেয়ি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। এ যে আরেক রকম শব্দ। নতুন রকম শব্দ। যেন অনেক দিন ধরে যার প্রতীক্ষা করছিলো সেই অশ্রুতপূর্ব শব্দ। মুক্ত, আনন্দময়। মরুভূমিতে গাছের সবুজ শাখার মতোই সে শুভাগত। এ যেন রাখালের বাঁশি, শিকারীর শিঙা, বিজয়ীর তূর্য। এর ভাষা আজ সাহচর্যের ভাষা, প্রেমের ভাষা।

আনড্রেয়ির চোখ গেলো খুলে।

দেখলো, ঠাণ্ডা ভোরে স্নান করে আনা খাসা তাজা হয়ে উঠেছে, যেন পুনর্মিলনের আনন্দে ঝলমল করছে তার সর্বাঙ্গ। আনড্রেয়ির লজ্জা করলো বিছানায় শুয়ে থাকতে। তাড়াতাড়ি উঠে লাগলো পোশাক পরতে। সমস্ত বাথরুমে জল ছিটিয়ে প্রবলভাবে সে দাঁতে ব্রাস ঘষতে সুরু করলো। যতক্ষণ না চামড়া লাল হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত রগড়ালো তার গা-হাত-পা। যেন কোনো দৌড়-প্রতিযোগিতায় সে যোগ দিতে চলেছে। গুনগুনিয়ে একটা সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে আনা টেবিলে এসে বসতে-না-বসতেই আনড্রেয়ি এসেছে ছুটে। তার চা ঢেলে দিলো আনা, কেটে দিলো রুটি। আর আনড্রেয়ি আনার পাশে বসে, যুদ্ধজয়ের সমান অংশীদার, ভাবতে লাগলো কী সুন্দর সকালবেলাকার এই চা. খোলা জানলা দিয়ে আসছে কী টাটকা হাওয়া।

'তুমি আজ এত ভোরে উঠেছো কেন ?' আনা জিগগেস করলো।

'ঘুমুতে পারলাম না। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

কাজে যাবার আগে আনা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো আনড্রেয়িকে। আনাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিলো, দেখলো তাকে নিচে নেমে যেতে, শুনলো তার হাতের ধাক্কায় সদর বন্ধ হবার শব্দ। আনড্রেয়ি এখন একা. একা। কিন্তু আশ্চর্য, নেই কোনো নির্জনতা, নেই সঙ্গীহীনতার ভাব। আগের মতো নেই বা সেই শূন্য নিঃশব্দতা। টেবিলের সামনে বসে সে লেখা সুরু করে দিলো। নেই আর সেই আগের অনিশ্চয় ভাব, সেই অস্থৈর্য। সেও সুরু করলো সুর ভাঁজতে আর য়্যালার্ম-ঘড়িটা তার সঙ্গে চললো তাল রেখে।

প্রত্যেক দিনই খুব ভোরে উঠতে লাগলো আনড্রেয়ি। ঐ য়্যালার্ম-ঘড়িটাই তাকে জাগায়, আর সকাল থেকে সে তাদের তিনজনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত সাহচর্যের গান গায়। আগে আনড্রেয়ির তাকে মনে হতো বিদেশী, বা শত্রু, যে আনার থেকে তাকে রাখতো বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু এখন, সে

আর আনা, একই সঙ্গে একই ভাবে চোখ খোলে। জাগবার দরকার নেই তত, তবুও আগেই জেগে পড়ে দুজনে। কখনো-কখনো বা য়্যালার্ম বাজবার আগেই। কে কখন প্রথমে জাগবে ঠিক থাকে না, কখনো আনড্রেয়ি, কখনো আনা। আগে জাগায় দুজনের সমান আগ্রহ, হয়তো বা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা।

এক রাতে বিছানায় শুয়ে বললে আনা, 'কাল আমাকে আধঘণ্টা আগে কাজে যেতে হবে।'

'কাজের ভূত!' আনড্রেয়ি বললে ঘুমো চোখে।

আনা ঠিক আধ ঘণ্টা আগে উঠলো, ঘড়িকেও হার মানিয়ে। অভ্যাসের বশে আনড্রেয়িও উঠে পড়লো, যদিও আরো একটু ঘুম অবাঞ্ছনীয় ছিলো না তার। যখন কাজে যাবার সময় হলো আনার, আনড্রেয়ি দেখলো তার তৈরি হওয়াটি। কেমন পরলো সে বসন্তের নতুন কোট আর টুপি, কেমন করে পাট করে নিলো তার শোভন চুলের গুচ্ছ! দেখলো তাকে আরো গভীর চোখে, আর, আর-আর বারের মতোই যাবার আগে পাখার মতো বাহু মেলে আলগোছে আনা তাকে বুকে জড়ালো।

আনড্রেয়ির বুকের ভিতরটা উথলে উঠলো আবেগে। বুক ভেসে ছাপিয়ে গেলো স্নেহে, বিচ্ছেদের কাতরতায়। সহ্য হচ্ছে না তাকে ছেড়ে দিতে। কোথায়, কেন সে যাবে? যাকে সে বেছে নিয়ে এসেছে জীবনে তারই সঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত করছে নিজেকে। যেন তারই দেহ থেকে তার হাত বা পা কেউ ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আনড্রেয়ির স্বার্থপর মনে ঠেলে আসছে তখন স্বত্বাধিকারীর লোভ।

অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। দুজনের বুক দুলতে লাগলো সশব্দে—ক্রমে-ক্রমে বদলালো তার ছন্দ আর তাল আর সুর, যেন কোনো কোমল দূরাগত বাঁশির শব্দ, শিকারীর শিঙার, যেন বা সাইরেনের। শব্দ ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগলো, যেন মার্চ করে চলেছে সৈন্যরা,

বাজছে তাদের ঢাক, বাজছে তূর্য, বাজছে ঘণ্টা। শেষে বেজে উঠছে তা কামানের বিস্ফোরণের মতো।

আর সেই শব্দে, এর হাত খসে গেলো ওর হাতের মুঠ থেকে।

স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ভোর। ঘরের মধ্যে বয়ে আসছে উজ্জ্বল হাওয়া। স্ত্রী আর পুরুষ সব কাজে বেরিয়ে গেছে—যার যা কাজ। ছেলে আর মেয়ে চলেছে স্কুলের মুখে। ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে-মিলিয়ে চলেছে আনা। তার মধ্যে নতুন জীবন, নতুন জীবনের উদ্দেশ্য, দীপ্তিমান, অনমনীয়। সূর্যের মতো জ্বলছে সেই ইলেকট্রিক ঘড়ি, চৌমাথার মোড়ে। চেঁচিয়ে বলছে উচ্চকণ্ঠে: 'আটটা! আটটা বেজেছে।' আনড্রেয়ির টেবিলের উপর থেকে য়্যালার্ম-ঘড়িটা বলছে সুর মিলিয়ে: 'আটটা!' অল্প ফাঁক-করা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আনড্রেয়ি ভোরের হাওয়া খাচ্ছে। জানলাটা হঠাৎ সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে সে তক্ষুনি কাজে বসলো, ব্যগ্র আগ্রহে।

লেওনিদ্‌ লিওনফ্‌

একটি গল্প

'মরা খুব সহজ,' বললে প্রহর স্টাফিয়েফ, 'খুবই সহজ, আর তাতে একটুও নেই যন্ত্রণা। কোনো স্বাদই নেই মৃত্যুতে, না মিষ্টি, না বা তেতো।'

"ফ্লাইং-ক্যাম্প"-এর বিদেশীরা তাকালো বুড়োর দিকে, খানিকটা হতবুদ্ধির মতো। 'ঠাকুরদার মতো বাজে কথা।' বললে য়ুডা, চাপা গলায়, ঠাণ্ডা করে, যেন প্রহর না শুনে ফেলে।

কিন্তু প্রহর তার হলদেটে দাড়িতে ধীরে-ধীরে হাত বুলোলো, বার্ধক্যে ও অভিজ্ঞতায় হলদে হয়ে এসেছে যে-দাড়ি। বললে শান্ত ভাবে, পরিষ্কার গলায়:

'মানুষ হচ্ছে ফুলের মতো। জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে সুরু করে মরতে। সমস্ত জীবন ধরে সে মরছে, দিনের পর দিন খোয়াচ্ছে তার রক্তাভা। মরতেই সে এসেছে—' প্রহর হেসে উঠলো একটি বিদেশী সৈন্যের বিস্ময়বিস্তৃত মুখব্যাদান। 'হ্যাঁ, ফুলেরই মতো মানুষ। সূর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে যখনই তার চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে তখন সে আর আলো চায় না, চায় অন্ধকার। কি করে যে ঘটে তা আস্তে-আস্তে, তাকিয়ে থাকতে অবাক লাগে।'

'ও তোমার ভুল, প্রহর-খুড়ো।' তপ্ত ভস্ম থেকে সিগারেট ধরিয়ে বললে য়ুডা। তার চাপা ঠোঁট হঠাৎ কি-রকম সরু দেখালো। 'আমি জানি এমন একটা ঘটনা যা তোমার উপমার সঙ্গে মেলে না।'

রাত্রির এখনো অনেক বাকি, আর 'কাশা' এখনো সুরু করেনি ফুটতে।

এজমালি পাচক এফিম সুপোনিফ কাঠের চামচ দিয়ে নাড়ছিলো 'কাশা' আর গাল দিচ্ছিলো আগুনের তাপকে। গল্প বলবার জন্যে য়ুডাকে পেড়াপীড়ি করবার দরকার ছিলো না। তার ককেসাসের চামড়ার বেল্টে একটু টান মেরে সুরু করলো সে বলতে :

সাইবেরিয়ার আবহাওয়া।

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেন বোঝাই করে। গত বছরের কথা। এক দিন কমিশার এলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

'মেয়েদের সঙ্গে ব্যাপার কিছু থাকে তো সেরে নাও শিগগির। কাল ছাড়তে হচ্ছে আমাদের ভলগ্ড।'

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম চললো তখুনি। ভোরবেলা বন্দুকের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিলাম, রওনা হলাম স্টেশনের দিকেই, ট্রাকে করে। সামনের দিকে ঘোড়া, পিছনে আমরা। ঘোড়াগুলোর তদারক করছি আমরা চার জন। সঙ্গে ছিলো মদ আর মেয়ে। ফুর্তিতেই কাটছিলো, স্টেশনে থাকলাম দুদিন, পরে সুরু করলাম বরফ ভাঙতে।

ঘটনাটা ঘটেছিলো আঠারোই ডিসেম্বর। মনে হয় যেন কাল। চলছি চলার আনন্দে, যখন অনর্গল বরফ তখন আগুন করছি। কর্কশ হাওয়া বইছে দিনের বেলায়, রাত্রে তা ঠাণ্ডার চাবুক হানছে। মেয়েরা ছিলো বলেই সে-সব রাত্রি আমরা পেয়েছিলাম কিছু তাপ আর আলো। কখনো-কখনো তারা বলতো : 'তোমাদের গাড়িতে আমাদের নিয়ে চলো।' কখনো বলতো : 'কিছু রুটি দাও খেতে।' কখনো বা : 'আমার স্বামীর কাছে আমাকে নিয়ে চলো না।' গাড়িতে, দরজার কাছে দাঁড়াতাম আমরা চারজন, বলতাম, 'আমাদের গাড়িতে আসতে তোমাদের ভয় করে না? আমরা চার জন আছি—ঘুমুচ্ছি আমরা এখন।'

তাদের সবাইরই মুখে এক উত্তর : 'মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন কী আর করা যাবে, বলো ? ওই আমাদের অদৃষ্ট।' 'বেশ, তাই যদি তোমাদের অদৃষ্ট, তবে চলে এসো ভিতরে।' এ কে না জানে, সৈন্য হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে হুলো-বেরাল, কিম্বা যদি বলতে চাও, সব চেয়ে বেপরোয়া।

এক দিন দাঁড়ালাম এক স্টেশনে। বরফ-জমানো রাত, বরফ পড়ছে না তো, কে যেন ছুঁড়ে মারছে তাল-তাল। কখনো পড়ছে, কখনো থামছে, আবার পড়ছে। এঞ্জিনটা থামলো জল নিতে। আমাদের দুজন গেলো কিছু কাঠ জোগাড় করতে স্টোভের জন্যে। আমিও উঠে বাইরে গেলাম। 'কী নাম এই স্টেশনটার ?' কে যেন কী বললে, শোনালো : 'বুলটিহাই।' আধ-জাগা অবস্থায় ছিলাম বলে স্পষ্ট বুঝলাম না নামটা। ট্রেন চললো স্টেশন ছাড়িয়ে আর যত রাজ্যের বাজে লোক আমাদের ছেঁকে ধরলো।

আমাদের সঙ্গে একটা বুড়োর প্রায় ঘুসোঘুসি হবার জোগাড়। 'আমাকে ঢুকতে দাও।' বলে দরজায় সে গুঁতো মারতে লাগলো কাঠের পা দিয়ে : 'আমি গরম মাঠের উপর শুয়ে মরতে চাই। আমার অধিকার আছে ও রকম মরার। এক দিন আমি দেশকে বাঁচিয়েছিলাম যুদ্ধ করে।' কিন্তু কি করে বোঝাবে তুমি এক বধির বৃদ্ধকে যে, যে-মরে গেছে তার অধিকার নেই ট্রেনে চড়ার। আমাদের মধ্যে একজন—আরিস্টার তার নাম—কী ভীষণ রসিক, বললে বুড়োকে : 'দৌড়ে ছুটে চলে যাও, নইলে তোমাকে গিলে খাবো।' বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো : 'আমাকে খেতে পারো না তুমি গিলে।' বললে বুড়ো। 'এ হতেই পারেনা। আমি আমার দেশের সেবক। পেয়েছি তিনটে মেডেল আর একটা ক্রশ।' আরিস্টার বললে, 'দেশ-টেশ বুঝি না, আর মেডেল যদি তোমার রূপোর হয়, বেচতে পারো তা হলে, আর আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে পারো দু-এক ঢোঁক।'

আমাদের গাড়ির মধ্যে বুড়ো মেয়েগুলোও ঢোকাতে লাগলো নাক। তাড়িয়ে, খেদিয়ে দিলাম সবগুলোকে। বুড়ো মাংসে চর্বি কোথায়?
তারপর আরো দুটো মেয়ে এলো। মনে হলো জু-র মেয়ে। মা'র এক জোড়া গোঁফ আছে, তাছাড়া আর সব ঠিক। মেয়েটা—বয়স অল্প—ভারি খাসা দেখতে, ছিপছিপে, খাগড়ার মতো সিধে। তার নাক ও মুখের কাছটায় কী একটা দুষ্টু-দুষ্টু ভাব। ঠিক এই সময় চাঁদ এসেছে উঠে আর সেই চাঁদের আলোয় আমি দেখতে পেলাম ওদের দুজনকে। সব চেয়ে আসল কথা হচ্ছে এই, ওদের সঙ্গে বেশি মাল নেই, মা'র সঙ্গে ছোট একটা পুঁটলি, আর মেয়ের হাতে ছোট একটা থলে।
'অন্তত পরের স্টেশন পর্যন্ত যেতে দেবে আমাদের?' ভিক্ষে করলো দুজনে, কী একটা শহরের নাম করলো। আরিস্টার কথা বলছিলো ওদের সঙ্গে, আর আমি কাছে দাঁড়িয়ে বুক চুলকোচ্ছিলাম, এখন যেমন করছি। ছোট মেয়েটাকে আরিস্টারের মনে হলো মনের মতো। বললে, 'উঠে এসো, উঠে এসো। আমাদের ঘুমোবার এই গাড়িটা ঘোড়ার গন্ধে ভর্তি, তবে বেশ গরম, না থেমে চলবে অনেক দূর।' দরজা খুলে দিলো ফাঁক করে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বদ্ধ হাওয়া।
আমি দাঁড়ালাম ওর মুখোমুখি।
'আমাদের না জিগগেস করে তুমি কাজ করো কেন? আমরা সবাই একত্র হয়ে আলোচনা করে আগে ঠিক করবো।'
কিন্তু ও আমার দিকে চেয়ে চোখ মটকালো। 'খুশি হবে। বাধা দিও না।'
ওদের দুজনকে ও টেনে তুললো গাড়ির মধ্যে, মেয়েটাকে আস্তে মা-টাকে হেঁচকা টান মেরে। এত জোরে টান মেরে যে বেচারা পড়লো মুখ থুবড়ে। আমাদের আরিস্টারের সব সময়েই চাই একটা হাসির খোরাক।

খানিক পর স্কুলের একটা ছাত্র এলো ছুটে। ষোল-সতেরো বছর বয়স হয়তো হবে, কাঁধের উপর ছোট একটা বস্তা বাঁধা। আধ-খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো সে হাত। আমাদেরকে কিছুতেই সে বন্ধ করতে দেবে না দরজা। সে বললে কোত্থেকে তার কিছু রুটি সংগ্রহ করতেই হবে যে করে হোক। তার মা না বোন, ঠিক মনে নেই, না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। প্রহারজর্জর মেয়েছেলের মতোই সে কাঁপছে। 'আমাকে ঢুকতে দাও।' আমরা হেসে উঠলাম ওর কান্না শুনে—এ ওর একটু বেশি আবদার নয়? ও সরে গেলো আর আমরা দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। আগেই স্টোভ নিয়েছে ধরিয়ে। বাইরে ঝড় উঠেছে, তুষারের ঝড়। মেঘের ফাঁকে চাঁদ, আর হাওয়া ছুটেছে শনশনিয়ে। কিন্তু আমাদের গাড়ির মধ্যে বেশ গরম। আমার জীবনে, আগে কিংবা পরে, এমন মধুর উষ্ণতা আর কেনো দিন পাইনি। 'কী চমৎকার গোল দেখাচ্ছে চাঁদকে,' ভাবলাম মনে-মনে, 'কিন্তু কেন ও আকাশে একা-একা বসে আছে বোকার মতো?'

হঠাৎ চোখ পড়লো জানলার কাচের বাইরে লোহার রেলিঙের উপর একখানা হাত, সেই স্কুল-ছাত্রের হাত, তার সেই ধূসর জামার খানিক অংশ। কী হয়েছে বুঝতে পারলাম নিমেষে। সংকীর্ণ পা-দানিতে কোনো-রকমে পা আটকে রাখবার প্রয়োজন থেকে নিজেকে সে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, তাই ঝুলে আছে রেলিং ধরে।

তলোয়ার দিয়ে কাঠ ফাড়তে লাগলাম। আরিস্টার মা-টাকে তার বিছানা ছেড়ে দিলো, একটা কাঠের খণ্ডের উপর বসলো মেয়েটাকে পাশে নিয়ে আর সুরু করলো গল্প: কোথায় তার বাড়ি, কী তার নাম, তার থলের মধ্যে কী আছে—এই সব। প্রথম-প্রথম মায়ের দিকে মেয়ে তাকাচ্ছিলো সপ্রশ্ন চোখে, কিন্তু আস্তে-আস্তে সাহসী হয়ে উঠলো। খুললো তার

থলে—তার মধ্যে একটি বেহালা, প্রায় তারই মতো হালকা আর সরু আর তারই মতো ছোট্ট নাক।

'বা, তুমি বাজাতে পারো ?' আরিস্টার বেরালের মতো এক চোখ বুজে বললে। 'চমৎকার হয়েছে—ধরো একটা প্রেমের গান। আমাদের পেট্রুভ বালালাইকা নাচতে পারে। আমরা বোকা বলেই হয়তো তারিফ পায়।'

'আর কাউকে বোকা থাকতে হবে না।' মেয়েটা হাসলো : 'সব শিগগির বদলে যাবে, ভালো হয়ে যাবে—সকলকেই শিখতে হবে লেখা-পড়া।'

'পড়তে হলে তোমরা পড়বে, আর আমরা সেই শশা খাবো।'

মেয়েটা শুধু হাসলো আর রুমালে মুছলো তার ছোট নাক।

আরিস্টার তারপর গেলো ঘোড়ার ঘরে, ডাকলে আমাদের সেখানে, অন্ধকারে। বললে, 'নাও কতকগুলো দেশলাই, লটারি করা যাক কে প্রথম স্নুরু করবে।' একটা টুপির মধ্যে চারটে দেশলাই ফেলা হলো। পেট্রুহার হয়ে ইভান তুলবে।

ইতিমধ্যে পেট্রুহা গিয়ে বসেছে মেয়েটার পাশে। পেট্রুহা, তোমরা জানো, মোটেই ভালো কইয়ে-বলিয়ে নয়, তাই সে মেয়েটাকে বললে বেহালা বাজাতে। দেশলাই তোলা তখন সবে শেষ হয়েছে—আমারই পড়েছে প্রথম পালা—হঠাৎ বাজনা বেজে উঠলো। অন্ধকার কোণ থেকে লাফ মেরে চলে এলাম, দাঁড়ালাম স্তম্ভিতের মতো। বেহালা বাজাচ্ছে মেয়েটা, তার চোখ স্টোভের জ্বলন্ত কয়লার দিকে। আওয়াজটা ভারি সরল ও কোমল, যেন কি-রকম পেয়ে বসে তোমাকে! বসলাম একটা কাঠের ভেলার উপর। 'অপেক্ষা করবো, যতক্ষণ না শেষ হয় বাজনা।' ভাবলাম মনে-মনে। ছেলেবেলা থেকেই শিখেছি এই সহিষ্ণুতা।

কী নেই সেই বাজনাতে! সহজেই কল্পনা করে নিতে পারো, তোমার সামনে গোলাপ ফুটছে, গোল আর মোলায়েম। গুঁফো স্ত্রীলোকটা নাক

ডাকাচ্ছে ঘুমের মধ্যে, আর তার মেয়ে বাজিয়ে চলেছে বেহালা, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে সে পাখার শব্দ করতে-করতে। সেদ্ধ ডিমের মতো চুপ করে বসে আছি আমি, হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছি না, কি রকম লজ্জা বোধ হচ্ছে।···আর ঐ ছোট্ট বেহালাটা এত ঠুনকো, একটা আঙুলের ঘায়ে সেটাকে তুমি ভেঙে ফেলতে পারো, অথচ কী আওয়াজ ওরি মধ্যে। এত বিশ্রী লাগছিলো আমার যে প্রায় কান্না পাচ্ছিলো। ছুটে ফিরে গেলাম আরিস্টারের কাছে। ঘোড়াগুলোর কাছে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ একেবারে শাদা যেন ঝাঁকানো বোতলের মতো, তলানি সব গেছে উঠে।

এমন সময় আমাদের ট্রেনটা চলে গেলো এক পুলের উপর দিয়ে, আর পুলটা গড়গড় ঝরঝর খটাখট করে উঠলো।

'আমাকে শোনাবার জন্যে বাজাচ্ছে এ-বাজনা।' চুপিচুপি বললে আরিস্টার, কিন্তু আমার কান নেই ওর কোনো কথায়, আমার মুখও হয়তো চুপসে শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ কী যেন আমার দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেলো জানলার দিকে। গেলাম এগিয়ে, দেখলাম লোহার রেলিঙ ঠিক আছে, কিন্তু সেই হাত নেই।

পরের স্টেশন পর্যন্ত মেয়েটা বাজিয়ে চললো সমানে। আর সবাইর চেয়ে আমারই বেশি বিশ্রী লাগছিলো। বাইরে বাতাস বইছে যেন ছুরির ফলার মতো। গাড়ির কাঠের ফাঁক দিয়ে এসে সে-বাতাস যেন গায়ে ফোসকা ফেলছে।

'চালাকি করে বাজাচ্ছিলো ও বেহালা।' বললে আরিস্টার পডপ্রাটফ।

'আমাদের লজ্জা দিতে' বললে যুডা।

'বাজে মেয়ে, সবাইকে কাঁদিয়ে ছাড়লে।' 'কাশা'র মধ্যে খানিকটে গলানো চর্বি ঢেলে বললে এফিম স্থপোনিয়েফ।

'ছেলেটা তাহলে লাফিয়ে পড়লো?' কিছুক্ষণ পরে জিগগেস করলে প্রহর স্টাফিয়েফ।

'হ্যাঁ, লাফিয়ে পড়লো!' বললে য়ুডা, ঠাট্টা করে, তার দুই গালে ছড়িয়ে পড়লো রাগের রক্তিমা।

জঙ্গলের নিচে আগাছার ঝোপে ডাকছে কোনো রাতের পাখি। সেই ডাক শুনে ভুরু কুঁচকে তাকাতে হয়, কিছু দেখা যায় কিনা।

'তৈরি হয়েছে কাশা।' বললে রাঁধুনে, কাঠের চামচ চেটে। আগুনের ভাপে খিদে পাইয়ে-দেয়া গন্ধ।

কন্‌স্টান্টিন্‌ ফেডিন্‌

নারোভচাট-এর ইতিকথা

আজ, ইস্টকারি, শহরের গির্জের আগের যাজক, এসেছিলো আমাদের ছেলেদের আশ্রম দেখতে। সম্প্রতি সে টাউন-রেজিস্ট্রারের আফিসের বড়োবাবু। কী ভয়ংকর লাগছে তাকে দেখতে। কেটে ফেলেছে তার লম্বা চুল, পরেছে খাটো জ্যাকেট, হাতে গাছের ছিলকেতে তৈরি সিগারেট-কেস।

দেখা করলো সে ফাদার রাফায়েলের সঙ্গে।

'কোনো একটা বিষয়ই আপনি বিশেষ ভাবে শেখেননি যে কিছু করবেন। সাধারণ পাদরি মঠের পাদরির চেয়ে ভালো—বিপ্লব সত্ত্বেও বিয়ে হচ্ছে তাদের, ছেলেপুলে হচ্ছে। আর মৃত্যু, সে তো বেড়েই চলেছে। যখন এই মঠ তারা বন্ধ করে দেবে তখন আপনি যাবেন কোথায়? আপনার পাদরির টুপিটা বুঝি খুব এঁটে বসেছে আপনার মাথার উপর?'

'মন্দ কি', বললে ফাদার রাফায়েল মিহি গলায়, 'অভ্যেসই তো দ্বিতীয় প্রকৃতি।'

'আমি এসব কুসংস্কার আর সমর্থন করি না।' বললে ইস্টকারি। 'এ হচ্ছে একেবারে স্থূল নির্বুদ্ধিতা।'

আমাদের প্রদেশের রাজধানী থেকে শুনেছি স্থানীয় সোভিয়েটের অধিপ আর তার সম্পাদক এসেছে। আগে ছিলো যা প্রমোদ-উদ্যান, নাম 'সব পেয়েছির দেশ' সেখানে এখন হয়েছে জনগণের বাগান! তারই

সামনেকার রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম ওদের।

অধিপতি নিতান্ত কৃশ, প্রায় স্বচ্ছ বলা যায়। থেকে-থেকে কাশছে আর চোখ ছোট করছে, হয়তো চোখে কম দেখে, কিংবা স্রেফ মুদ্রাদোষ। পরনে নাবিকের পোশাক, চলছে যেন ফুর্তিতে পা ফেলে। তার পাশে তার সম্পাদক, বেঁটে নাদুসনুদুস, শাদাটে ভদ্র মুখ, অল্প বয়েস। প্রাক্তন ছাত্রের টুপি তার মাথায়, রঙ-ওঠা সুতো-বের-করা। তার ভঙ্গিটা মোটেই কঠোর নয়।

আমি ভেবে দেখছিলাম ফাদার স্থপিরিয়রের সেই কথাটা : অভ্যাস। নিরীহ অথচ সর্বনেশে কথা। অভ্যাস। মানুষের উপর অভ্যাসের কী প্রবল নৃশংস শক্তি ! হঠাৎ, নিজেরো অজানাতে, আমাদের পুশকিনের কথা মনে পড়ে গেলো। সমস্ত বিদ্রোহ-বিপ্লব পেরিয়ে এসেও সে কেমন তার রহস্যময় অদৃষ্টবাদের পথ ধরেই চলেছে! তার জীবনকে শাসন করছে যে কল্পনা সে কি তা ত্যাগ করতে পারে ?

যাক, খুলে বলতে হবে এই পুশকিনের জীবন কথা আরো বিস্তৃত করে। নাম আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিন, এই শহরে আছে সে অনেক বছর ধরে। পূর্বপুরুষ চাষা, প্রাথমিক কোনো ইস্কুলে চার বছর পড়েছিলো —তার জীবনী সম্বন্ধে এর বেশি আর কারু জানা নেই। কেউ বলতে পারে না কোত্থেকে এসেছিলো সে নারোভচাটে। সঙ্গে তার স্কুলের সার্টিফিকেট, বয়েসটি কিন্তু তার স্কুলের অনেক উপরে। রেলের মাল-গুদামের আফিসে সে কাজ করতো, বিল-লেখার কাজ। ঠিক সময়ে আফিসে আসাটাই তার একটা কীর্তি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চোরা-ঘরে অন্ধকারে বসে একটানা কাজ করে যাওয়া। মাঝে-মাঝে কাঠের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসতো তার হাত, বিল পাশ করবার সময়। কেউ দেখতে পেতো না তাকে, দিনের বিশেষ খানিকটা সময় ছাড়া।

প্রকৃতি যদি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করতে চায়, কী মর্মান্তিক রসিকতাই

না করতে পারে! নইলে আমাদের সেই মৃত বিখ্যাত কবির চেহারার সঙ্গে এই চাষার চেহারার এমন মিল হবে কেন, যে প্রাথমিক স্কুলে চার বছরের বেশি পড়েনি? কী এমন দুর্ঘটনা, যে, চেহারার মিল ছাড়াও নামেও এর মিল হবে সেই আলেকজাণ্ডার সেরগেইয়েভিচ পুশকিনের সঙ্গে। অন্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে প্রকৃতির নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত ঘটেছিলো, আর তার ফলে একটা লোককে নিয়ে এই স্থূল রসিকতা! নারোভচাট শহরে এ. এস. পুশকিনের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পর আরেক এ. এস. পুশকিন!

অদ্ভুত সাদৃশ্য এর সত্যিকারের পুশকিনের সঙ্গে। সেই মাঝামাঝি রকমের লম্বা, মোটাসোটা গড়ন, প্রায় কালো কোঁকড়ানো চুল। গালের দুপাশে দাড়ি, মুখে, নাকের উপরে, সেই ছোট থ্যাবড়া নাকের উপরে, অল্প-অল্প বসন্তের দাগ। ঠোঁট দুটো ভারি, ভিতর দিকে ঢোকানো। যাদের কবি পুশকিনের ছবির কথা অস্পষ্টভাবেও মনে আছে তারা নির্ঘাৎ চমকে উঠবে নারোভচাটে এই তার প্রতিলিপি দেখে।

হয়তো বা কেউ তত লক্ষ্য করতো না যদি না আফানাসি সেরগেইয়েভিচ বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াতো।

থাকতো সে ভাকুরফের বাড়িতে। ভাকুরফের ধারণা ছিলো আমাদের এ শহর হবে রাশিয়ার শিকাগো, তাই সে একটা ঢাউস চারতলা বাড়ি ফাঁদলে। এত উঁচু বাড়ি কেউ দেখেনি আমাদের পাড়ায়। আমাদেরই শহরের রাজমিস্ত্রিরা খাটলো সে বাড়ির পিছনে, বাড়ি তৈরির পর দেখা গেলো সিঁড়ি তৈরি করতেই ভুল হয়ে গেছে। শেষকালে বাইরে থেকে সিঁড়ি তোলা হলো। পিছনের দিকে লোহার লম্বা ঘেরা বারান্দা, দরজা আছে সারি-সারি, জানলা নেই একটাও। ও-বাড়ির পর একটাও বাড়ি হলো না আর কাছে-ভিতে, শিকাগোর স্বপ্ন গেলো মিলিয়ে ভাকুরফের মৃত্যুর সঙ্গে। তবু যে কেউ আসে এই শহরে, স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে

থাকে সে দৈত্যকায় অন্ধকূপের দিকে।

সেই ভাকুরফের বাড়িতে, উপর তলায়, কোণের ঘরে থাকে আমাদের আফানাসি সেরগেইয়েভিচ। শুধু আফিসটুকু ছাড়া তার বাকি জীবন নিঃসঙ্গ, অবস্থৃত। সপ্তাহে এক দিন, রবিবারের সন্ধ্যায়, নারোভচাটের বড়ো রাস্তা যখন গিসগিস করছে লোকে, স্কুলের, পোস্টাফিসের, আর হরেক রকম দোকানের ছেলে-মেয়েতে, তখন সে আসতো সে-রাস্তায়, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ভয়ংকর তাড়াতাড়ি হাঁটতো ফুটপাত ধরে, সামনের দিকে শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, পিঠের দিকে দুহাত একত্র করে। নিশ্চয়ই তখন তোমরা দেখে থাকবে আফানাসিকে। তখন জ্বলছে তার কালো চোখ, তার মহৎভাবময় মুখে সংকল্পের দৃঢ়তা, তার পা মাটি স্পর্শ করছে কি করছে-না। তার পোশাক ঠিক আলেকজাণ্ডারের পোশাক, প্রথম নিকোলাসের সময়কার ওভারকোট, কোমর পর্যন্ত ঝোলানো স্কন্ধাবরণ, আর মাথায় লম্বা শক্ত টুপি। শুধু একবার সেই বিস্মিত জনতা ভেদ করে তার যাওয়া—রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত—তার চলার দ্রুতিতে নড়ছে সেই কাঁধের ঢাকনিটা—আর তার চেহারার সঙ্গে মৃত কবির চেহারার সাদৃশ্য দেখে সবাই থ হয়ে যাচ্ছে।

'পুশকিন, পুশকিন, পুশকিন!' হাজার-হাজার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এই ধ্বনি।

কেউ বলছে ঘৃণায়, কেউ বা ঠাট্টায়, কেউ বা সপ্রশংস কণ্ঠে। কেননা আমাদের শহর খুব ছোট, তাই, স্বভাবতই, নারোভচাটে যারা মানুষ হয়েছে আফানাসি সেরগেইয়েভিচ সম্বন্ধে তাদের দেমাক খুব। প্রায়ই তার পিছু ধরতো ছোট ছেলেরা, যদিও তার পায়ের সঙ্গে পা মেলাতে পারতো না, আর সমস্ত পথ প্রতিধ্বনিত করতো ডেকে ডেকে:

'পুশকিন! পুশকিন!'

কারু দিকে না তাকিয়ে, কোনো কিছু লক্ষ্য না করে সোজা চলে যেতো

আফানাসি। কখনো-কখনো আফিসের সহকর্মীরা ডাকতো তাকে বিদ্বেষবশে : 'এসো আফোনিয়া, চলো, কিছু বিয়ার খাওয়া যাক।'
ততক্ষণে আফানাসি অদৃশ্য হয়ে গেছে পথের প্রান্তের শেষে আর চোরের মতো ঢুকে পড়েছে ভাকুরফের বাড়িতে, অন্ধকারে পিছনের রাস্তা দিয়ে।
এত বড়ো বিপ্লবও বন্ধ করতে পারেনি তার অভ্যাস, এই নিয়মিত রবি-বারের সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো। গত দুবছর ধরে এই বড়ো সড়কে কেউ বেড়ায়নি, বেড়াবার অবসরও কারু ছিলো না। যুবকেরা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্যুদ্ধের দরুন, মেয়েদেরো আর রাস্তায় বেরিয়ে চিত্তবিনোদন করবার সময় নেই। আজকাল জনসাধারণের জীবন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন, যদি ও সন্ন্যাসীর জীবন আজ হেয় সবাইর চোখে। রাস্তার এতো বড়ো বিবর্তনের বিন্দুমাত্র খবর না রেখেই আফা-নাসিসেরগেইয়েভিচ ঘুরে বেড়ায় রবিবারের সন্ধ্যায় ঠিক আরেকজনের রহস্যময় প্রতিমূর্তি হয়ে।

কাল রাতে, রকটফের কাছে যাবার পথে আনটিপ সাঁডনফের সঙ্গে দেখা হলো। পথে-ঘাটে বিশেষ লোক নেই, দূর থেকেই চিনতে পারলাম তাকে। পড়ি মরি করে হাঁটছিলো।
'কি হে, ইগনাটি', আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো বার কতক, 'কেমন চলছে ?'
'যথাপূর্বং।'
'আর আমি ? আমি, এখন কবিতা লিখছি। গত রাতে লিখেছি একটা —চমৎকার ! শোনো শেষের কটা লাইন :

আর তাই আমরা যাই
আমরা যাই আমরা যাই

শুধু যাই আর যাই
শুধু যাই আর যাই।

যেন মনে হয় ঘণ্টা বাজছে, তাই না? আমি যাচ্ছি এখন কাগজের সম্পাদকের আফিসে, যাতে একটা আবেদন ছাপা হয় দেশের সমস্ত গাইয়েদের মহলে, আমার এই কবিতাটায় সুর দেবার জন্যে।'

আনটিপ সাডনফ দম নিলো, মুখ মুছলো, আবার দ্বিগুণতরো উৎসাহে বললে উত্তেজিত হয়ে: 'ও ইগনাটি! কবিতা লেখা! কী ভীষণ উত্তেজনা—'

হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেললো আনটিপ। পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে কি যেন দেখতে লাগলো সামনে। পিছন ফিরে দেখি জোরে-জোরে পা ফেলে আফানাসি সেরগেইয়েভিচ আসছে আমাদের দিকে। রাস্তা ধরে ওর হাঁটা অভ্যেস, আজ হাঁটছে ফুটপাত ধরে। লাল দেখলে যেমন সাঁড় ক্ষেপে, তেমনি যেন ক্ষেপলো আনটিপ, এক লাফে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পথ আটকে।

'থামো, থামো, থামো বলছি।' ওর জামা ধরে চেঁচিয়ে উঠলো আনটিপ। আফানাসি সেরগেইয়েভিচের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো। দাঁড়ালো নিশ্চলের মতো। আর সেই মুহূর্তে দেখলাম কী আশ্চর্য মিল আমাদের সেই প্রিয় মৃত কবির সঙ্গে। ওর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না।

'এত দিনে পেয়েছি তোমাকে, ছোটলোক চোর কোথাকার।' আনটিপ আঁট করে টেনে ধরলো তার জামা। মুখের কাছে মুখ এনে ধমকে বললে, 'চুপ করো।' যদিও আফানাসির মুখে কথা বলবার সামান্যতম চেষ্টাও দেখা গেলো না।

'জানো, তোমার সঙ্গে কে কথা বলছে? আনটিপ সাডনফ, জনগণের কবি, যে লিখেছে অসংখ্য কবিতা আর তার মধ্যে একটি অন্তত থাকবে

অবিনশ্বর। আমার কবিতায় এবার গান হবে। আমার ভেতর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জাতি তার মর্মবাণী প্রচার করবে, তার গোপন স্বপ্ন। আর, তুমি কে ? তুমি কী ! জীবনে এক লাইনও কবিতা লেখনি। তবে তোমার কী অধিকার আছে পুশকিনের মূর্তি ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াও ? কী আস্পর্ধা তোমার, তোমার এই কদর্য চেহারায় সেই জনগণের কবিকে মনে করিয়ে দাও ? লজ্জা করে না তোমার ?'

আফানাসি সেরগেইয়েভিচের কাঁধ ধরে এমন ঝাঁকানি দিতে লাগলো আনটিপ যে তার মাথার উপরে টুপিটা নাচতে সুরু করলো আর আমি, আমি আফানাসির অবিস্মরণীয় মুখে বেদনার ম্লানিমার দিকে চেয়ে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, কী যে করবো কিছুই ভেবে পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম সেই অপমানিত লোকটার চোখ থেকে বড়ো-বড়ো দুফোঁটা অশ্রু পড়ি-পড়ি করছে। যেন সমস্ত বাস্তব থেকে দূরে, কী এক দুঃখের কল্পনায় বিভোর ও বিষণ্ণ, শুধু শারীরিক এই ক্লেশ ছাড়া আর কোনো বোধ নেই তার চেতনায়। আমার ভারি কষ্ট হলো, গেলাম বাধা দিতে, শেষ করে দিতে এই মূর্খ অভিনয়, কিন্তু আফানাসি সেরগেইয়েভিচ হঠাৎ নিজেকে আততায়ীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেলো উলটো পথ ধরে। জীবনে এই হয়তো প্রথম আফানাসি সেরগেইয়েভিচ তার অভ্যস্ত পথ ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গেলো।

আনটিপ সাডনফের দিকে দৃকপাত না করে, একটাও কথা না বলে আমি চলে গেলাম।

কমিশার রকটফের সঙ্গে দেখা হলো তার বাড়ির সামনেকার ক্ষেতে, অন্ধকারে শশা ছিঁড়ছে। ঘরের ভিতরে গিয়ে সে আলো জ্বালালো, দেখলাম গায়ে ওর ছিটের শার্ট, প্যাণ্টের নিচে ঢোকানো। আরো বেড়েছে ভুঁড়ি, আর তার চোখ—কী বলবো বলো ! যখন গির্জের ছুটির

দিনে আমাদের মঠে জমায়েত হতো অনেক খোঁড়া আর ভিখিরী তখন দেখেছি অনেক চোখ যা দেখে ভয় আর বিতৃষ্ণা হতো মনে-মনে। রকটফের দৃষ্টি তার চেয়েও দুর্দশ। কাকের চোখের চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু তার চার দিকে শাদা গোল চক্কর, নাকটা অস্বাভাবিক লম্বা আর মোটা।

'কী হে, কেমন চলছে হে সাধু?' ওর চোখ আমার দিকে তাকিয়ে, তবু যেন আমার দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে নয়। 'মঠ শিগগিরই ছেড়ে দিচ্ছ তো? ছেড়ে দিলে তোমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তুমি নিজে তো আর সন্ন্যাস নাওনি, যদিও পরেছ তুমি ক্যাসক। শিগগিরই এক দিন যখন বন্ধ হয়ে যাবে—'

'কিছু শুনছো সে সম্বন্ধে?'

'শোনাশুনি নয়। নির্ঘাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাদের দালানটাতে বসাবে ওরা হাসপাতাল।'

'হাসপাতাল—কী বলছো তুমি যা-তা?'

'বোকার মতো কথা বোলো না।' বললে কমিশার, 'কোথায় বাস করছো আজকাল জানো না? কোন দেশে? কী ঘটেছে তোমার চার পাশে দেখতে পাচ্ছ না কিছু? এখনো তুমি লালফৌজে ঢুকে পড়োনি কেন, কুঁড়ের বাদসা কোথাকার।'

'জানো তো আমার পা দুটো চ্যাপটা, ডাক্তারি পরীক্ষায় আমি বাতিল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি বলছো আমাদের মঠকে ওরা হাসপাতাল বানাবে?'

'তাতে তোমার কী এসে যায়? এই নাও, এইটে খেয়ে ফেলো।' একটা বোতল থেকে কী খানিকটা তরল জিনিস ঢাললো গ্লাশে। 'কী, খাবে না? আচ্ছা, দেখো একদিন, কেমন খেতে হয় তোমাকেও।'

মুখের মধ্যে এমন ভাবে ঢালছে যেন গলাটা ওর একটা খোদল বা সুড়ং,

একবারো একটু ঢোক গিলতে দেখলাম না। খাচ্ছে, পা দোলাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কামড় দিচ্ছে কাঁচা শশায়। বলছে:
'কী জাতের মদ বুঝতে পাচ্ছি না। বাগানের পোকা নষ্ট করবার জন্যে পাঠিয়েছিলো আমাকে, বলেছিলো, খুব জোরালো আরক। যদিও থুতু ফেলতে হয় সারাক্ষণ, তবু কি রকম চোখ দুটো একটু ঘোলাটে করে। তুমি বরং কাল এসো সিমফোরিয়ানের ওখানে। হাসপাতালের বিষয়, অধিপতির বিষয় গল্প করা যাবে। কর্তা ভয়ানক কড়া—যাক সে পরে হবে'খন। আমি এখন শোব, এখুনি আমার বমি হয়ে যাবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাও শিগগির।'
আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে সে বার করে দিলো।
রাত অনেক হয়ে গেছে বলে অন্ধকার চোরা গলি দিয়ে না গিয়ে চললাম বড়ো রাস্তা দিয়ে। সোভিয়েটের নতুন প্রেসিডেন্টের বাঙলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম জানলার কাছে। শাদা পরদা ঝুলছে, দেখা যাচ্ছে ভিতরে জ্বলছে আলো আর তার সামনে বসে আছে এক নিশ্চল মানুষ-মূর্তি। শহরের অর্ধেকই এখন ঘুমে। শুধু কয়েকটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে এখানে-ওখানে। এমনিতে আমি ভীতু নই, কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকস্মিক ভয় আমাকে গ্রাস করলো। ঐ অপরিচিত লোক, আলোর ছায়াতে কঠিন কালো রেখা তার সেই নিশ্চল মূর্তির। হঠাৎ কে যেন আমার পিছন থেকে চাপা গলায় আমাকে ডাকলে: 'কমরেড ইগনাটি!'
তাকালাম পিছন ফিরে। কেউ নেই কোথাও। ভয়ে আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো, প্রার্থনার মন্ত্র বলতে-বলতে বাড়ি ছুটলাম।

বললাম ফাদার রাফায়েলকে যে আমাদের মঠ নিয়ে যাচ্ছে ও তাতে সৈন্যদের হাসপাতাল করবে। ফাদারের মুখ পাংশু হয়ে গেলো, মুখে

উদ্বেগের গভীর রেখা। হাঁটু গেড়ে বসলো প্রার্থনা করতে ঃ

শোনো হে প্রভু, হে ন্যায়াধীশ, শোনো আমার অভিযোগ,
আমার প্রার্থনা···
তোমার পাখার আবরণে ঢেকে ফেলো আমাকে এই পাপ ও
অপবিত্রতার স্পর্শ থেকে ঃ
আমাদের সব দিকে ওৎ পেতে আছে ওরা
সিংহ যেমন শিকারের লুব্ধতায়—
প্রভু হতাশ করো ওদের, নিপাতিত করো,
তোমারই অসি-প্রহারের মতো তীক্ষ্ণ যে এ-পাপ
তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে।

নুয়ে পড়ে তিন-তিনবার কপাল ঠেকালাম মাটিতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ফাদার সুপিরিয়র, 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এক গাছা চুলও আমার পড়বে না। যাও ইগনাটি, ভালো করে জেনে এসো কী দুর্ভাগ্য আছে আমাদের এই মঠের অদৃষ্টে।'

রুমালে বেঁধে নিলাম কিছু খাবার আর চললাম শহরে।

শহরে এসে কিছুরই হদিস পেলাম না। শেষে মনে হোলো কমিশার রকটফ আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে। বিকেলে গেলাম সিমফোরিয়ানের বাড়ি।

আগের যাজক ইস্টকারি আর সিমফোরিয়ান তুমুল ঝগড়া করছে ঘরের মধ্যে। বুঝলাম, ঠিক সময়ে আসিনি। কিন্তু চলে যাবো ভাবছি হঠাৎ এক বিপুল ধাক্কায় ঘাড় ধরে ইস্টকারিকে বার করে দিয়ে সিমফোরিয়ান আমাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলো। সবলে দিলো দরজা বন্ধ করে।

নাকে লাগলো একটা জোরালো সুগন্ধ। প্রায় মূর্ছা ঘটাবার মতোই

তেজী। টেবিলের উপর দেখলাম সাজানো গ্লাশ, দুধ-ভর্তি, আর একটা রেকাবে সেদ্ধ সাজানো আলু। ঘরের মধ্যে আরো একজন লোক বসে—আমাদের কমিশার রুকটফ। ছিটের শার্ট গায়ে, বেল্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার ভুঁড়ি, চোখ বোজা। পাশের ঘরে চকিতে দেখতে পেলাম সিমফোরিয়ানের স্ত্রীকে, নাম আভডোটিয়া ইভানভনা। সারা বাড়িতে আর কেউ নেই।

'বার করে দিয়েছো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে?' পেট কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলো রুকটফ।

'দিয়েছি বার করে।' আমার দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আরেকটায় নিজে বসে বললে সিমফোরিয়ান। মুখ ঘামে চকচক করছে, চোখ ধোঁয়াটে, ঝাপসা।

'ইস্টকারি এসেছিলো আমাকে সুনীতি শেখাতে। জিগগেস করতে আমি কেন মেয়ে নিয়ে যাই পার্কে, বলে কিনা তাতে আমি আমার স্ত্রীকে অপমান করছি—যে-স্ত্রী সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে দাসত্বের অবরোধ থেকে! আর আমার স্ত্রীও কান্নায় গলে পড়লেন সে কথা শুনে, মূর্খ কোথাকার! ইস্টকারি বলছে, আমার উচিত আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ ছেদ করা, ও রকম উচ্ছৃংখল পাপাচরণ না করে। নিজের কোনোই বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপ নেই বলেই লোকটা বোধহয় ঢুকেছে এখন বিবাহছেদের আফিসে! কি বল গো, ডুনিয়া, করবো বিবাহছেদ?' স্ত্রীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলো সিমফোরিয়ান, 'শোনো, ডুনিয়াসা, কালকেই বিবাহ-ছেদ। থামাও তোমার নাকে কান্না, বাড়ি-ঘর এমনিতেই স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে।'

'আমি একটা খবরের জন্যে এসেছিলাম।' বললাম অসংকোচে।

'সেই হাসপাতাল সম্বন্ধে?' বললে রুকটফ। 'চলে যাও এখন, আমি এখন একলা থাকতে চাই।'

যেন ঘুমের মধ্যে কথা বলছে রকটফ, চোখের তারা দুটো ডুবে গেছে কোথায়, কাঁধের মধ্যে বসে যাচ্ছে মাথাটা।

উঠে পড়লাম কিন্তু সিমফোরিয়ান আমাকে বসতে ইসারা করলো।

'বেশ, বসে যাও।' রকটফ বললে সেই ঘুমো গলায় : 'সঙ্গই বরং আমি বেশি পছন্দ করি।'

হঠাৎ চোখ খুলে দুই হাত দিয়ে সজোরে টেবিল চাপড়ালো রকটফ—এত জোরে যে আলুর টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়লো টেবিলের চারপাশে।

'চলে এসো।' বললে সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে।

'বহুৎ আচ্ছা।' প্রতিধ্বনি করলো সিমফোরিয়ান।

আর আমি সেখানে বসে বসে মানবীয় মুর্খতার একটা অভিনয় দেখলাম। সিমফোরিয়ান আর রকটফ দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লো, টেবিল থেকে গ্লাশ নিলো কুড়িয়ে। তারপর আঙুল দিয়ে নাক টিপে ধরে চোখ বুজে মুখের হাঁ-টা প্রকাণ্ড করে গ্লাশের তরল পদার্থ টা গলগল করে ঢেলে দিলো ভিতরে। শব্দ করে ফুসফুসের থেকে সমস্ত হাওয়া বের করে দিয়ে আবার ভরে নিলো বাতাসে, আবার ছাড়লো দীর্ঘশ্বাস। এই রকম পাঁচ বার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পানীয়টা সাংঘাতিক ঝাঁজালো, সিমফোরিয়ান পাক খাচ্ছে, যেন সে একমুঠো জ্যান্ত পোকা গিলেছে আর সেগুলো তার পেটের মধ্যে গিয়ে মোচড় দিচ্ছে ; আর রকটফের বিশাল যে ভুঁড়ি, হঠাৎ গুটিয়ে গেছে ভিতরে, যেন কে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরেছে তার পেটের উপর। যাক, শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছে দুজনেই, আস্তে-সুস্থে খাচ্ছে এখন সেদ্ধ আলুর টুকরো।

ইস্টকারিকে সিমফোরিয়ান কিছুতেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না মন থেকে।

'যখন চাকরি ছিলো না, এসেছে আমার কাছে, ধুলোর উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে। যে সব লোকের কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই তাদের

নিয়ে কী করা যায়?'

'আর বোলো না, অকৃতজ্ঞতার জন্যে কাজে আজকাল আর কোনো স্পৃহা হয় না। ধরো সে সব দিনের কথা,' বললে রকটফ, 'আমি যখন টাউন কাউন্সিলের অধীনে মালী ছিলাম, তখন আমাদের মুনিবরাও কত ভদ্র ছিলো। এক বার এক হাফ-পাইট ভডকার বোতলে একটা শশা গজিয়েছিলাম আমি। দেখলে মনে হতো যেন বোতলের গলা দিয়ে একটা তাজা শশা আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যা তুমি বার করতে পারো না, তা তুমি ঢোকাও কি করে? প্রায় একটা অলৌকিক ব্যাপার। অফিসার্স এসেমব্লিতে উপহার দিলাম বোতলটা। সর্বসমক্ষে লিখিত আদেশ দিয়ে আমাকে প্রশংসা করা হলো,জানালো তাদের কৃতজ্ঞতা। আর এখন? গত আন্তর্যুদ্ধের মৃত-সৈন্যদের কবরের চার দিকে আমি কত ফুল করেছি, কত রকম কায়দায়, হাতুড়ি আর কাস্তের আকারে, ফুল দিয়ে লিখেছি, কত বিপ্লবের বুলি, কিন্তু কর্তারা কেউ ফিরেও তাকায় না। একটাও কথা কয় না তারিফ করে। বলো, কোনো কাজে কারু আর স্পৃহা থাকে?'

সিমফোরিয়ান প্রশ্ন করলো আমাকে, 'হাসপাতালের জন্যে এসেছো? সত্যি তাই, তোমাদের দালানে বসবে শিগগির হাসপাতাল।'

'আমাদের বিষয়েও কি কিছুটা দয়া দেখানো হবে না? বলুন না, কার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। একটা কিছু আমাদের পরামর্শ দিন না।'

'যেখানে খুশি তুমি যেতে পারো। তোমাদের জন্যে আমি আমার কড়ে আঙুলটাও নাড়বো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্নেসীরা দূর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, আমি শান্তি পাবোনা জীবনে। অসহ্য সাধু-সন্নেসী।'

হঠাৎ নিজের কলার ধরে সে বিকটকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো: 'অসহ্য, অসহ্য। এত লোক শহরে, কোথাও কোনো একটা জ্যান্ত লোক নেই। যেদিকে তাকাও সেদিকেই শুধু নাক-ওঁচানো শুয়োর। কেবল একজন খাঁটি লোক ছিলো সমস্ত নারোভচাট শহরে, কিন্তু বেশি দিন সে আর নেই, তাকে

'ওরা তাড়িয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাবে শহর থেকে।'

'কার কথা বলছো ?' জিগগেস করলো রকটফ।

'তোমার কথা নয়। তুমিও একটি নাক-ওঁচানো শুয়োর।'

'তা ঠিক বলেছো। নারোভচাটে একমাত্র লোক হচ্ছে পুশকিন।' আবেগের সঙ্গে বললে সিমফোরিয়ান।

'সে ? সে তো একটা গাধা।' বললে রকটফ।

'গাধা ?' সিমফোরিয়ান ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠলো : 'গাধা ? তা হলে তুমি কথা কইবারই উপযুক্ত লোক নও। আচ্ছা ইগনাটি, তোমার মনে হয় পুশকিন গাধা ?'

'না। আমার মনে হয় ওর আছে প্রবল কল্পনাশক্তি।'

'ঠিক বলেছো, কল্পনাশক্তি। নারোভচাটে ওই একমাত্র লোক যার কল্পনাশক্তি আছে। খাঁটি গোটা মানুষ, শুধু একটা নাক নয়।'

'কেন, আফানাসি সেরগেইয়েভিচের কোনো বিপদ আছে ? সে এখানে বেশিদিন নেই—তার মানে কী ?'

'এই দেখো।' সিমফোরিয়ান তার পকেট থেকে একটা নোট-বই বের করলো। 'মনে রেখো আমি একজন জার্নালিস্ট, সমস্ত আমার এই নোটবইয়ে টোকা থাকে। সমুদ্রে যেমন স্পঞ্জ, আমি তেমনি মনুষ্যসমাজে। দেখ, সরকারী চিঠি থেকে আমি কী টুকে নিয়েছি!' বলে সে পড়লো :

> 'নাগরিক আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিন, পূর্বতন ভাকুরফের বাড়ির বাসিন্দা।
>
> এই পত্রে তোমাকে আদেশ করা যাচ্ছে যে অসংগত পোশাকে, অর্থাৎ লেখক পুশকিনের চেহারায়, রাস্তায় বেরুনো তুমি বন্ধ করবে, যাতে ভদ্র, সরল নাগরিকেরা তোমার ধূর্ততায় না বিভ্রান্ত হয়, যাতে সাধারণ জনগণ না ঠকে। যদি অবাধ্য হও,

তবে তার বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে।

স্বাক্ষর : নারোভচাটের নগররক্ষণের প্রধান,

মাকারুশকিন'

পড়া শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে সিমফোরিয়ান ঘরের মধ্যে গর্জন করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, অনুপস্থিত শূন্যকে ঘুসির ভয় দেখিয়ে। রকটফ বসে-বসে ঝিমুচ্ছিলো, হঠাৎ তার পিঠের উপর কিল মারলো, দেরাজের কাছে গিয়ে বার করলো বোতল, পেটটা মোটা, মুখটা সরু।

'শিগগির দাও আমাকে।' রকটফ দুহাত মেলে আছড়ে পড়লো টেবিলের উপর।

এতক্ষণে বুঝলাম কী ঐ পানীয়। বোতলটা অডিকোলনের।

সিমফোরিয়ান আধাভর্তি করলো গ্লাশ দুটো, শেষে জল মিশোলো। দেখালো যেন দুধের মতো শাদা।

তাকাতে পাচ্ছিলুম না বন্ধু দুজনের দিকে, যখন তারা নাক টিপে ধরে খাচ্ছিলো সে দুধ। শুধু শুনছিলুম তাদের নাকের মধ্যে দিয়ে শব্দ,ক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত, আর দুহাতে মুখ ঢেকে প্রতীক্ষা করছিলুম কতক্ষণে শেষ হবে এ মত্ততা। যেই ওরা চুপ করলো, ভয়ে ভয়ে তাকালুম একবার সিমফোরিয়ানের দিকে, আবার তখুনি মুখ ঢাকলুম দুহাতে, সিমফোরিয়ানের কপালে নীল শিরা জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে, মুখে নিদারুণ বিকৃতি আর চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। হঠাৎ একটা জিনিস আছড়ে-ফেলার শব্দ শুনলুম, তাকিয়ে দেখি একটা চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে সিমফোরিয়ান।

'ও রকম মোচড়ামোচড়ি খাচ্ছ কেন ?' আমার দিকে চেয়ে গর্জে উঠলো সে। 'ভূত দেখেছো নাকি ? ভয় নেই, আমি দেখেছি ভূত। সেণ্টগুলোকে সইতে পাচ্ছি না আমি, আমার জীবনধারণে কোনো সুখ নেই যতক্ষণ না ওরা পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজে একদিন সেণ্ট ছিলাম,

যাজক হবার ভারও পড়েছিলো এক বার—তাই সেই কারণেই বেশি, সইতে পারিনা ওগুলোকে। রকটফ, এসো গুলি করি আমরা সেণ্টদের।'

উঠলুম লাফিয়ে, ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দাঁড়ালুম গিয়ে কোণে, স্টোভের ধারে।

সিমফোরিয়ান বিছানার তলা থেকে রিভলভার বার করে এনে বসলো একটা চেয়ারে, ঘরের মধ্যিখানে। তাকালুম রকটফের দিকে, চোখে আশার শেষ রশ্মি নিয়ে, কিন্তু সে ঘুমুচ্ছে বসে-বসে। দুহাতে কান চেপে দাঁড়িয়ে রইলুম স্তব্ধ হয়ে। ততক্ষণে বুঝলুম, অন্ধ হয়ে সাময়িক মত্ততায় কী ঘোর সর্বনাশ করতে বসেছে সিমফোরিয়ান। দেয়ালে ক্রিট-এর দশ-শহীদের একটা বিখ্যাত ছবি ঝুলছিলো, গ্রীক পদ্ধতিতে আঁকা নামজাদা ছবি। সেসব শহীদের মুখ তাক করে হাত উঁচিয়েছে সিমফোরিয়ান।

হে ঈশ্বর, কী কঠিন পাপের জন্যে দিয়েছো আমাকে এই দুর্বহ শাস্তি, অসহায়ের মতো সাক্ষী হবো এই অধর্মিতার। চেঁচাতে চাইলুম, কিন্তু স্বর গেছে হারিয়ে। চেষ্টা করলুম সেই পাপীটার হাত চেপে ধরতে, কিন্তু পা নড়লো না।

সিমফোরিয়ান বাঁ হাতের মুঠোয় তার ডান হাতের কবজি চেপে ধরলো, চোখ ছোট করলো, আর যেন সে গির্জেয় বসে উপাসনা করছে এমনি নম্র স্বরে বলে উঠলো ঃ 'পবিত্রাত্মা সেণ্ট ফাদার আগাহোপুস···'

সমস্ত বাড়ি উঠলো কেঁপে। শব্দের চাপে আলো নিবে গেলো আর সেই মুহূর্তেই উঠলো ফের দপ করে জ্বলে। তারপর তাকালুম সে ছবির দিকে। দশজনের একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিন্ন মুখে বসে আছে, ফুটো হয়ে রঙের বার্নিশ খানিকটা গিয়েছে খসে।

যেন কী অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঠেলা মেরে সেই পাপের পরিধি থেকে

বার করে দিলো। ছুটলুম দরজার দিকে, কিন্তু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সিমফোরিয়ানের স্ত্রী, আভডোটিয়া ইভানভনা। কাগজের মতো শাদা, সে তার স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অসীম অনুনয়ে, যেন সে শান্ত হয়, স্থির হয়। আমার দিকে চেয়ে বললে সে করুণ করে, 'ভয়ে মাসেনকা যে মারা যাবে—আমাদের মেয়ে, মাসেনকা। স্টোভের উপর ঘুমিয়ে আছে সে।'

তাকালুম সিমফোরিয়ানের দিকে, কিন্তু তার রাগটাই যেন ঠেলে হটিয়ে দিলো আমাকে।

'বেরিয়ে যাও বলছি।' উঠলো সে গর্জন করে, পরে বললে উপাসনার ভঙ্গিতে : 'পবিত্রাত্মা সেণ্ট ফাদার···'

আকাশের দিকে হাত তুলে আভডোটিয়া ইভানভনা কাঁপতে লাগলো, তার দিকে চেয়ে করুণায় ভরে গেলো আমার বুক। তার হাত ধরে রান্নাঘরে তার বিছানায় তাকে নিয়ে গেলুম। বিছানায় বসে সে কাঁদতে লাগলো। তার দিকে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলুম, জানিনা কিসে তাকে শান্ত করা যাবে। তীব্র যন্ত্রণায় সে হাত মোচড়াচ্ছে, তার চুল গেছে খসে, ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর, আর পিঠ থেকে তার শাল গেছে স্খলিত হয়ে। শোকে ভুলে গেছে সে তার সাজসজ্জা। আমার অনুভূতিগুলি গেছে সব তালগোল পাকিয়ে। যদিও এই শোকার্তা নারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমার করুণা উথলে উঠছিলো, কী বলবো, আমার শৈশব শেষ হবার পরে এমন আলুথালু পোশাকে কোনো দিন কোনো মেয়েকে আমি দেখিনি। মাঝে-মাঝে কেশ-গুচ্ছে ঢাকা শুভ্র কাঁধই সে অনাবৃত করেনি, অনাবৃত হয়েছে তার স্তন। মনে নেই, কী প্রার্থনা তখন করেছিলুম মনে-মনে। হঠাৎ মনে হলো ঈশ্বর আমার নিষ্পাপ যৌবনকে রক্ষা করবেন, আর তখুনি আভডোটিয়া ইভানভনার প্রতি আমার সত্যিকারের ক্রিশ্চিয়ান করুণার উদ্রেক হলো। তার কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে

সান্ত্বনার কথা বলতে যাচ্ছিলুম, সিমকোরিয়ানের ঘর থেকে শুনলুম আবার গর্জন :

'ফাদার পমপেয়ুস…'

শব্দের আকস্মিক বিদারণে আমি চমকে ছিটকে পড়লুম। ছিটকে পড়লুম আভডোটিয়া ইভানভনার বুকের উপর, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আর আমার হাত তার কাঁধ দুটো সজোরে আঁকড়ে রইলো। হে ঈশ্বর আমাকে দয়া করো, পাপ করেছি আমি। আত্মবিস্মৃত হয়ে আভডোটিয়া ইভানভনার বুক আমি চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলুম, আর আমার মনে পরমদ্যুতির অনুভব ছাড়া আর কোনো চেতনাই জেগে রইলো না।

মনে নেই কী করে বেরিয়ে এলুম সিমকোরিয়ানের বাড়ি থেকে। ঘুরছিলো মাথা, আর কানে বাজছিলো সে শব্দের বিদারণ, গুলির না আর কিছুর কে জানে। ঈশ্বর আমার সাক্ষী হোন।…

এই পর্যন্ত লিখেছি, তখন ভোর হয়েছে। বুকের মধ্যে অজানা ভার। খুললুম জানলা। সুরু হয়েছে প্রভাতী প্রার্থনা। ডাকছে পাখি, হাওয়ায় নড়ছে গাছের ডাল, নদী থেকে আস্তে-আস্তে উবে যাচ্ছে কুয়াশা। প্রকৃতির এই শান্তি এই স্নেহ অসহ্য লাগছিলো, প্রায় কান্না পাচ্ছিলো আমার, আমার বুকের মধ্যে কিনা পাপের প্রমত্ততা!

হঠাৎ কে যেন ডাকলে৷ আমাকে স্নিগ্ধ স্বরে : 'ইগনাটি, মনে কি খুবই অশান্তি বোধ করছো?'

চেয়ে দেখলুম, ফাদার রাফায়েল, আমার জানলার নিচে বেড়াচ্ছেন সকালবেলা। মাথা নামিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, শান্তি নেই মনে।'

উত্তরে তিনি আর কিছু বললেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেড়াতে লাগলেন আগের মতো। বিছানায় পড়ে আমি কাঁদতে লাগলুম।

আজ শহরে ভীষণ সোরগোল পড়ে গেছে, দেশের পক্ষে মারাত্মক কী

কাণ্ড ঘটে গেছে না-জানি। কী ব্যাপার? আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিন নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার নিরুদ্দেশের খবর টের পায় প্রথম ভাকুরফের বাড়ির ভাড়াটেরা, পরে সে খবর পাকা হয় স্টেশনের মাল-গুদামের আফিসে। তক্ষুনি ছুটে গেলুম ভাকুরফের বাড়ি। ছুটির দিন নয়, তবু লোক জমা হচ্ছিলো অগুনতি। পুলিশ পর্যন্ত এসেছে, সঙ্গে দলপতি মাকারুশকিন। আফানাসি সেরগেইয়েভিচের ঘরের দরজা ভেঙে ফেলতে হবে। অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙে বারান্দার অনেক ঘোরপ্যাচের মধ্য দিয়ে উঠে গেলো সরকারী লোকেরা, মাকারুশকিনকে ঘিরে তার নিম্নতন কর্মচারীর দল। কতক্ষণ পরে শুনতে পেলুম তালা-ভাঙার শব্দ, ভারি তালাটা দড়াম করে ছিটকে পড়লো মেঝের উপর। খুলে গেলো দরজা, ঘরের শূন্যতা যেন উৎসুক জনতাকে গিলে ফেললো নিমেষে। কী ভয়ংকর না জানি বেরুবে সেই ঘরের থেকে, রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করছিলো বাইরে দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ পরে সরকারী কর্মচারীরা বেরিয়ে এলো, শুনলুম কিছুই পাওয়া যায়নি আফানাসি সেরগেইয়েভিচের ঘরে। ঘর শিল করার হুকুম দিলো মাকারুশকিন। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না শিল-মোহরের গালা। সরকারী কর্মচারীর দঙ্গল শহরে ফের ফিরে গেলো। পাহারা দেবার জন্যে রেখে গেলো দুটো দারোয়ান। বোকামির জন্যেই হোক বা ভালোমানসির জন্যেই হোক, কিম্বা কে জানে একঘেয়েমির বিরক্তির জন্যেই হয়তো, তারা ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিচ্ছিলো কৌতূহলীদের, আর সেই সুযোগে আমিও ঢুকলুম আফানাসির ঘরে।

কোমল একটি স্নেহের স্বাদ পেলুম সে ঘরের হাওয়ায়, যদিও হাসছিলো, ঠাট্টা করছিলো অনেকেই। আফানাসি সেরগেইয়েভিচের একখানা মাত্র ঘর, আর সেই ঘর আলেকজাণ্ডার সেরগেইয়েভিচ পুশকিনের চিত্রবিচিত্র স্মৃতিচিহ্নে আকীর্ণ। দেয়ালগুলি সেই যশস্বী কবির নানান ছবিতে ভরা, তাঁর কবিতায় ও গল্পে যে সব ছবি এঁকেছে শিল্পীরা, সে সব ছবি পর্যন্ত।

তাকে কেবল তাঁরই বই।

আমাদের কথা ছেড়ে দিই, নারোভচাটের সাধারণ লাইব্রেরিতেও এত বই নেই যা পুশকিনকে নিয়ে লেখা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ। ঘরের প্রত্যেকটি ছোটখাটো জিনিসে পর্যন্ত সেই অমর কবির প্রতি বিনম্র ভক্তির প্রতিচ্ছায়া।

সেই দরিদ্র ঘরে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে দীর্ঘকায় একটা আয়না আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত লাগলো। বুঝলুম সে-আয়নায় আফানাসি সোরগেইয়েভিচ দেখতে পারতো তার নিজের ছায়া, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

যেন কোনো অনাথকে পথের প্রান্তে ফেলে যাচ্ছি,সে ঘর থেকে চলে যাবার সময় মনে এমনি বিষাদের ছায়া পড়লো। দুশ্চিন্তা হতে লাগলো আফানাসি সেরগেইয়েভিচের জন্যে। ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন বিপদ থেকে।

এদিকে আমি হাঁ করে ভাকুরফের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি, ওদিকে মঠের সবাই আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মঠের এই বিপদের দিনে তার দিকে মন না দিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, আমার বুদ্ধি-বিবেচনার কেউ প্রশংসা করবে না।

ফাদার রাকায়েলের ঘরে ঢুকতেই তিনি কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

আমাদের ঘোড়া অনেক আগেই তলব দিয়ে নিয়ে গেছে, তাই ফাদার রাফায়েল চলেছেন পায়ে হেঁটে। জীবনে এই প্রথম। চলেছেন নিঃশব্দে, লাঠিতে ভর দিয়ে, মঠের নিয়মমাফিক চোখ তাঁর মাটির উপর নোয়ানো। তিন পা পিছনে আমি চলছি, আর যতই তাঁর মহত্ত্ব ও বিনয়ের কথা ভাবছি ততই আমার নিজের হীনতায় যাচ্ছি মাটির সঙ্গে মিশে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, ফাদার ?'

ফাদার নিরুত্তর।

বড়ো রাস্তা হয়ে এলুম আমরা আগের টাউন হলে, যেখানে এখন স্থানীয় সোভিয়েটের আস্তানা বসেছে। সেখানে দরজার সামনে দাঁড়ালেন তিনি, ক্রুশের চিহ্ন করলেন নিজের উপর, যেন ঢুকছেন কোনো মন্দিরে, ইশারায় বললেন আমাকে, দরজা খোলো।

কিছু সুরাহা হবে এমন কোনো আশা না রেখেই দরজায় ধাক্কা দিলুম। সিঁড়ি ভেঙে ফাদার রাফায়েল উপরে উঠে গেলেন, মুখে শান্ত দৃঢ়তার ভাব, সোজা হেঁটে গেলেন বারান্দা ধরে। একজন পরিচারক গোছের লোক পাওয়া গেলো,তাকে জিগগেস করলুম কোথায় গেলে সোভিয়েটের কমরেড সেক্রেটারির দেখা পাবো। সে বললে, সেক্রেটারি এখন নেই আফিসে, অপেক্ষা করতে হবে। বলে আমাদের নিয়ে গেলো বিশ্রামাগারে। শূন্য ঘর। ফাদার ঘরের মধ্যিখানে বসলেন হাঁটু গেড়ে, দরজার দিকে মুখ করে। আমাকেও বললেন অমনি বসতে, তাঁর পাশে। দেখিয়ে দিলেন জায়গা। তাঁর আদেশ পালন করলুম। বললেন ফাদার রাফায়েল 'উবু হয়ে শুয়ে পড়ো।' শুলেন নিজে।

আমি অনুসরণ করলুম তাঁর দৃষ্টান্ত। কতক্ষণ রইলুম আমরা সে-ভাবে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি এমনি ভঙ্গিতে। হঠাৎ শুনতে পেলুম কার দ্রুত পদশব্দ। কে যেন ঘরে ঢুকে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো।

'এ কি ?' শুনলুম কার বিমূঢ় কণ্ঠস্বর।

পরে সে-স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠলো: 'কে তোমরা ? কী করছো ? কী এর মানে ?'

নড়লেন না ফাদার রাফায়েল, বললেন মিনতিময় গলায়, 'আমরা উঠবো না মাটি ছেড়ে যতক্ষণ না শুনছেন আমাদের কথা।'

উত্তরে সেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কঠিন পদাঘাতের সঙ্গে বললে, 'ওঠো,

ওঠো বলছি।'

'উঠবো না আমরা কিছুতেই।'

'উঠতেই হবে।'

চললো এ-ভাবে। ফাদার রাফায়েল নিশ্চলের মতো পড়ে রইলেন আর সেই নির্মম আগন্তুক বারে-বারে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগলো।

'যতক্ষণ না উঠে বসছো তোমরা ততক্ষণ আমি শুনবো না তোমাদের কোনো কথা।'

এই বলে সে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। চীৎকার করতে-করতে : 'কে ঢুকতে দিয়েছে এদেরকে?'

আমরা তবু পড়ে রইলুম চুপচাপ। কে আরেকজন এসে আমাদের দুজনকে পা দিয়ে ঠেলা মারলো, বললে, 'এ রকম বোকামি করে কিছু হবে না। ওঠো, নইলে জোর করে টেনে তুলবো।'

নিরুপায়। ফাদার রাফায়েল উঠে বসলেন, উঠতে বললেন আমাকে। তখন সোভিয়েটের সেক্রেটারি ফিরে এলো, দেখেই চিনতে পারলুম এই লোকটাই এতক্ষণ চেঁচিয়ে ও পা ঠুকে গেছে। তার মুখে কিন্তু কোনো রাগ বা নিষ্ঠুরতার চিহ্ন দেখলুম না, বরং তার ঠোঁটে দেখতে পেলুম একটি হাসির রেখা। মনে হলো ও-হাসিটা বোধ হয় অভ্যেস, নইলে এমন সাংঘাতিক অবস্থায় কেউ হাসতে পারে এ আমার ধারণার অতীত। সেক্রেটারিকে বললেন ফাদার রাফায়েল যে অনেক বেসরকারী জায়গা থেকে তিনি শুনতে পেয়েছেন, আমাদের মঠে সৈন্যদের হাসপাতাল হচ্ছে। তার মানে হবে এই যে আমাদের মঠ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। মঠের কোনো-কোনো অংশে আগে যে শিশুদের হাসপাতাল ও অনাথ-আশ্রম হয়েছিলো তাতেই সন্নেসীদের অসুবিধে হচ্ছে ঘোরতর, তার উপর—

মনোযোগ করে শুনলো সোভিয়েটের সেক্রেটারি, পরে, বললে, 'মঠে

ফিরে যাও। আমি একদিন নিজে যাবো, দেখবো তোমাদের মঠ।'
নত হয়ে নমস্কার করলুম আমরা।
'ব্যবহার থেকেই বোঝা যায় লোকটা ভদ্র।' বাইরে এসে বললেন ফাদার রাফায়েল। শিক্ষাদীক্ষা ভালো বলেই শুধু চেঁচিয়েছিলো সে, তাও আমাদের অমন অদ্ভুতভাবে থাকতে দেখে, ব্যাপার ঠিক না বুঝতে পেরে। যাই বলো, ঈশ্বর কখনোই নির্দয় নন।'
কিন্তু অনর্থক আমাদের আশা।
মঠ পর্যন্ত পৌঁছুইনি, একটা গাড়ি পিছন থেকে এসে ধরলো আমাদের, আর সেই গাড়ির ভিতর থেকে বেরুলো সেই সোভিয়েটের সেক্রেটারি। আবির্ভাবের এই আকস্মিকতাটা অভিভূত করলো ফাদারকে, সেক্রেটারি যেন কোনো অশরীরী ছায়া, এমনি মূঢ়দৃষ্টিতে তিনি গায়ের উপর ক্রুশের চিহ্ন আঁকলেন। সেক্রেটারির মুখে সেই হাসি ফুটে উঠলো। 'কই, দেখাও তোমাদের মঠ। ঘর-বাড়ি।'
আমরা এমনি ধারা আগন্তুকের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। আমাদের মনে হলো অন্যান্য সন্নেসীদের আগে থেকে হুঁসিয়ার রাখা উচিত, কিছু একটা না অঘটন কেউ করে বসে। তাই বললেন ফাদার রাফায়েল, 'যে অংশটা অনাথাশ্রম আর শিশুদের হাসপাতাল হয়েছে তাই দেখুন আগে।'
এই বলে আমাকে ইসারায় বলে দিলেন যেন এই ফাঁকে আর সবাইকে সাবধান করে দি। কিন্তু সেক্রেটারি বলে উঠলো, 'না, যা নেয়া হয়ে গেছে তা দেখে লাভ কি? যা এখনো তোমাদের আছে তাই আমাকে দেখাও।'
গাড়ি-বারান্দায় সবে ঢুকেছি, এক ঝুড়ি পেইস্ট্রি নিয়ে সন্নেসী পরফিরি নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। টাটকা তৈরি, ধোঁয়া উঠছে।
'এ সব কেন? বাজারে যাচ্ছে?' জিগগেস করলো সেক্রেটারি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো, বাজারে যাচ্ছে বিক্রি হতে। তোমার চাই একখানা—একেবারে টাটকা—ডিম আছে, লিভার আছে, চাখবে একখানা ?'

ফাদার পরফিরিকে ইসারা করলেন সরে যেতে, পরে বললেন বুঝিয়ে, 'মঠের কিছুই বিশেষ আয় নেই, তাই সন্নেসীরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে কোনো-না-কোনো রোজগারের পথ করে নিয়েছে। নইলে সন্নেসী-দের পক্ষে মাংসের পিঠে তৈরি করা—'

তাকালুম সেক্রেটারির মুখের দিকে, অজানা ভয়ে মনটা মুষড়ে পড়লো। দুর্ঘটনা কিছু একটা ঘটবে এমনি মনে হলো। মনে হলো সেক্রেটারির হাসি অভ্যাসের হাসি নয়।

ফাদার রাফায়েল নিয়ে গেলেন তাকে বারান্দা দিয়ে, ঘর খুলে-খুলে দেখিয়ে : 'এই আমাদের ভাঁড়ার, এটা আমাদের গুহা, এটাতে রাখি আমরা চাষের যন্ত্রপাতি। আমরাও একটা সম্প্রদায়, কমিউন, শ্রমিকের সম্প্রদায়।'

ঘর সব খালি। বিছানা তোলা। চতুর্দিক বিশৃংখল।

'সন্নেসীরা সব বাজারে গেছে নাকি ?' সেক্রেটারি জিগগেস করলো।

'যার-যার কাজ করছে।' বললেন ফাদার রাফায়েল।

এবার এলুম অন্য ঘরে। একটা টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ারে তিনজন লোক বসেছিলো, আমাদের দেখেই লাফিয়ে উঠলো তারা। একজনকে চিনতুম, আর দুজন নতুন। কারুর গায়েই সন্নেসীর জোব্বা নেই, আর কে জানে কেন, হয় পকেটে নয় পিছনে হাত লুকোচ্ছে তারা। সমস্ত ঘরে তামাকের গন্ধ, টেবিলের উপর পর্যন্ত এক পুঁটলি তামাক। এক-জনের কাছে এগিয়ে গেলো সেক্রেটারি, বললে, 'কী করো তুমি ?'

'আমি বেকার।'

'এখানে কী করছো ?' ফাদার ঘুরিয়ে দিলেন প্রশ্নটা।

'ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, ফাদার রাফায়েল, আমরা টাকা দিয়ে খেলছিলুম না—'

'না, না, সেকথা নয়।' প্রশ্ন করলো সেক্রেটারি : 'এখানে আসবার আগে কী করতে তুমি ?'

'খুচরো বিক্রির ব্যবসা ছিলো।'

'দোকান ছিলো ?'

'ছিলো একটা সামান্য। তারপর এলো ধ্বংসের দিন, সব লোপাট হয়ে গেলো। এখন একেবারে ফকির—'

তাকাতে পাচ্ছিলুম না ফাদার রাফায়েলের মুখের দিকে, যন্ত্রণায় কালো দেখাচ্ছে তাঁর মুখ। তাকাতে পাচ্ছিলুম না ঐ জুয়াড়ীদের দিকে যারা তাস খেলছিলো এতক্ষণ। ছুটে চলে গেলুম আমার ঘরে।

হে ঈশ্বর, কী হয়েছে আমাদের এই পবিত্র দেবায়তনের চেহারা! কারা এর অধিবাসী ?

কী করে সন্তুষ্ট করা যায় সেক্রেটারিকে ? কোনো একটা কঠিন কাজ করে দিয়ে, প্রমাণ করে যে আসলে আমরা দূরে নই, আমাদের মঠের নিয়ম-কানুনের দোষেই আমাদেরকে দূর দেখায়।

ভাবছি এমনি ধারা, হঠাৎ কে নাম ধরে ডাকলো আমাকে। চোখ তুলে চেয়ে দেখি, আভডোটিয়া ইভানভনা।

'তুমি আর আমাদের ওখানে যাও না কেন ?' বললে সে, আমার কাছে এগিয়ে এসে।

'কত কাজ, সময় কোথায়!' মনের মধ্যে সব সময়েই ভয়, সেদিনের অন্যায় আচরণের জন্যে কি না জানি তিরস্কার করে বসে!

বিষণ্ণ গলায় সে বললে, 'সিমফোরিয়ান তেমনি মদ খাচ্ছে, আর আমি বসে আছি নিঃসঙ্গ…'

চোখ তুললুম সাহস করে। সুগঠিত তার শরীর, নিশ্বাসে বুকের পাতলা জামাটা নড়ছে, মনে হলো তার চোখে একটি বিদ্রূপের হাসি, অথচ আর্দ্র মমতা।

'মনে থাকবে তোমার নিমন্ত্রণ।' শুকনো গলায় কাশতে সুরু করলুম, 'এখন আমি যাই···'

আভডোটিয়া ইভানভনা আমার হাত চেপে ধরলো, কি রকম অদ্ভুত যেন তার স্পর্শ, আর অনেক দূর যখন চলে গেছি তখন বললে চেঁচিয়ে, 'এসো কিন্তু একদিন।'

এক ছুটে পৌছুলুম এসে মঠে। নদীর পারে হাঁটলুম কত ক্ষণ, বসলুম চুপ করে, যদি প্রকৃতি তার শান্তির হাত বুলিয়ে মুছে দেয় এ যন্ত্রণা। গল্প করতে লাগলুম অনাথ-আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে, বসলুম প্রার্থনায়। কিন্তু কোথায় শান্তি।

এলোমেলো হয়ে গেছে সব চিন্তা, পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি না কী চাই আমি। কত কী কাণ্ড ঘটে গেলো দেখতে দেখতে : আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিনের পলায়ন, ফাদার রাফায়েলের লাঞ্ছনা, মঠে সোভিয়েট কর্তাদের আবির্ভাব—যার পরিণতি আমাদের পক্ষে ভয়ানক—সব শেষে আভডোটিয়া ইভানভনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ, আর আভডোটিয়ার তাতে কিনা বিন্দুমাত্র রাগ নেই। আমার নির্জন ঘরে আভডোটিয়া ইভানভনা যেন এসে দাঁড়িয়েছে এমন জ্বলন্ত তার উপস্থিতি—আর আমি ঘামে ভিজে উঠছি, তাকাচ্ছি তার পোশাকের দিকে, সে-দিনের সেই রাত্রির পোশাক!

কি করে না জানি কবিতা লিখে ফেললুম একটা।

দীর্ঘ, বিনিদ্র রাত্রির পর গেলুম "নারোভচাটের সত্যকথনের" সম্পাদকীয় আফিসে। দেখলুম আনটিপ সাডনফ বসে আছে। উৎসাহে তাকে

অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি, সে মুখের কাছে আঙুল তুলে আমাকে ইসারা করলো চুপ করতে। বসলুম তার পাশে, আর ও কানে-কানে আমাকে বললে, 'চুপ! আমার কবিতা পড়ছে।' বলে আঙুল দেখালো পাশের বন্ধ ঘরের দিকে।

'কে পড়ছে?' বললুম ফিসফিসিয়ে।

'সিমফোরিয়ান।'

কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম দুজনে। খুললো দরজা, বেরুলো সিমফোরিয়ান। আনটিপের হাতে লেখাটা পৌঁছে সে বললে মুখ বেঁকিয়ে: 'যাচ্ছেতাই!'

কাগজগুলি ভাঁজ করে আনটিপ রাখলো তার বুক-পকেটে, বললে ভয়ে ভয়ে, 'আর একটা আছে আমার লেখা।'

'দরকার নেই তোমার লেখায়। অত্যন্ত বিতিকিচ্ছি—' সিমফোরিয়ান বললে।

আস্তে আস্তে চলে গেলো আনটিপ।

'তোমার কী খবর? তুমিও লিখতে সুরু করেছো নাকি?' এগিয়ে এসে বললে সিমফোরিয়ান।

দেখাতে তক্ষুনি সাহস হলো না। বরং ভয় করতে লাগলো পাছে সিমফোরিয়ান বুঝে ফেলে এই কবিতার মূলে রয়েছে তার স্ত্রী।

'কী, তোমারো কবিতা নাকি?'

'হ্যাঁ, আমারো কবিতা, কিন্তু দেখাতে ভারি লজ্জা করছে—'

'ওসব কবিতা-টবিতা ছাড়ো।' সিমফোরিয়ান আমার কাঁধে হাত রাখলো: 'তোমার নিজের বিষয় নিয়ে লেখ।'

'নিজের বিষয়?'

'হ্যাঁ। কী পেশা তোমার? তুমি সন্নেসী। সুতরাং তোমার কাজ হচ্ছে সেণ্টদের নিয়ে লেখা। বেশ, আমাদের কাগজে, অনীশ্বরবাদ-বিভাগে

তুমি লিখতে সুরু করো।'

ক্রুশের চিহ্ন করলুম তক্ষুনি, ভেবে পেলুম না কী বলা যায় উত্তরে। সিমফোরিয়ান হেসে উঠলো, আর যেখানটায় আনটিপ সাডনফ বসেছিলো সে জায়গাটা লক্ষ্য করে ফেললো থুতু।

আজ, রবিবার, প্রভাতী প্রার্থনার ঘণ্টা বাজছে, হৈ-চৈ শুনে তাকালুম জানলা দিয়ে। ছুটোছুটি করছে লোকজন, অনাথ-আশ্রমের শিশু, মঠের সন্নেসী। কী ব্যাপার ?

কে একজন অপরিচিত লোকের মৃতদেহ নদীর ঢেউয়ে ভেসে এসে ঠেকেছে মঠের ঘাটের কিনারে।

আর-আরদের সঙ্গে আমিও গেলুম নদীর ঘাটে। শুনলুম কেউ চেনে না লোকটাকে, বলতে পারছে না কোথায় এর বাড়ি-ঘর। এগোলুম ভিড় ঠেলে।

নদীর ঢালের উপর শুয়ে আছে লোকটা, পা উপরে মাথাটা জলের দিকে। তার লম্বা চুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে জল। গলায় কী কতগুলো জলের লতা রয়েছে জড়িয়ে। মুখটা বিশ্রী ফোলা।

জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এ কথা কে না জানে সংসারে। আমাদের সমস্ত কিছু ধর্মের ভাব এই চেতনা থেকে। তবু মঠের সন্নেসী হয়েও মৃত্যুর মুখের দিকে শান্ত অবিচলিত দৃষ্টিতে তাকাতে পারছি না। মৃতের মুখের দিকে না তাকিয়ে খুঁজতে লাগলুম তার জামা-কাপড়। সন্দেহ কি, এ সেই আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিন, গায়ে তার সেই বহুপরিচিত স্কন্ধাবরণ। তাকালুম মুখের দিকে। সন্দেহ নেই, এ সেই পলাতক।

মৃত্যু বিকৃত করলেও, তার আকৃতির বৈশিষ্ট্য এখনো প্রস্ফুট আছে, মুখে সেই বসন্তের দাগ—এ নাক আর ঠোঁট আর কার হতে পারে সংসারে! শুধু চুল নেই আগের মতো, আমি তারি জন্যেই হয়তো

চিনতে তাকে দেরি হচ্ছিলো এত-ক্ষণ। তার সেই লাল চুল আর নেই বলে। তার বদলে ঝোলা-ঝোলা হলদেটে চুলের গোছা জলে ভিজে লেপটে আছে মাথার সঙ্গে, তার জুলপির নিচেকার দাড়ি পর্যন্ত লাল নয়। ভাবো একবার, সারা জীবন সে চুলে ও দাড়িতে কলপ দিয়েছে, আর সে-কথা এমনি ভাবেই জানাজানি হয়ে যাবে এক দিন!

মুখ ঢাকলুম দুহাতে। ফিরে গেলুম।

হে শক্তির দেবতা, আমাদের দয়া করো।

নদীর দিকে মাথা, ঢালের উপর শুয়ে আছে আফানাসি সেরগেইয়েভিচ, আর তার রঙ-ওঠা চুল ভাসছে জলের উপর—এ-দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না কিছুতেই। তিন দিন ধরে মৃত্যুর সেই ছায়া আমাকে ছুঁয়ে রইলো।

চার দিনের দিন বেরিয়েছি মঠ থেকে, কিন্তু শহরে পৌছবার আগেই ফিরে এলুম ঘরে, বন্ধ করে দিলুম দরজা। আফানাসি সেরগেইয়েভিচের মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ সেই দুঃসংবাদ। সিমফোরিয়ান বিষ খেয়ে মারা গেছে। কী করে যে ঘটলো এ দুর্ঘটনা কে বলবে তার ইতিহাস! শুনলুম, বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সে গিয়েছিলো সহরের মর্গে বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাবার জন্যে। তারপর তার নাকি খেয়াল হয়েছিলো খবরের কাগজে পুশকিন সম্বন্ধে সে একটা শোকসংবাদ ছাপবে, আর বলতে কি, একটা চমৎকার প্রবন্ধও নাকি এনেছিলো লিখে। কিন্তু সম্পাদকের আফিসের লোকেরা তাকে বিদ্রূপ করে উঠলো, অস্বীকার করলো ছাপতে। রাগে অন্ধ হয়ে সিমফোরিয়ান প্রতিজ্ঞা করলো আর কোনো দিন সে কলম ছোঁবে না। তারপর তাকে রাস্তায় দেখা গেলো মত্ত অবস্থায়। জানা গেলো, বাড়ি ফিরে নাকি সে একটা জোলো জিনিস খেয়েছিলো যার নাম কেউ বলতে পারে না, যার ফলে বিন্দুমাত্র অনুতাপ না

করে, বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না দেখিয়ে সে ডুবে গেলো আস্তে-আস্তে।

আর কয়েকটা খবর দিয়ে আমার এ-লেখা শেষ করি। সোভিয়েট প্রেসিডেণ্টের হুকুমে, স্থানীয় পুলিশের যে প্রধান, তার চাকরি গেলো। শুনলুম তার অপরাধ, অর্থহীন চিঠি লেখা। বোঝা গেলো না এ সেই চিঠি কিনা যা মাকারুশকিন, আফানাসি সেরগেইয়েভিচ পুশকিনকে লিখেছিলো, কিংবা কে জানে, আর কোনো চিঠি।

আরো একটা খবর হচ্ছে এই যে কমিশার রকটফকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বাগানের পোকা মারবার জন্যে যে জোলো ওষুধ পাঠানো হয়েছিলো তার অপব্যবহারের এই অপরাধে। কে জানে যে অজানা জল খেয়ে সিমফোরিয়ানের শরীরে বিষের ক্রিয়া সুরু হয়েছিলো এ সেই ওষুধ কিনা।

এখন, যখন আমি আমার লেখা শেষ করছি, অনেক শান্ত হয়ে এসেছে মন, আর আমার জীবনে অভিনব পরিবর্তন ঘটছে। এ কদিন তোলপাড় চলেছে দেশে, শহরে, আমার মনের মধ্যে। আমি চুপচাপ হয়ে বসে থাকি আমার ঘরে, একা বিচ্ছিন্নের মতো।

শেষে এক দিন দরজায় কে ধাক্কা মারলো। চেয়ে দেখি ফাদার রাফায়েল।

তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে তত চমকাইনি, যত তাঁর চেহারার পরিবর্তনে। উনি বললেন, কয়েক দিন তিনি কঠিন উপবাস করেছেন, ভেবেছেন আমাদের সন্ন্যাসীদের ভবিষ্যৎ আর প্রার্থনা করেছেন ঈশ্বরের কাছে যেন, মঠ রক্ষা পায়। বললেন শেষে, 'তোমার দুঃখও আমার চোখ এড়ায়নি ইগনাটি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোমাকে আর বাধা দিইনি, খুঁজতে দিয়েছি তোমাকে তোমার নিজের পথ। লক্ষ্য করেছি সব সময়েই তোমার পার্থিবতার দিকেই ঝোঁক। তোমার যা পাপ তা আমারই আত্মার উপর ভর করে আছে। তোমাকে পাঠিয়েছি আমি পৃথিবীর

আবর্তের মধ্যে, তোমার বয়সের অনুপাতে যা নির্দয় সেই পরীক্ষার কাঠিন্যে। বুঝতে পারছি, কতটা চঞ্চল হয়েছো তুমি। বেশ তো, তাই যদি তোমার ইচ্ছা, তুমি ফের ফিরে যাও পৃথিবীতে।'
মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলুম ফাদার রাফায়েলকে। এঁর ক্রিশ্চিয়ান করুণা আমরণ আমার মনের শক্তির উৎস হয়ে থাকবে।

কাল আমি গিয়েছিলুম আভডোটিয়া ইভানভনাকে সান্ত্বনা দিতে। এ বিষয়ে কী আমি লিখবো, কিছুই আসছে না আমার কলমে।
সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে পারি, আভডোটিয়া ইভানভনার বাড়ি থেকে ফেরবার সময় প্রেসিডেন্টের বাঙলোর কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলুম তার জানলা দিয়ে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে আলো, কিন্তু পর্দা টানা নেই জানলায়। প্রেসিডেন্ট টেবিলের কাছে বসে আছে, কি কতকগুলো কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে। তার মুখ কৃশ, কিন্তু ঐ কৃশতায় অনমনীয় দৃঢ়তা।
এবার আমার মনে আর কোনো ভয় এলো না, ঠিক সোজা হেঁটে গেলুম পথ দিয়ে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে তারই কথা চিন্তা করতে-করতে। স্বর্গের পাখি যেন গেয়ে উঠেছে মনের মধ্যে।
পরের সপ্তাহে, বুধবারে, বিগত যাজকের স্ত্রী আভডোটিয়া ইভানভনা আর আমি চলেছি বিগত ডিকন ইস্টকারির আফিসে, রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করবার জন্যে।

ইসাক বাবেল

চিঠি

আমাদের সৈন্যবাহিনীর এক ছোকরা, নাম কুরডিয়ুকফ, এই চিঠিটা আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলো বাড়িতে। অবিস্মরণীয় চিঠি। একটুও কাট-ছাঁট না করে, একটুও রঙ না চড়িয়ে, হুবহু লিখে দিয়েছিলাম আমি চিঠিটা, আর, অবিকল, একটুও উনিশ-বিশ না করে, জায়গার কথা জায়গায় রেখে তাই আমি ফের লিখে রাখছি এখানে।

"আমার প্রিয় মা, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা।

চিঠির প্রথমেই আগেভাগে তোমাকে জানিয়ে রাখছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে আছি, আর ভালো আছি এবং তাই প্রার্থনা করছি যেন তোমার কাছ থেকে এই সংবাদই আমি ফিরে পাই। তোমাকে আমি অভ্যর্থনা করি—ঠাণ্ডা মাটির উপরে মুখ রেখে প্রণাম করি তোমাকে—" (এইখানে আত্মীয়স্বজন, ধর্ম-বাপ ধর্ম-মা'দের এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। পরের অনুচ্ছেদে যাই এবার।)

"আমার প্রিয় মা, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা কুরভিয়াকোভা ; তোমাকে গোড়াতেই লিখছি, কমরেড বুডিয়ন্নির লাল ঘোড়সৈন্যের দলে আমি এখন আছি, আর এখানে আছে তোমার সেই ধর্ম-বাপ নিকন ভাসিলিয়েভিচ, সে এখন একজন লাল বীর। রাজনৈতিক অভিযানে সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো, যেখানে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে বই ও খবরের কাগজ বিলোই, মস্কোর—'ইজভেস্তিয়া,' মস্কোর 'প্রাভদা' আর আমাদের নিজের কাগজ, 'লাল অশ্বারোহী'। কী নির্মম

আমাদের কাগজ, আর সেইটেই পড়বার জন্যে, পড়তে পাবার জন্যে সবাই অস্থির, যাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ও-সব ঘৃণ্য পোলদের অবলীলাক্রমে তারা শেষ করে ফেলতে পারে। নিকন ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে বেশ ভালো আছি এখানে।

"মাগো, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা, যা-হয় আমাকে কিছু পাঠিয়ে দিও, যা কিছু পারো তুমি পাঠাতে। ফুট-ফুট দাগওয়ালা সেই শুয়োরটা মেরে পার্শেলটা ভাসিলি কুরডিয়ুকফের নামে পাঠিয়ে দিও, কমরেড বুডিয়ন্নির রাজনৈতিক বিভাগের ঠিকানায়। রোজ রাত্রে খিদে নিয়ে আমি ঘুমুতে যাই, কিছুই গায়ে দেবার নেই সঙ্গে, কী যে শীত করে, তোমাকে কী বলবো! স্টেপকার খবর দিয়ে আমাকে একটা চিঠি লিখো, ও এখনো বেঁচে আছে কি নেই—ওর কথা এত জানতে ইচ্ছে করে আমার—ওর সামনের পায়ে তেমনি আছে নাকি এখনো চুলকুনি, আর ওর পায়ে নাল লাগিয়েছো কিনা। আমার মা, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা, তোমাকে বলছি অনুনয় করে, রোজ সাবান দিয়ে ওর সামনের পা দুটো ভুলো না ধুয়ে দিতে। মূর্তিগুলির সামনে আমার সাবান ফেলে এসেছি, আর বাবা যদি তা ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলে থাকেন তবে ক্রাসনোডার থেকে কিছু কিনে এনো, ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন। তোমাকে আরো লিখছি, এ দেশটা ভারি গরিব, চাষারা তাদের ঘোড়া, আমাদের, মানে লাল ঈগলের দৃষ্টির থেকে লুকিয়ে রাখে বনের মধ্যে। গম হয়নি এবার মোটেই, আর, যা হয়েছে, এত ছোট যে দেখলে হাসি পায়। চাষারা সরষে বোনে, তাদেরো সেই দশা। বাঁশের খুঁটিতে গজাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো কী জিনিস, তা থেকে এখানে বেআইনি মদ তৈরি করে এরা।

"তারপর তোমাকে বাবার কথা কিছু লিখবো, কি করে আমার ভাই ফিয়ডর টিমফোইচ কুরডিয়ুকফকে গেলো বছর এমন দিনে মেরে

ফেলেছিলো সে। তখন কমরেড পাভলিচেনকোর অধীনে আমাদের লাল ফৌজ চলেছে রস্টফ আক্রমণ করতে, আমাদের দলে দেখা দিলো বিশ্বাসঘাতকতা। সে সময় বাবা ছিলো ডেনিকিনের সৈন্যবিভাগের দলপতি। সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সবাই বন্দী হলুম আমরা, আর ফিয়ডর টিমফোইচের উপর সরাসরি বাবার চোখ পড়লো। আর বাবা কাটতে সুরু করলো ফিয়ডিয়াকে, মুখে যা-নয় তাই গাল দিতে-দিতে ঃ খেঁকি কুত্তা, লাল কুত্তা, কুত্তির বাচ্চা—আরো অনেক সব জঘন্য গাল, প্রায় সন্ধে পর্যন্ত, যতক্ষণ না মরে গেলো টিমফোইচ। তখন তোমাকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, কি ভাবে তোমার ফিয়ডিয়াকে গোর দেওয়া হলো, মাটির উপর একটা ক্রুশও বসানো হলো না। কিন্তু বাবা ধরে ফেললো সে চিঠি-লেখা, আর উঠলো তক্ষুনি গর্জন করে, 'তোরা সব তোর মার বাচ্ছা, ওর পচা শেকড় রয়েছে তোদের শরীরে—আমি জন্ম দিয়েছি তোদের, আর তোদেরকেই আমি ধ্বংস করবো, সত্যের জন্যে, কী ভাবে চলতে হবে তা শেখাবার জন্যে।' আমাদের মুক্তিদাতা যীশুখৃষ্টের মতোই কষ্ট পেয়েছিলাম তার হাতে। কোনো রকমে পালিয়ে রক্ষা পাই সে-যাত্রা।

"আমাদের দলের উপর তখন হুকুম হলো ভরনেজ শহরে আমাদের যেতে হবে দল ভারী করবার জন্যে। সেখানে গিয়ে আরো অনেক সৈন্য পেলাম, পেলাম ঘোড়া, হ্যাভারস্যাক, রিভলভার আর-আর যা আমাদের দরকার। মা, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা, ভরনেজ সুন্দর ছোট্ট শহর, কিন্তু ক্রাসনোডারের থেকে বড়ো, লোকগুলি ভারি সুশ্রী আর তার নদী স্নান করার পক্ষে ভারি উপযোগী। দিনে দুই পাউণ্ড করে রুটি পাই আমরা, আধ পাউণ্ড করে মাংস আর চিনি যতটা দরকার। তাই ভোরে উঠে মিষ্টি চা খাই আমরা, খাই আবার বিকেলে, আগের সেই খিদে এখন ভুলে গিয়েছি। আর রাতের খাওয়ার সময় যেতাম ভাই

সেমিয়ন টিমফোইচের কাছে, কেক আর হাঁসের রোস্ট খাবার জন্যে। তারপর শুয়ে পড়তাম, ঘুমিয়ে যেতাম দেখতে-দেখতে।

"সে সময় তার দুঃসাহসিক বীরত্বের জন্যে সমস্ত রেজিমেণ্ট চাইছিলো সেমিয়নকে কম্যাণ্ডার করতে, আর সেই ভাবে কমরেড বুডিয়নিও হুকুম জারি করলো। ফলে সেমিয়ন পেলো ঘোড়া, খাঁটি পোশাক, তার নিজের জন্যে আলাদা করে এক গাড়ি সাজ-সরঞ্জাম, লাল নিশান আর সঙ্গে-সঙ্গে আমারো খাতির বেড়ে গেলো, আমি তার ভাই বলে। তাই, তোমার সঙ্গে পাড়ার কেউ যদি এখন লাগতে আসে, তবে তাকে কেটে দুটুকরো করে ফেলবার অধিকার জন্মেছে সেমিয়নের।

"তারপর লাগলুম আমরা সব সেনাপতি ডেনিকিনের সঙ্গে যুদ্ধে, তাকে ঠেলতে লাগলাম পিছনে, হাজার-হাজার সাবাড় করলাম তার সৈন্য, ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গেলাম তাকে কৃষ্ণসাগরের সীমানায়। কিন্তু কোথাও বাবার দেখা পেলাম না। এখানে-সেখানে সবখানে সেমিয়ন টিমফোইচ বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেননা ভাই ফিয়ডিয়ার মৃত্যু তার বুকে লেগে আছে মর্মান্তিক। মা, তুমি তো জানো আমাদের বাবাকে, কী সাংঘাতিক লোক, তাই সে করলো কি শোনো, তার লাল দাড়ি কালো করে বড়ো করলো, আর বাস করতে লাগলো গিয়ে মাইকফ শহরে। কেউ বুঝতেই পারলো না যে সে পুরানো জারের আমলের অশ্বারোহী পুলিশপ্রহরী। কিন্তু সত্য এক দিন প্রকাশিত হবেই। হঠাৎ এক দিন নিকন ভাসিলিয়েভিচ দেখে ফেললো তাকে এক কুঁড়ে ঘরে, আর চিনে ফেললো তখুনি। চিঠি লিখে জানালো সেমিয়ন টিমফোইচকে। তখনি প্রস্তুত করলাম ঘোড়া, দেড়শো মাইল রাস্তা ডিঙিয়ে গেলাম চক্ষের পলকে, আমি, ভাই সিম আর মজা দেখবার জন্যে আরো কটা ছেলে।

"আর কি দেখলাম আমরা সেই মাইকফ শহরে? যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে,

শহরে, যারা আছে, তাদের কোনো সহানুভূতি নেই সম্মুখ-সীমান্তের সৈন্যদের সঙ্গে—শহরের সর্বত্রই রাজত্ব করছে কৃতঘ্নতা—আর জারের আমলে যেমন এখনো তেমনি সেই ইহুদির দল। সেখানে ইহুদি-ছোঁড়াদের সঙ্গে সেমিয়নের একহাত ঝগড়া হয়ে গেলো কেননা তারা কিছুতেই বাবাকে সঁপে দেবে না সেমিয়নের হাতে। তারা বরং বাবাকে কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখলো, দরজায় তালা লাগিয়ে, বললে, 'কমরেড ট্রটস্কির হুকুম এসেছে যে কোনো বন্দীকেই খুন করা হবে না।' বললে, 'আমরাই বিচার করবো তার, তুমি চুপ করে থাকো, অপরাধ করে থাকে, সাজা পাবে নিশ্চয়ই।'

"কিন্তু সেমিয়ন টিমফেইচ নাছোড়বান্দা, প্রমাণ করে দেখালো, কমরেড বুডিয়নির সেই প্রতিনিধি, রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার, লাল নিশান সে বহন করছে, আর যে তাকে বাধা দেবে, তার বাবাকে সমর্পণ করে দেবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তার মুখোমুখি, কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে তাকে। সকল ছেলে একবাক্যে সমর্থন করলে সেমিয়নকে।

তারপর বাবাকে যখন সেমিয়ন হাতে পেলো, চাবুক মারতে লাগলো। তার চারদিক ঘিরিয়ে দিলো ছেলেদের দাঁড় করিয়ে। তারপর বাবার দাড়িতে জল ছিটোতে লাগলো সেমিয়ন, দাড়ির রং গেলো ধুয়ে। সিম তখন জিগগেস করলে টিমফেয়ি রডিয়োনভিচকে :

'আমার হাতে পড়ে কেমন লাগছে তোমার বাবা ?'

বাবা বললে, 'ভালো লাগছে না।'

'যখন তুমি ফিয়ডিয়ার গায়ে কোপ বসিয়েছিলে তখন তোমার হাতে পড়ে তার কেমন লাগছিলো ?'

'ভালো লাগেনি।'

'তখন একবারও মনে হয়নি তোমার যে তোমারো দিন ফের আসবে ?'

'না, মনে হয়নি একবারও।'

তখন সিম ঘুরে দাঁড়ালো জনতার দিকে, বললে, 'আমিও মনে করি, যদি তোমাদেরই হাতে পড়ি কোনো দিন,তবে আমাকেও তোমরা করুণা করবে না। আর, শোনো বাবা, তোমাকে আমরা মেরে ফেলবো—'
তখন টিমফেয়ি রোডিয়োনভিচ ক্ষিপ্তের মতো সিমকে গাল পাড়তে লাগলো, তোমাকে, ভাজিনকে,আর এক ঘুসি মারলো সিমের চোয়ালে। সেখান থেকে সিম আমাকে বার করে দিলো বাইরে, তাই মা, ইভডোকিয়া ফিয়ডরভনা, বর্ণনা করতে পারবো না, কী ভাবে ওরা বাবাকে মেরে ফেললো শেষ পর্যন্ত। আমাকে তখন দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
"তারপর আমরা আস্তানা গাড়লাম নভোরসিস্কে, শুকনো মাটির রেখা এ শহরেই এসে মিলিয়ে গেছে, এর পরে কেবল জল, কৃষ্ণসাগর, আর সেখানে থাকলাম আমরা মে পর্যন্ত—সেখান থেকে গেলাম পোল্যাণ্ডের সীমানায়, আর সেখানে মনের সুখে পোল ধ্বংস করছি···
"ইতি তোমার স্নেহের ছেলে, ভাসিলি টিমফোয়িচ কুরডিয়ুকফ। মাগো, স্টেপকায় দিকে নজর রেখো, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন···"
এই কুরডিয়ুকফের চিঠি, একটি কথাও তার বদলানো হয়নি। লেখা শেষ হলে চিঠিটা সে তার শার্টের নিচে বুকের উপর, বুকের চামড়ার সঙ্গে, লাগিয়ে রাখলো।
'কুরডিয়ুকফ', জিগগেস করলাম ছেলেটাকে, 'তোমার বাবা কি খুব খারাপ ছিলো ?'
'কুকুর ছিলো একটা।' মুখ অন্ধকার করে সে বললে।
'আর তোমার মা ?'
'মা-র তুলনা হয়না। এই দেখ আমাদের ছবি—'
বলে সে ভাঙা একটা ফটোগ্রাফ আমার হাতে দিলো। টিমফেয়ি কুরডিয়ুকফ, চওড়া কাঁধ, পরনে পুলিশের পোশাক, নিভাঁজ করে আঁচড়ানো

দাড়ি—নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, উদ্ধত গালের হাড়, আর বিবর্ণ বোকা চোখে নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধতা। এক পাশে, বাঁশের চেয়ারে, ছোটখাটো একটি চাষার মেয়ে বসে, গায়ে ঢিলে ব্লাউজ, ক্ষয়ক্ষীণ ভীরু অথচ উজ্জ্বল মুখ। পিছনে, দেয়ালে, গেঁয়ো ফটোগ্রাফারের কুৎসিত পর্দা, ফুল আর পায়রার ছবি। আর সেই পর্দা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে দুটি যুবক—লম্বা-চওড়ায় প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড মুখ, স্তম্ভিত চোখে বিশাল নির্বুদ্ধিতা—যেন কাওয়াজ করছে এমনি অনড় ভঙ্গি—দাঁড়িয়ে আছে তাদের দুই ছেলে ফিয়ডর আর সেমিয়ন।

নিকোলাই টিখনফ

ফিটস্

১

জার্মানদের বাহিনীর আগে-আগে, যেমন নিয়ম, চলছিলো দুজন স্কাউট, ঘোড়ায় চড়ে।

বড্ড বেশি এগিয়ে পড়েছিলো তারা, যাচ্ছিলো ঢিলে কদমে, গল্প করতে-করতে, যেন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, দেশের মাঠে। বালির মাঝে ঝরনার শব্দ শুনে গুটিয়ে যায় ঘোড়া দুটো—না, কিছুই ভয়ের নেই কোথাও। আবার চলে দুই ঘোড়সওয়ার, পাহাড়ী রাস্তা ধরে।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, একদল রুশ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর।

বড়ো জার্মানটা দ্রুত বাঁক নিয়ে পালিয়ে গেলো ঘোড়া ছুটিয়ে। ছোটটা হকচকিয়ে গেলো আর অমনি লপুখা ধরে ফেললো তাকে, ধরে ফেললো ঘোড়ার কেশর, বললে, 'ঢের হয়েছে, এবার নেমে পড়ো বাছাধন। এইখেনেই খতম হলো তোমার রাস্তা···'

ছোট জার্মানটা প্রায় ছেলেমানুষ। কাঁপতে-কাঁপতে পিছলে পড়লো ঘোড়া থেকে, ঘোড়াটাকে ওরা হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। ছেলেটার মুখে শুধু এক কথা, 'সাইবেরিয়া, এবার সাইবেরিয়া···'

ওর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ওকে এবার নির্ঘাৎ সাইবেরিয়ায় দেবে পাঠিয়ে, যেখানে শুধু শাদা ভালুক আর যেখানে ছুটির দিনে লোকেরা মোমবাতি খেয়ে থাকে।

'সাইবেরিয়ার বুলি ছাড়ো।' এক পাশে থুতু ফেলে বললে লপুখা।
'এখুনি আমরা দেবো তোমাকে কিছু খেতে, ভয়ে অমন হি-হি কোরো না।'

হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিলো ওরা জার্মানটাকে, আর সেইখান থেকেই এই গল্পের হলো সুরু। জার্মানটা ফেলে গেলো তার প্রকাণ্ড, লাল-লোমের ঘোড়া! সেটাকে লপুখা নিয়ে এলো তাদের স্কোয়াড্রনে, বললে, 'কে ঘোড়া হারিয়েছো? বলে ফেলো শিগগির।'

কেউই কোনো সাড়া দিলো না, কিন্তু অনেকেই গিয়ে ধরলো লপুখাকে। কে বললে, 'পুরমেল তার ঘোড়া হারিয়েছে।'

'নিয়ে এসো তাকে এখানে।'

টেনে নিয়ে আসা হলো পুরমেলকে। বেঁটে-খাটো দুবল চেহারার মানুষ, কিন্তু ভারি চটপটে। ওর ঘোড়া মারা গেছে যুদ্ধে, অন্তত এই কথাই সে বলে এসেছে এত দিন। এখন ভয়ে-ভয়ে এক বার লপুখার দিকে, আরেক বার ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে সে বললে অনুৎসাহিতের মতো, 'এই ঘোড়া আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, এই ঘোড়া।' বললে লপুখা: 'পয়লা নম্বরের জার্মান ঘোড়া। নাম রেখো এর, ফ্রিট্‌স্‌।'

ঘোড়াটা এক পা ছেড়ে আরেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, তাকালো তার চার পাশে। নতুন মুখ আর নতুন গন্ধে কিরকম অদ্ভুত লাগছিলো তার, জোরে-জোরে কান নাড়তে লাগলো। বিশালকায় লাল রঙের ঘোড়া, পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ, কি-রকম যেন একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ভাব তার চাউনিতে।

'আশা করি ভালো থাকবে ও তোমার হেপাজতে।' বললে লপুখা। পুরমেল ঘোড়ার ঘাড়ে একটা সাদর চড় মারলো আর তাকে নিয়ে চললো আস্তাবলে।

২

রুশ ঘোড়সৈন্যরা ঘোড়ায় জিন পরিয়ে আছে আদেশের প্রতীক্ষায়।

'চড়ো।' চেঁচালে লপুখা।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো ঘোড়াগুলো আর সৈন্যেরা উঠলো যার-যারটায়, কিন্তু একটা ঘোড়া হটাৎ আড় হয়ে ঘেঁসে দাঁড়ালো দেয়ালের দিকে। সে একটা বৃহৎকায় লালরঙের ঘোড়া।

সবাই উঠেছে নিজের-নিজের ঘোড়ায়, শুধু পুরমেলই ছুটছে তার ঘোড়ার পিছু-পিছু, কথা বলে চেঁচিয়ে তাকে থামাতে চেষ্টা করছে:

'থাম্ থাম্, কোন দিকে যাচ্ছিস তুই হতভাগা?'

যতই চেঁচায় ততই ঘোড়া কেবল পরিখার দেয়ালের দিকে ঘেঁসে-ঘেঁসে আসে।

পুরমেল কি করে জানবে, ঘোড়ার জার্মান আরোহী চিরকাল চেপেছে এই দেয়ালের দিক থেকে, তেমনি করেই অভ্যস্ত করেছে ঘোড়াকে।

আর সব সৈন্যরা তুলেছে হট্টরোল। ঘোড়াটা দেয়ালের উপর প্রায় পিষে ফেলছে পুরমেলকে, কিছুতেই রেকাবে সে পা ঢোকাতে পারছে না। দুঃখে, রাগে, অপমানে পুরমেল গরম হয়ে উঠছে। সমস্ত স্কোয়াড্রনের সামনে শেষ পর্যন্ত তাকে উঠতে হলো দেয়ালের উপর, তারপর চাপতে হলো ঘোড়ায়, তবেই সে-ঘোড়া একান্ত বাধ্য হয়ে শান্তভাবে লাইন ধরলো গিয়ে।

'কাণ্ড দেখো একবার! দেয়ালে দাঁড়িয়ে ঘোড়া চাপে।'

তিন স্তম্ভে এগিয়ে যাবার কথা তাদের, কিন্তু লপুখা লক্ষ্য করলো, একটা লোক হঠাৎ চতুর্থ স্তম্ভ সৃষ্টি করেছে।

আর-আর ঘোড়ারা প্রতিবাদের শব্দ করছে, কাঁধের ঘসা দিচ্ছে, আর সে লোক একবার বাঁয়ের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আগে, আরেকবার ডাইনের থেকে।

'এ কী বাদরামি !' চেঁচিয়ে উঠলো লপুখা।

কিন্তু যতই কেননা সে চেষ্টা করুক, আর আরবা দল থেকে বার করে দিচ্ছে সে বিদেশীকে, অনধিকারীকে। একরাশ ধূলোর মধ্যে থেকে দেখতে পেলো লপুখা, যে একটা লোক এক বৃহৎবপু লাল ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে এ-পাশে ও-পাশে অসহায়ের মতো টানাটানি করছে শুধু। লপুখা চিনতে পারলো পুরমেলকে।

বললে সে চেঁচিয়ে, 'অত মাথা-গরম কোরো না। ডান দিক থেকে লাগাম টানো—মুঠ ছোট করে আনো, লেজের দিকে সরে বসো।'

'পারছি না।' পুরমেল বললে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায়। 'হুনটা আমাকে মানছে না একদম। কোনোই কাওয়াজ শেখেনি ও।'

সত্যি, অন্য ঘোড়াগুলোর দিকে ফ্রিট্সের ভঙ্গিটা শত্রুর ভঙ্গি। নতুন মানুষের ঘোড়া, ঘাড় বেঁকিয়ে তেড়ে-তেড়ে উঠছে সে। আর পুরমেল কিছুতেই তাকে লাইনে আনতে পারছে না ঠিক মতো।

লপুখা চাপা অথচ তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো : 'পেছন ফেরো, আমাদের তিরিশ পা পেছনে এসো, বোকা, উজবুক কোথাকার।'

পুরমেল আসতে লাগলো আমাদের তিরিশ পা পিছনে, জাতিচ্যুতের মতো, আর তার লাল ঘোড়া কখনো লাগলো হাঁটু গেড়ে বসতে, কখনো বা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে। জানে না সে রুশ কাওয়াজ—একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে সে। ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এক ঝরনার ধারে, এত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো যে পুরমেল ছিটকে খসে পড়লো পিঠ থেকে।

রাগে লাল হয়ে পুরমেল চাবুক মারতে লাগলো ফ্রিট্স্‌কে।

'ঘোড়া মারছো !' গর্জন করে উঠলো একজন অশ্বারোহী অফিসার। 'তিন দিন তোমাকে পাহারায় থাকতে হবে। ফিল্ড-অর্ডার জানো না তুমি ?'

‘জানি স্যর, না স্যর।’ আমতা-আমতা করতে লাগলো পুরমেল।

‘কী ফিল্ড-অর্ডার?

‘মনে নেই, স্যর।’ ফ্রিট্‌সের দিকে তাকিয়ে বললে পুরমেল। চোখে তার নিদারুণ ঘৃণা।

‘ভুলে গেছো এরি মধ্যে? দশ দিন।’

তারপর সেই সন্ধেয় আপাদমস্তক সসজ্জ হয়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে পুরমেল লেগে গেলো পাহারার কাজে, সম্পূর্ণ ফিল্ড-কিট গায়ে চাপিয়ে, এক পাশে গ্যাস-মুখোস ঝুলিয়ে,পিঠে রাইফেল বেঁধে। দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে সেই দুর্বিনীত ভঙ্গিতে, ভঙ্গিটা যদিও খুব মহিমাময়, তবু কেমন-যেন মানাচ্ছিলো না পুরমেলকে।

এক সপ্তাহ পরে, এক সন্ধ্যায়, পুরমেল তার দলের সঙ্গে বসেছে আগুনের সামনে।

‘ওটাকে আর সহ্য করতে পারছি না। ঐ লাল গরুটা আমাকে সর্বস্বান্ত করবে।’

‘কেন ও কি তোমাকে ফেলে দিয়েছে কখনো? কেন, ঠিক মতো ছুটতে পারেনা ও?’ বললাম নিরপেক্ষর মতো।

‘আমাকে ও শেষ করবে একেবারে। এরি মধ্যে এক হপ্তায় দশটা প্যারেড আর চারঘণ্টা ফিল্ড-ডিউটি হয়ে গেছে আমার। এরকম যদি চলতে থাকে তবে ঘোড়া বাগ মানবার আগেই আমি শেষ হয়ে যাবো।’

৩

যখন আমরা রাস্তায়, তখন এক নাগাড়ে তিন দিন পর্যন্ত আমরা ঘোড়ার জিন খুলিনি, ঘসামাজা করিনি ওদের। নিজেরাই বা স্নান করেছি নাকি? যদি কোথাও জল মিলেছে, মুখে একটু ছিটিয়ে দিয়েছি মাত্র, তাকিয়েও দেখিনি চেহারা কি রকম!

কিন্তু যখন সত্যি-সত্যি থেমেছি কোথাও, তখন পরিচ্ছন্ন হবার ডাক পড়েছে। কেননা ঘোড়া পশুর মধ্যে কুলীন, শ্রীমান, তার দরকার চেকনাই, দরকার পরিচ্ছন্নতা।

এক দিন সকাল বেলা পুরমেল দেখতে পেলো ফ্রিট্‌সের পেটে কাদার গদি পাতা। শুকনো কাদা, প্রায় মিছরির মতো শক্ত। যদি এখন মোটা দাঁড়া-ওয়ালা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো যায় তা হলে ওর লাগবে, তাই আঙুল দিয়ে পুরমেল তুলতে চেষ্টা করলো সে শুকনো কাদার চাপড়া। কিন্তু সেই বিপুলবপু লাল অশ্ব কেবলই মোচড়ামুচড়ি খেতে লাগলো আর গোঙাতে লাগলো অদ্ভুত মেয়েলি গলায়। 'খুব কাতুকুতু লাগছে, তাই না?' বিড়বিড় করে বললে পুরমেল, 'তাই বুঝি ভাবছো তোমার পেট চুলকোবার জন্যে হাতে আমি দস্তানা পরে নেবো। কী আমার বেরালের বাচ্ছা রে।'

ফ্রিট্‌স্ এখন শুয়োরের মতো চেঁচাচ্ছে, আর সব ঘোড়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ক্রমশ সে চীৎকার অসহ্য হয়ে উঠলো অন্যান্য ঘোড়ার কাছে। মুহূর্তে সমস্ত আস্তাবল হ্রেষা-কম্পিত হয়ে উঠলো। ফ্রিট্‌সের প্রতিবেশিনী, এক ঘোটকী, নাম "সজ্জাবতী"—তার ভোঁতা হলদে দাঁত দিয়ে পুরমেলের কোমরে এক ঘা মারলো।

তার শার্ট গেলো ছিঁড়ে আর তার গায়ের খানিকটা ছাল গেলো উঠে।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো পুরমেল: 'তোমাদের জন্যে দশ-দশটা প্যারেড আমার হয়ে গেছে, এখন আবার আমাকে খেতে হচ্ছে দাঁতের গুঁতো।'
আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো সে বাইরে, রাগে আর হতাশায়, আর সে নেহাৎ অল্পবয়সী আর অনভিজ্ঞ বলেই কাঁদলো একটু গোপনে বসে।
জল দিয়ে গা ধোবার জন্যে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমস্ত উঠোন ঘোড়ায় ভরতি, কেউ খাচ্ছে জল, কেউ বা জলে মাথা ডুবিয়ে রাখছে। সবাই যখন চলে গেছে উঠোন ছেড়ে, পুরমেল হঠাৎ লক্ষ্য করলো, ফ্রিট্স্ আর-দু'টা ঘোড়ার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে,জল খাচ্ছে একসঙ্গে, নাক ঝাড়ছে একসঙ্গে, এমন ভাব যেন দশ বছর ধরে চেনা আছে পরস্পরের। ফ্রিট্স্‌কে কেউ ধরে নেই, সে আলগা, স্বাধীন, জল খাচ্ছে সে নিজের মনে। মেয়েদের মতো একে অন্যের গা-টেপাটেপি করছে ঘোড়া তিনটে।
বিষাক্ত হাসি হেসে পুরমেল বললে, 'খুব দল পাকিয়েছো যে—পাজি, হুন কোথাকার।'
সইসটা তার দাড়ির মধ্যে হাসি ফুটিয়ে রেখে বললে, 'আহা, নিক না ওরা একটু গল্প করে। অন্য ঘোড়া দুটোও জার্মান। পাজির একশেষ।'
'ও দুটো তোমার জীবন দুর্বিসহ করছে নাকি?' জিগগেস করলো পুরমেল।
'শালারা মরলে পরে হাড় জুড়োয়। দগদগে ঘার মত অসহ্য। কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না শালাদের।'
পুরমেল অসীম শান্তি পেলো, তার দুর্ভাগ্যেরও একজন সঙ্গী আছে।
আমি বললাম পুরমেলকে, 'তুমি মুখায়েডিনাওফের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো না কেন? ও একজন মহাপুরুষ বলতে পারো। এমন ঘোড়া নেই যার লেজ ও ওর আঙুলের সঙ্গে বেঁধে না ঘোরাতে পারে। একবার ওর পরামর্শ নিলে পারো।'

'চুলোয় যাও তুমি।' পুরমেল রেগে টং।

কিন্তু যাই বলো, পুরমেল ভেবে দেখলো আমার কথাটা, পরে সত্যি দেখা করতে গেল মুখায়েডিনাওফের সঙ্গে। লোকটা জামার বোতাম খুলে বসে টিনের মগে করে সেদ্ধ মাংসের ঝোল খাচ্ছে।

চারটে সৈন্য ওকে ঘিরে বসেছে, আর ও টুকরোর পর টুকরো মুখে পুরছে আর ঝোল-মাখা আঙুলগুলো মুছছে তার প্যাণ্টে, ঢোক গিলে-গিলে গলা খালি করছে।

'এই যে পুরমেল যে,' অভ্যর্থনা করে ওর দিকে সে বাড়িয়ে ধরলো একটা মগ, 'নাও, লেগে যাও।'

'খবরদার, ছুঁয়োনা, পুরমেল।' আর-আর সৈন্যেরা প্রতিবাদ করে উঠলো, 'বাজি ধরেছি আমরা। গোটা একটা ঘোড়ার বাচ্ছার মাংস ওকে একা খেতে হবে—চার-চারটে মগ, এক সঙ্গে।'

'আঃ, কি চমৎকার মাংস! একটু খেয়ে দেখো না সত্যি—' বললে মুখায়েডিনাওফ।

পুরমেল ভয়ে-ভয়ে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'মুখায়েডিনাওফ, তোমার সঙ্গে একটু কাজ ছিলো। এক মিনিট আসবে বাইরে?'

'বাইরে কেন? এখানেই বলো না।'

মগ চারটের দিকে তাকিয়ে—দুটো খালি আর দুটো ভরতি—পুরমেল অবাক হয়ে গেলো। অবাক হয়ে গেলো মুখায়েডিনাওফের হজমের ক্ষমতা দেখে।

কিছুক্ষণ পরে মুখায়েডিনাওফ বাইরে এলো বেরিয়ে, শুনলো পুরমেলের কাহিনী, বললে,'জার্মান ঘোড়া রাশিয়ানকে বোঝে না একদম,ওদের অন্য-রকম কাওয়াজ, অন্যরকম ভাষা, অন্যরকম ধর্ম। তুমি এখন থেকে ওটাকে তোমার মতো করে অভ্যেস করাও। কিছু চিনি আর জল আর খানিকটা

ভালো খড় ওকে খেতে দাও—কতক্ষণ পাইচারি করাও, তারপর হুনদের একটা বই কিনে এনে নিজে ভাষাটা শিখে নাও, সেই ভাষায়, ওর সঙ্গে কথা বলো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিন হপ্তার মধ্যে দেখবে এক পাত সিল্কের মতোই ও নরম, সহজ হয়ে গেছে। তখন ওকে দিয়ে যা খুশি তুমি করো, কিচ্ছু ও আপত্তি করবে না।'

পরের বার আমরা যখন বেরুলাম, পুরমেল ফ্রিট্‌স্‌কে একটু সমুদ্র-স্নানের স্বাদ দিতে গেলো। ফ্রিট্‌স্‌কে জলে নামায় এমন সাধ্য কী। আর জলে যদি একবার নামানো হলো, অমনি সে প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড়। সওয়ার শুদ্ধু সে পড়লো চিৎপাত হয়ে। পারে ফের উঠে আসবার আগে পাচ-পাচটে প্রকাণ্ড ঢেউ পর-পর ভেঙে পড়লো, তাদের উপর।

শেষে এক বুড়ির দোকান থেকে কিনলো সে এক জার্মান ব্যাকরণ, আর শিখতে লাগলো একমনে।

বালির বাঁধের বাইরে নিয়ে যেতো সে ফ্রিট্‌স্‌কে, যেখানে লোকজনের আভাস নেই বিন্দুমাত্র। ফ্রিট্‌স্‌কে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সে কথা বলতো তার সঙ্গে জার্মান ভাষায়, যেন পড়ুয়াকে পড়া শেখাচ্ছে গুরুমশায়।

'মান সোলডাট—মানে, আমি।' নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে শেখাতো সে ফ্রিট্‌স্‌কে। তারপর এক গোছা ঘাস ফ্রিট্‌সের দিকে এগিয়ে ধরে বলতো, 'ভোল্‌ন্‌ সি ফ্রেসেন ? খিদে পেয়েছে, খাবে ?'

ফ্রিট্‌স্‌ মাথা নেড়ে এগিয়ে আসে ঘাসের দিকে।

তারপর জিনের উপর বই-হাতে চেপে বসে পুরমেল। বলে, 'যখন আমি বলি রেখ্‌টস্‌, তখন ডাইনে—রেখ্‌টস্‌, রেখ্‌টস্‌—'

এক দিন সকালে, সৈন্যেরা যখন পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরি হচ্ছে, পুরমেল দেখলো 'সজ্জাবতী' যেন কী চিবিয়ে-চিবিয়ে খাচ্ছে, যা ঠিক খড়ের মতো নয়। কাছে এগিয়ে আসতেই 'সজ্জাবতী' উগরে দিলো তার

খাদ্য—সেটা আর কিছু নয়, পুরমেলের জার্মান ব্যাকরণের ভুক্তাবশেষ। তাকালো সে একবার ফ্রিট্‌সের দিকে। সমবেদনায় ফ্রিট্‌স্ একবার মাথা নাড়লো।

ক্রমে-ক্রমে পুরমেল একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো। এক দিন বললে আমাকে: 'যাই কেননা করি, কিছুতেই কিছু হয় না। ওটার দেহে যেন প্রাণ নেই, উত্তাপ নেই। জীবনে এত প্যারেড করিনি কোনো দিন। পুরো ভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। উঠলাম ফ্রিট্‌সের উপর, ছুটিয়ে নিয়ে গেলাম নদীর পার পর্যন্ত, আবার ফিরিয়ে আনলাম ছুটিয়ে, এমনি ভাবে অনবরত যতক্ষণ না ঘেমে কাদা হয়ে গেলাম দুজনে—তারপর ওকে সিধে চালিয়ে নিয়ে গেলাম জলের মধ্যে।'

'বলো কি, ফেনা বেরুচ্ছে যখন ঘোড়ার গা থেকে, তখনই ওকে জল খাওয়ালে?'

'মরুক শালা—'

'ছি, তারপর ওর গায়ে, মাংসপেশীতে কি খিল ধরলো?'

'খিল না হাতি! কিছুতেই ওকে জল খাওয়াতে পারলাম না। যতই ওকে মারি ততই ও বেআক্কেল হয়ে ওঠে, কিছুতেই খেলো না এক ফোঁটা।'

'তুমি ভারি মুস্কিলে পড়েছো দেখছি। শেষ কালে একদিন না তোমার অসুখ হয়ে যায়।'

এমনি সময় লপুখা আর মুখায়েডিনাওফ ঘরে ঢুকলো। দুজনেই টেনে এসেছে খুব। এ রকম বন্য মুখ কখনো দেখিনি। শাদা-মতন কি কতকগুলো বল শূন্যে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে লুফছে লপুখা। হাতে নিয়ে দেখি ছোট-ছোট প্যাণ্ট কতগুলো, রবারের বেলুনের মতো করে ফুলোনো।

'যদি হারই হয় শেষ পর্যন্ত, গান গেয়ে হেরে যাবে।' বললে লপুখা, 'একত্র হয়ে খেয়ে যাও মদ। কাল সব মরে যাবো আমরা।'

'চালাও।' বললে মুখায়েডিনাওফ, 'বাজারে আর খাঁটি ঘোড়ার বাচ্ছাও পাওয়া যাচ্ছে না কিনতে। চালাও।' বলে বাড়িতে তৈরি এক বোতল ভডকা সে বার করলে পকেট থেকে।

'শালা কর্নেলই টানছে পুরোদমে।' বললে লপুখো, 'জার্মানরা শিগগিরই আমাদেরকে লাথিয়ে হটিয়ে দেবে এখান থেকে—সবাই সরে যাবে, কেবল আমরাই থাকবো এখানে যুদ্ধ করতে।' বোতলের মুখে গোজা সে চুমুক মারলো।

'আমরা পড়ে থাকবো পিছনে।' মুখ গোমড়া করে বললে মুখায়েডিনাওফ। 'বাজবে সমস্ত শিঙা, কিন্তু আমাদের পিছনে পড়ে থাকবে নদী, মস্ত নদী। আমরা প্রত্যেকে ডুবে মরবো সে-নদীতে।'

'তা হলে এই প্যাণ্টে আর লাভ কী? আমরাই যদি ডুবি, আমাদের প্যাণ্টও ডুববে।' বললাম আমি।

আর এক ঢোঁক গিলে মুখায়েডিনাওফ বললে, 'কর্নেল বলছে, কাল আমাদের একটা মহড়া। সমস্ত স্কোয়াড্রন নদীতে নামবে—আর কোথাও যেন পার নেই এমনি ভাবে তলিয়ে যাবে জলের মধ্যে। ডোবা যায় কী করে জলের মধ্যে যদি সঙ্গে নৌকো না থাকে! উড়িয়ে দাও তোমার জাঙিয়া, তারপর ডোবো।'

'কিন্তু কর্নেল কি বলবে?'

'হয় গার্ড-ডিউটি দেবে, নয় দেবে আর কোনো শাস্তি।' বললে মুখায়েডিনাওফ, 'কিন্তু বিনিময়ে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে যা হোক। সবাই আমরা ভীষণ বিশ্রী আছি, যেমন পেটের মধ্যে আমার সদ্য-খাওয়া ঘোড়ার বাচ্ছাটা।'

এই রকম ওদের কথাবার্তা, মধ্য রাত পর্যন্ত, মদ্যপানের সঙ্গে-সঙ্গে।

পুরমেল চলে গেলো আস্তাবলে, ফ্রিট্‌স্‌কে বাড়তি খানিকটা খড় দিলে খেতে। বললে, 'খেয়ে নাও, খেয়ে নাও চট করে। কাল তুমি জলে ডুবে

মরবে। এই তোমার শেষ খাওয়া।'

পর দিন সকালে নদী উলঙ্গ মানুষে পূর্ণ হয়ে গেলো। ওরা সবাই পিছু-হটার মহড়া দিচ্ছে। যারা ভালো সাঁতার কাটতে পারে তারা ঘোড়ার লেজ ধরে পেরিয়ে যাচ্ছে কোনো রকমে, আর যারা পারে না তাদের জন্যে নদীর এ-পার থেকে ও-পারে দড়ি ফেলে দেয়া হয়েছে, তাই ধরে-ধরে খাবি খেতে-খেতে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। ভেলায় করে জিন আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর যারা নেহাৎই ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে ডিঙিতে।

ঘোড়ারা কোলাহল করছে, করছে সৈন্যরা, কিন্তু কর্নেল, ষাঁড়ের মতো স্থূল আর জাঁদরেল, পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে এ-মোড় থেকে ও-মোড়, চেঁচাচ্ছে সকলের চেয়ে উঁচু গলায়, যাকেই মনে হচ্ছে অপটু তার গায়ে ছুরির খোঁচা মারছে। সমস্ত সৈন্যকেই একসঙ্গে দিচ্ছে ফিল্ড-পানিশমেণ্ট, ফেটে পড়ছে হুমকিতে, দাবড়িতে পিলে চমকে যাচ্ছে সবাইর। শেষকালে চলে এলো যেখানে ফ্রিট্‌স্‌কে পাশে নিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে পুরমেল।

সাত জনে মিলে ফ্রিট্‌স্‌কে নদীতে টেনে নিয়ে চলেছে আর ফ্রিট্‌সের যত দূর সাধ্য ঠেকাচ্ছে সে টান, নিশ্বাস ফেলছে জোরে-জোরে, এ-পাশ থেকে ও-পাশে দোল খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আরো জোর চাপিয়ে টেনে নিয়ে গেলো ওকে জলের মধ্যে আর জীবনে এই প্রথম ফ্রিট্‌স্‌ চাট ছুঁড়তে লাগলো।

'নিয়ে যাও শুয়োরের বাচ্চাকে, টেনে নিয়ে যাও জলে, জলের মধ্যিখানে।' গর্জন করে উঠলো কর্নেল।

আর ওরা ফ্রিট্‌স্‌কে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো। উলঙ্গ পুরমেল, দড়ির থেকে থেকে-থেকে খসে পড়ে হাত, থেকে-থেকে তলিয়ে যায় নদীর মধ্যে, দেখতে পেলো এক ফাঁকে, ফ্রিট্‌স্‌কে ওরা টেনে নিয়ে

এসেছে ডুব-জলে। যতক্ষণ পারের কাছেকার অল্প জলের মধ্যে ছিলো, ফ্রিট্‌স্‌ ছুঁড়েছে তার পা, কিন্তু ক্রমশই যখন ওকে টেনে আনা হলো গভীরতর জলের মধ্যে, ফ্রিট্‌স্‌ এমন একটা দৃঢ় ভঙ্গি করলে স্তব্ধ হয়ে যেন সে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবে।

পুরমেল তখন এমন নাকানিচুবুনি খাচ্ছে যে ফ্রিট্‌সের কী হলো নজর রাখতে পারেনি। তার নিজের মুখে, নাকে, কানে, সর্বত্র জল, সে ডুবে যাচ্ছে জলের ভারে। কোনো মতে দড়ির শেষ প্রান্তে এসে সে পা দিয়ে ঠাণ্ডা বালির স্তর টের পেলো,আরো বিশ পা হেঁটে সে দাঁড়াতে পারলো পারে এসে। আর কতগুলো নগ্ন সৈন্যের পাশে বসে রোদ্দুরে দম নিতে লাগলো কর্তাদের চোখ এড়িয়ে।

পুরমেলের পাশে বসে আছে এক সম্ভ্রান্ত নগ্ন ব্যক্তি, সে শিঙা বাজায় আঙুল দিয়ে বিলি কেটে চুল আঁচড়াবার চেষ্টা করছে।

'ভুলো না এমন স্নানের ঘটনাটা।' নিজের মনে বিড়বিড় করে বলছিলো সে, 'ভুলো না তোমার মার তিন ছেলে, আর দুটো ছেলের ঠিক বুদ্ধি ছিলো পুরোপুরি, আর তৃতীয়টার কাজ হয়েছে শিঙায় ফুঁ দেয়া। হায়, এই বয়সে এই গোখুরি!'

পুরমেল তার কথায় কান দিলো না। দেখছিলো, তার ঘোড়া কোথাও দেখা যায় কিনা।

'ডুবেছে নিশ্চয়ই।' পরম আরামে সে গরম বালির উপরে উপুড় হয়ে শুলো পা ছড়িয়ে। আর অমনি তার চোখ পড়লো, একটা প্রকাণ্ড লাল রঙের ঘোড়া নদীর থেকে উঠে আসছে, গা ঝাড়তে-ঝাড়তে, হোঁচট খেতে-খেতে, চার দিক তাকাতে-তাকাতে। গুলি-খাওয়ার মতো পুরমেল চমকে উঠলো, একটা আস্ত ভারী পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ফ্রিট্‌সের দিকে—পৌঁছুলো না শেষ পর্যন্ত। ফ্রিট্‌স্‌ আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে গেলো পার ধরে।

ঘোড়সৈন্যদের সঙ্গে ছিলো একটা গোলন্দাজ-বাহিনী। তারা পরিষ্কার করছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, জুয়ো খেলছে তাস দিয়ে, মদ খাচ্ছে, তাদের ঘোড়া নাওয়াচ্ছে, ঝগড়া করছে ঘোড়সৈন্যদের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা কাণ্ড যা যেমনি অদ্ভুত তেমনি অসভ্য।

তিনটে গোলন্দাজী ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ফ্রিট্‌স্‌কে। কিন্তু ফ্রিট্‌স্‌ সেই আগের লাল ফ্রিট্‌স্‌ নয়, তরমুজের মতো ছিট-ছিট দাগ তার গায়ে। পেটের উপর যেমন, পিঠের উপরেও তেমনি সবুজের ডোরা কাটা। সামনে দাঁড়িয়ে পুরমেল, বালতির মধ্যে বুরুশ ডুবিয়ে বাড়তি রঙটা বাইরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়ার গায়ে আঁচড় টানছে, চিত্র-বিচিত্র করছে, মনের উদ্দাম খুশিতে।

ঘোড়ার পাছায় নানা আকারের ত্রিভুজের ছবি, সবুজ সাপ আর সব দুর্বোধ চিহ্ন। গোলন্দাজ সৈন্যরাও তাদের ঘোড়ায় সবুজ রঙ লাগাচ্ছে। ঘোড়াগুলো বিস্ময়ে সহ্য করছে এই যন্ত্রণা।

'পুরমেল, এ হচ্ছে কী?' বললাম এগিয়ে এসে।

'চুপ করো, বাধা দিও না। হারামজাদা ঠিক মরবে।' একগাদা রঙ ফ্রিট্‌সের নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো সে বুরুশের বাড়ি মেরে।

গোলন্দাজ সৈন্যেরা খুব চটপট কাজ সারছে তাদের। ছদ্মবেশে আচ্ছাদন করছে তাদের ঘোড়া—সামরিক বিজ্ঞানের এই নির্দেশ, যত দূর সম্ভব সমস্ত কিছুকে সবুজ করো।

বেচারা ফ্রিট্‌স্‌ দেখছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

সেই সন্ধেয় পুরমেলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো। দেখলাম গার্ড-হাউসের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে অসহ্য বিকৃতি। ফিল্ড-পানিশমেণ্ট হয়েছে তার।

আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলো আর তার হাতের তলোয়ার এমন ভাবে কেঁপে উঠলো যেন সেটা এখুনি ছিটকে এসে পড়বে আমারই

মাথার উপর। 'এসো না বলছি কাছে।' বললে পুরমেল, 'মাথা কাটা পড়তে পারে কিন্তু।'
দূরে সরে দাঁড়ালাম। বললাম, 'কী হয়েছে, কেন এ শাস্তি? হারামজাদা কি মরেছে?'
পুরমেল আমার দিকে তাকালো ক্রুদ্ধ চোখে। বললে, 'স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার বলেছে যে ফ্রিট্‌সের গায়ে আর এক বিন্দু সবুজ দেখলে আমার কোর্ট-মার্শাল হবে।'
'তাহলে ফ্রিট্‌স্ বেঁচে আছে এখনো?'
'শুধু বেঁচে আছে? দুঘণ্টা জল আর সাবান ঘসে ওকে পরিষ্কার করেছি, আমার হাত ফেটে গেছে রগড়াতে-রগড়াতে—' বললে পুরমেল, আর তার হাতের তলোয়ার আবার কেঁপে উঠলো।

৪

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে ঘোড়সৈন্যেরা নতুন জায়গা নিচ্ছে। হঠাৎ সমস্ত বাহিনী দাঁড়িয়ে পড়লো, কার মালগাড়ি গিয়েছে উলটে, পরিখার মধ্যে, আর ঘোড়াগুলো জিভ বের করে পা ছুঁড়ছে। পুরমেল দেখলো এ সেই লোক যে সেদিন তার ঘোড়া দুটোকে নিয়ে এসেছিলো স্নান করাতে।

'শালা হূন, কিছুতেই বুঝবে না রাশিয়ার ভাষা।' লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো।

পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে গাড়িটাকে আরো বেশি কাদার মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে ঘোড়া দুটো। পুরমেল ফিক-ফিক করে একটু হাসলো। হঠাৎ একটা চীৎকার উঠলো—এরোপ্লেন—আর তক্ষুনি একটা জার্মান উড়ো জাহাজ জঙ্গলের দিক থেকে এসে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেলো।

'ছড়িয়ে পড়ো সবাই, ছড়িয়ে পড়ো।' ঘোড়াগুলো ঝোপঝাড় ছেড়ে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে, আর সৈন্যরা লুকোলো গাছের তলায়। একটা মাটিতে-শোয়া গাছে প্রচণ্ড হোঁচট খেয়ে ফ্রিট্‌স্‌ গড়িয়ে পড়লো পরিখার মধ্যে।

লাগাম ধরে প্রবল ভাবে টানাটানি করতে লাগলো পুরমেল, কিন্তু ফ্রিট্‌স্‌ শুয়ে রইলো তো শুয়েই রইলো, এত আরামের ভাব, যেন সে ঘুমোবে এবার। রাস্তা আবার দেখতে-দেখতে ভরতি হয়ে গেলো সৈন্যে, কিন্তু ফ্রিট্‌সের ওঠবার নাম নেই।

সবাই পুরমেলকে ঘিরে ধরে যুক্তি দিতে লাগলো কী করে তোলা যায় ফ্রিট্‌স্‌কে। পুরমেল একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদাতে ডোবানো, তবু তার জিনটাই এখনো সে আলগা করতে পারছে না। লপুখা তিন-তিনটে লোক দিলো পুরমেলকে সাহায্য করতে। ওরা

একটা কাঠের কুঁদো ফ্রিট্‌সের নিচে এনে রাখলো আর তাতে চাড় দিয়ে বহু কষ্টে ফ্রিট্‌স্‌কে পাশ ফেরালো। ঘুরতে লাগলো ফ্রিট্‌সের চোখ, যেন মরে যাবে ও এক্ষুনি।

চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে ফেললো পুরমেল, খসিয়ে নিলো জিন, আর অমনি চোখের পলকে ফ্রিট্‌স্‌ খাড়া হয়ে উঠলো আর এক লাফে ডিঙিয়ে গেলো পরিখা, গা বেয়ে আঠার মতো কাদা লাগলো ঝরতে।

'কিছু দূরে একটা ঝরনা আছে এখানে।' বললে লপুখা, 'যাও, ওকে ধুয়ে পরিষ্কার করে আনো। যাও, ওঠো—'

'আমি কি ওর ধাই?' পুরমেল বললে প্রায় হতাশার সুরে, 'যখন আমি বেশ চুপচাপ থাকি তখন ও নিজে থেকেই গোলমাল বাধায়।'

ফ্রিট্‌সের গায়ে একেক বালতি জল ঢালছে আর তার নাকের উপর একেকটা ঘুসি মারছে পুরমেল। 'তুমি ভাবছো, তোমাকে আমি ক্ষমা করবো। ককখনো না, মরে গেলেও না।'

জিন-লাগাম পরিয়ে পুরমেল ছোটালো ফ্রিট্‌স্‌কে ঊর্ধ্বশ্বাসে। সেই মাল-গাড়িটা তখনো তোলা হয়নি, জার্মান ঘোড়া দুটো তখনো প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওঠবার জন্যে, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে পুরমেল বললে ফ্রিট্‌স্‌কে, 'দেখে শিখে রাখো।'

৫

এখন আর পুরমেল গার্ড-ডিউটি পায় না, কিংবা আর কোনো শাস্তি, তবু সৈন্যরা তার কাঁধ চাপড়ায় আর ফ্রিট্‌স্‌কে নিয়ে হাসাহাসি করে।

চলেছে সৈন্যবাহিনী। ক্ষুধার্ত, শ্রান্তিতে ধূসর, চলেছি বন আর মাঠ পেরিয়ে, অন্ধের মতো। এক অন্ধকার রাতে আমরা উঠলাম এসে এক চাষার খামার-বাড়িতে, কেউ কোথাও নেই, চাষা তার পরিবার নিয়ে সদ্য-সদ্য পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। ব্যস্ত হয়ে খাদ্যের সন্ধান করতে লাগলাম সবাই।

'এই যে, এখানে। শিগগির, চমৎকার স্যুপ রয়েছে—' বললে মুখায়েডিনাওফ।

দ্বিতীয় ডাকের অপেক্ষা করলাম না। দেখলাম একটা বালতিতে কি কতগুলো জোলো ও তৈলাক্ত জিনিস—

মুর্গির ঝোল। দুজনে লম্বা-লম্বা চুমুক দিলাম।

ঝোল বালতিতে কেন প্রশ্ন করাটা মমতাহীনের মতো শোনাবে। ক্ষুধার প্রথম দাহটা একটু প্রশমিত হতেই বললাম, 'এক মিনিট, পুরমেলকে ডেকে আনি।'

'আমারো হয়েছে এক পেট। বেশ, লপুখাও আসুক। বালতিটা রাখছি এই গাছের তলায়।'

ক্ষুধায় মন-মেজাজ প্রায় বিষিয়ে ছিলো পুরমেলের। অসহায়ের মতো ও ঘুমুতে যাচ্ছিলো, ওকে ডেকে আনলাম সেই অতিথিবৎসল গাছের নিচে। তখন চাঁদ উঠে এসেছে, আর সেই চাঁদের ম্লান আলোয় আমার চোখে পড়লো সেই বালতিটা, আর তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা লম্বা-ঘাড়-ওয়ালা ঘোড়া, রাত্রের বাতাসে সাংঘাতিক স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি তার গলার ঘড়ঘড় শব্দ।

আরো শুনতে পাচ্ছি—পুরমেলের পাকস্থলীর আর্তনাদ। সবাই দৌড়ে ছুটে গেলাম সেই গাছের নিচে, অমনি ফ্রিট্স্ তার লম্বা লাল নাক ঢুলিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। আমাদের ভঙ্গি দেখে সে এত ভয় পেয়ে গেলো যে সে বালতিটা উলটে দিলো এক পাশে, আর যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, আঁকাবাঁকা রেখায় বয়ে গেলো মাটির উপর দিয়ে।

লাগাম ধরে ফ্রিট্স্‌কে পুরমেল নিয়ে এলো আস্তানায়।

পুরমেলের এই আশ্চর্য স্তব্ধতায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। চললাম তার পিছু-পিছু। যা দেখলাম তাতে মোটেই আশ্বস্ত হতে পারলাম না। দেখলাম অনুতপ্ত পাপীর মতো মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রিট্স্ আর পুরমেল তার বন্দুকটা তাক করছে সেই মাথার খুলির উপর।

'দাঁড়াও। থামো।' বললাম তার হাত ধরে ফেলে। 'ও কি, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে সত্যি-সত্যি।'

'না, আমি হতভাগাকে গুলি করবো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' বললে পুরমেল। তার স্বরে সেই ভয়-দেখাবার ভাব নেই। যেন, যা সে বলছে, তাই সে করবে। 'ওকে দেখবার পর থেকে জীবনে আর আমার স্বাদ নেই। ছেড়ে দাও, ঢের সয়েছি, আর নয়। আমি সব ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ঐ মুরগির ঝোল কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না। ও হারামজাদা জানে কাল থেকে আমি না খেয়ে আছি। ওকে আমি নিজ হাতে দুই পাঁজা খড় আর যই খেতে দিয়েছি, তবু ওর তৃপ্তি নেই। না, ছেড়ে দাও, ওকে আমি শেষ করবো আজ।'

'না।' জোর করে ঠেলে একপাশে সরিয়ে আনলাম পুরমেলকে। 'তুমি ওকে যই দিয়েছো, খড় দিয়েছো, কিন্তু সত্যি করে বলো ওকে জল দিয়েছিলে?'

'যাঃ' চাপা গলায় পুরমেল বললে, 'সত্যি, জল দিতে একদম মনে ছিলো না।'

পর দিন আমরা জার্মানদের উপর একটা মূর্খ আক্রমণ করলাম।

জার্মানরা জঙ্গলের মধ্যে বসে মেশিন গান ছুঁড়ছিলো। আমাদের আক্রমণটা খুব হিংস্র ছিলো বটে, কিন্তু হটে গেলাম শেষ পর্যন্ত। চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো আমাদের সৈন্যরা।

আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেলো আমাদের মোটা কর্নেল, ঘোড়ার কেশরের মধ্যে কাঁধ লুকিয়ে। চলে গেলো মুখায়েডিনাওফ, হাতে একটা অসহায় জ্বলন্ত তলোয়ার নিয়ে। চলে গেলো লপুখা, মুখে শব্দের এত বিস্ফোরণ যে ঝোপঝাড় সব তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। নিদারুণ বিশৃংখলা। সমস্ত বন যেন শুধু ধুলো আর ধোঁয়া। সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম পুরমেলকে। ও নামলো ফ্রিট্সের পিঠ থেকে, খসিয়ে ফেললো জিন, কে জানে বা, প্যারেডের সূচনা হয়তো।

প্রথমে মনে হলো পুরমেল হয়তো আহত হয়েছে, তাই ডাকলাম ওকে চেঁচিয়ে। পুরমেল ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলো, আর বলবো কি, বহু দিন পরে, দুর্বলভাবে একটু হাসলো, বললে, 'বলছি তোমাকে সব এখুনি।'

বলে ফ্রিট্সের মুখটা সে জার্মানদের দিকে ফিরিয়ে দিলো, খোলা জিন দিয়ে তার গায়ে মারলো এক প্রচণ্ড বাড়ি, আর উঠলো চেঁচিয়ে, 'যাও তুমি ফিরে, তোমার দেশের লোকের দলে, হতভাগা, বজ্জাত কোথাকার। যাও, যাও বলছি।'

ফ্রিট্স মাথা নামিয়ে জঙ্গলের ক'টা ফুল চিবোতে লাগলো।

তার পর আস্তে-আস্তে সে আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, মাঝে-মাঝে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে, জার্মানদের অভিমুখে।

এখন পুরমেল আমার বাহু চেপে ধরলো, বললে, 'তুমিই শুধু আমার সাক্ষী। বলো শপথ করে, যুদ্ধে ও মারা গেছে।'

ফ্রিট্স্‌কে দেখে না হেসে থাকতে পারলাম না। গরুর মতো চরে বেড়াচ্ছে, গুলিগোলার দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।
'তুমি দেখো, কিছুতেই ওর মৃত্যু নেই।' বললাম, বলতে বাধ্য হলাম। জিনটা পুরমেল তার কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলো। বললে, 'চলো, শিগগির। ভুলো না যেন, ও যুদ্ধে মারা গেছে।'
'আচ্ছা, তাই।' পিছন ফিরে তাকিয়ে শেষ বার দেখলাম ফ্রিট্স্‌কে। খেতে-খেতে চলেছে সে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে।
আমার নিজের ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলছিলাম পুরমেলের পাশে-পাশে। জিনের বোঝা টেনে চলেছে সে টলতে-টলতে। উপায় নেই, মরা ঘোড়ার জিন নিয়ে যেতে হয় হেডকোয়ার্টার্সে, এই কর্তাদের হুকুম। সে হুকুম অমান্য করে পুরমেলের এমন সাধ্য নেই। ইদানি অনেক অবাধ্যতার দোষে সে দোষী।
কয়েক পা এগিয়ে এসে পুরমেল হঠাৎ থেমে পড়লো, আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাই বলো, এটাকেও আমি পাঠাচ্ছি জাহান্নমে।' বলে তার যত দূর সাধ্য সে জিনটা শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘন জঙ্গলের মধ্যে। তারপর সে ভয়ংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললে, 'এখন একটা আমাকে সিগারেট দিতে পারো?'

কন্সটান্টিন্ পাউস্টফ্স্কি

তামার থালা

বের্গ আগুনে হাওয়া করছিলো। বনের উপরে গহন রাত পড়েছে ঝুঁকে, হ্রদের উপর ঝিকিয়ে উঠছে বিদ্যুতের দীপ্তি। সোনালি পাতার গন্ধে বাতাস ভারী।

লিওনিয়া রাইজফ শুনছে কান পেতে।

হাঁস ডাকছে বিলে, হ্রদের জলে মাছ ঘাই মারছে। ভোরবেলা একবার চা হয়েছে তাদের, তার পর গিয়েছিলো তারা বন-মোরগের খোঁজে। নীল আলোর আভা ফুটে উঠলো আকাশে, রাত ফুরিয়ে গেছে কখন। ছেড়ে আসতে হলো আগুনের কুণ্ড, ভিজা পাতার তেজী গন্ধ। আবার কালো হ্রদে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি।

'লিওনিয়া, একটা গল্প বলো, মজার গল্প।'

'একটা সত্য ঘটনা বলি, তোমাদের দুই বুড়ি বাড়িউলির গল্প। এ দুই বুড়ি হচ্ছে নামজাদা শিল্পী পোজালস্টিনের মেয়ে। পোজালস্টিন চাষা-ভুষো-জাতীয় লোক, বাজে-মার্কা। কিন্তু তার খোদাইয়ের কাজ প্যারিসের যাদুঘরে, লণ্ডনের যাদুঘরে, আর আমাদের রিয়াজানে। কোনো দিন দেখেছো তার কাজ?

'তার নিজের ঘরে, যে-ঘর বের্গ ভাড়া নিয়েছিলো, দেখেছিলো সে কিছু খোদাইয়ের কাজ, সময়ের হাত লেগে হলদে, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

'দূর কোনো গ্রাম, জাবরিয়েতে সে বাসা নিয়েছিলো, যার মালিক সেই দুই ব্যস্তবাগীশ বুড়ি। তার প্রথম মনে হয়েছিলো এরা শিক্ষয়িত্রী হবে

বা। রাত্রে তারা ঘুমোতো না, বসে-বসে বাগান পাহারা দিতো, ক্রমশ ক্রমশ জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে যে বাগান, ফেলতো দীর্ঘশ্বাস আর ভয় করতো বের্গকে। গ্রাম্য সোভিয়েট অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের আর অন্ত নাই।

'এত দিনে বের্গ স্পষ্ট অনুভব করলো সে সব অদ্ভুত খোদাই কী রকম তার মনে প্রথম ছাপ রেখেছিলো। গত, মৃত দিনের লোকের সব ছবি, আর তাদের দৃষ্টির স্পর্শ থেকে বের্গ কিছুতেই তার মনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না। যখন সে বন্দুক পরিষ্কার করছে বা কিছু লিখছে, ঐ সব হারানো দিনের মেয়ে আর পুরুষ সব সময়েই তার দিকে গম্ভীর মনোযোগে তাকিয়ে থাকতো। বের্গ জোর করে মুখোমুখি সে-সব ছবির চোখের দিকে, পলনস্কিয়ে আর ডস্টয়েভস্কির ছবি, বসতো তাদের দিকে পিঠ করে, একমনে পরিষ্কার করে যেতো বন্দুক, কিন্তু কিছুতেই আর শিস দিতে পারতো না।

'তারপর কী হলো?' বের্গ জিগগেস করলে।

'তার পরে স্বয়ং শয়তান। আমাদের দলের কামার ইয়েগর এলো আমাদের গ্রাম্য সমিতিতে। তাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো—এত রোগা যে ট্রাউজার্স লেপটে থাকে তার পায়ের সঙ্গে। আর সব সময়েই কেবল তামা খুঁজে বেড়ায়। যতটুকু অবিশ্যি মেরামতের কাজে লাগাবার, ততটুকু রেখে দিতে পারো, তার বেশি নয়। সে নেবে না তা। সে নেবে গির্জের ঘণ্টাগুলো।

'পুসটিনিয়ার থিয়োডোসিয়াকে চেনো? সেই যে সব-সময়েই বকবক করে আর চলে বাঁকা চালে, যোগ দিলে একদিন আলোচনায়, বললে, "কেন, গির্জের ঘণ্টা কেন? যাও না পোজালস্টিনে, সেখানে বুড়িরা তামার উপরে হাঁটছে। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আর, সে-সব তামার উপর কী সব আঁচড় কাটা—কিছু বুঝিনি আমি—আর, এও

বুঝিনি, ওরা তা সব সময়ে লুকিয়ে রাখে কেন ; ফেলনা, বাজে মাল বলে কেন দিয়ে দেয় না গভর্নমেন্টেকে !" তাই শুনে সোভিয়েটের চেয়ারম্যান হুকুম দেয় আমাকে : "যাও লিয়স্কা, বুড়িদের থেকে নিয়ে এসো সব তামার থালা। ও-থালায় ওদের কোনো কাজ নেই।"

'গেলাম সেখানে, বললাম সব বুঝিয়ে। কুঁজো-মতন একটা বুড়ি ছিলো, শুধু তারই নাগাল পেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে ও কাঁদতে লাগলো, বললে, "কী বলছো হে তুমি ছোকরা ? ও সব থালা তুমি ছুঁতেও পারবে না, ও জাতীয় সম্পত্তি। কোনো কিছুরই বিনিময়ে আমি দিতে পারবো না তা।"

'বললাম, "একবার আমাকে দেখাও না দয়া করে। দেখলে বুঝতে পারবো কোনো কাজে লাগবে নাকি তা আমাদের।"

'নিয়ে এলো সে-থালাগুলি, পরিষ্কার একখানা কাপড়ের টুকরোয় সযত্নে মোড়া। দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কে ভাবতে পেরে-ছিলো আগে ! কী চমৎকার সূক্ষ্ম কাজ, আর কী জোরালো হাত ! বিশেষ করে পুগাচেভ-এর ছবি। তেমন ছবি যার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না—তাকালেই মনে হয়, তুমি কথা কইছো তার সঙ্গে।

'এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম, পরে বললাম বুড়িকে, "এই বাড়িতে নিশ্চয়ই তুমি ওগুলো রাখতে পারো না। ও সব স্টেটের সম্পত্তি। যে কেউ এসে এগুলো নিয়ে যেতে পারে—গাঁয়ের কামার, থিয়োডেসিয়া বা স্বয়ং শয়তান যে কেউ—আর এই সব তোমার ছবি নিয়ে নাল তৈরি হবে, জুতোর নাল, জনগণের জুতো। যাদুঘরে নিয়ে রাখতে হবে এদের।"

'বুড়ি কিছুতেই টলবে না। "এ আমি কিছুতেই হাতছাড়া করবো না, না, যাদুঘরেও দেবো না আমি পাঠিয়ে। যত দিন আমরা না মরি তত দিন ওরা থাকবে আমাদের কাছে, এই বাড়িতে ; তারপর আমরা যখন আর থাকবো না, তখন তোমাদের যা খুশি করো ওদের দিয়ে।"

গেলাম স্টেপানের কাছে, গ্রামের সোভিয়েটের যে কর্তা। তাকে বললাম যে তামার থালাগুলো রাশিয়ার কোনো যাদুঘরে রেখে দেয়া দরকার।
"চুলোয় যাও তুমি।" স্টেপান গর্জে উঠলো, "তুমি যদি না আনো, আর কেউ এসে নিয়ে যাবে।" বলে সে পাঠিয়ে দিলো ইয়েগরকে। সঙ্গে সরকারী হুকুমনামা দিয়ে দিলো, থালাগুলো নিয়ে আসবার জন্মে। বেশ, ভালো কথা, আমি ছুটে চলে গেলাম বুড়িদের কাছে, ইয়েগরেরও আগে, বললাম, "শিগগির থালাগুলো আমাকে দিয়ে দাও। যদি বাঁচাতে চাও ওদের। আসছে এখুনি ইয়েগর, আর থালাগুলো ও বের করে নিয়ে গিয়ে নির্ঘাৎ গলিয়ে ফেলবে দেখো। আমাদের যে কর্তা—সে একটা গাধা—এ-সব জিনিস বোঝে এমন তার বুদ্ধি নেই।"
'ভয় পেয়ে গেলো বুড়িরা, তাড়াতাড়ি আমার হাতে দিয়ে দিলো থালা-গুলো, আর আমি তখুনি ওদের লুকিয়ে ফেললাম। ইয়েগর এলো আমার বাড়িতে, বললে, খানাতল্লাসি করবে। আর, যদি শুনতে চাও উত্তরে আমি কী বললাম, তবে বলি। আমি বললাম তাকে, লাথি মারলাম, লাথি মেরে বার করে দিলাম বাড়ি থেকে, আর থালাগুলো পাঠিয়ে দিলাম রিয়াজানের যাদুঘরে। পাঠিয়ে দিয়ে তবে শান্তি।
'তার পর ওরা একটা সভা ডাকলো,আর আমার কৈফিয়ৎ তলব হলো। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'যা ন্যায্য, উচিত মনে করেছি, তাই করেছি। হ্যাঁ, রাগে মেরেছি আমি ইয়েগরকে, অস্বীকার করছি না। কিন্তু থালার সে খোদাইয়ের কাজ নিয়ে কিছু বলতে চাই না আমি এখানে—তাদের কী দাম, কী গুণ তা তোমরা পারবে না বুঝতে। কিন্তু তোমাদের ছেলেরা পারবে, তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। আমরা এখন শুধু বলবো সম্মানের কথা, যে সম্মান শুধু শ্রমিকের, যারা করেছে অত্যাশ্চর্য অমানুষিক পরিশ্রম, তাদের। বছরের পর বছর সে সাধনা করেছে, খেতে পেয়েছে শুধু কালো রুটি আর ফিকে চা। প্রত্যেকটি থালায়

খোদাই হয়ে আছে অবর্ণনীয় শ্রম, বিনিদ্র রাত, যন্ত্রণা—প্রতিভা—'

'প্রতিভা,' গম্ভীরমুখে বললে লিওনিয়া, 'বুঝতে হবে তাকে, মূল্য দিতে হবে তাকে, প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে তাকে। প্রতিভা ছাড়া এই নতুন জীবন আমরা পাবো কি করে?'

'যাই হোক, আমি আমার দোষ অস্বীকার করিনি, এবং সেই ঘটনার জন্যে উৎপাত কম হয়নি আমার উপর। কিন্তু একটা ফল ফলেছিলো সে ঘটনা থেকে—গ্রামের সোভিয়েট থেকে স্টেপান বরখাস্ত হয়ে গেলো। ওর ব্যবহারটা লজ্জার ব্যাপার।'

থামলো লিওনিয়া। য়্যাসবনের ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেলো একটা বনমোরগ।

'কী মনে হয় তোমাদের? ঠিক করিনি আমি?' জিগগেস করলে লিওনিয়া।

'তাতে সন্দেহের কিছু আছে নাকি?' বললে বের্গ, 'ও তো অত্যন্ত স্পষ্ট।'

শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাওয়া হ্রদের দিকে। হাওয়াতে বনের গন্ধ, ঠাণ্ডা জলের, চার দিকের সজীবতার।

লিওনিয়া তার কাঁধের উপর রাইফেল তুলে নিলো। বললে, 'চলো আবার।'

কন্‌স্টান্টিন্‌ সিমনফ

মস্কো

১

সত্যি-সত্যিই মস্কো সুন্দর, কিন্তু দেখে-দেখে তার সৌন্দর্যে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে তা আর চোখেই পড়ে না। শুধু ছ' মাস, এক মাস, কি একসপ্তাহ তুমি বাইরে থাক, আর ফিরে এসে দেখ একবার মস্কোকে, সকালে, দুপুরে কি রাত্রে, দেখবে এমন অপরূপ রূপ তার আর দেখনি।

ক্রেমলিনের পেছন থেকে, তার যুদ্ধদীর্ণ দেয়াল আর আকাশ ছোঁয়া মিনারের উপর দিয়ে শরতের ঠাণ্ডা গোলাপী প্রভাত উঠে আসে। উঁচু-উঁচু সেতুর তলা দিয়ে নভেম্বরের জল নিঃশব্দে বয়ে যায়। বোরোডিনস্কি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে, যার পিছনে বোরোডিনোর একশো মাইল ব্যাপী ঢালা মাঠ আর সামনে ক্রেমলিন, এক নজরে মস্কোকে দেখা যায় আত্মোপান্ত; সকালবেলায় এর নির্জন বাঁধ, নদীর বাঁকের ওপারে ক্রিমস্কি সেতুর রূপালি শিকল, অন্যদিকে নদীর ধার ঘেঁসে ট্রেন চলেছে, দেখাচ্ছে যেন খেলনার মতো। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে নানারকম সরু আর আঁকাবাঁকা রাস্তা, যে সব কারিগর এ সব রাস্তায় জীবন কাটিয়েছে আর তাদের নিজেদের জন্যে ও নিজেদের বংশধরদের জন্যে গড়েছে এই শহর, সবল সক্ষম হাতে, সঙ্গীত ও স্ফূর্তির সঙ্গে, কাজের মধ্যে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে, তাদের ব্যবসার নামেই নাম হয়েছে রাস্তাগুলির।

একবার ভাবো, এক মুহূর্তের জন্যে ভাবো যে তুমি আর মস্কোর লোক নও, তুমি গৃহহীন, এই সুন্দর শহর আর তোমার নয়। মনে করো, জার্মানরা এর সমস্ত বাড়ি-ঘর রাস্তা-বুলেভার কেড়ে নিয়েছে, যা কিছু দিয়ে মস্কো তৈরি, যে মস্কো তোমার কাছে, প্রত্যেক রুশীয় হৃদয়ের কাছে এত প্রিয়, সে মস্কো নিয়ে গেছে ছিনিয়ে। মনে-মনে এই চিন্তা নিয়ে হাঁটো মস্কোর রাস্তা ধরে, ভরোবিয়ভি বা পকলন্নিয়া পাহাড়ের ধার পর্যন্ত হেঁটে যাও, যেখানে অতীতে নেপোলিয়ন এসে নেমেছিল, তারপর নিচে, চারপাশে চোখ মেল, দেখ কত বিশাল কত মহিমাময় তোমার এই নগরী, কি সুন্দর এর বাড়ি-ঘর, কি অন্তহীন এর পথ-ঘাট, কত জীবন্ত, কত আত্মীয়, কী সম্পূর্ণভাবে তোমার নিজের ! আর তখনই তুমিই অনুভব করবে মর্মে-মর্মে যে ঐ চিন্তা আর এক মুহূর্তও তুমি সহ্য করতে পারছ না। এক মুহূর্তও তুমি এ চিন্তা আয়ত্তে আনতে পারনা যে এ সমস্ত তোমার নয়। কে না জানে, মস্কো তোমার, মস্কো তোমার সর্বস্ব।

জার্মান সৈন্যরা ফলকিসের বেওবাকটার পড়ত। কাগজে লেখা থাকত বড় বড় অক্ষরে 'আগুন জ্বলছে মস্কোয়ে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দগ্ধ হচ্ছে মস্কো।' জার্মান মেয়েরা সকালবেলা রেডিও শুনত হাঁ করে : 'আমরা বোমা ফেলে মস্কোকে খোলামকুচি বানিয়ে দিয়েছি, ভেঙে থেঁতো করে দিয়েছি মস্কোকে, তার যা-কিছু এখন অবশিষ্ট আছে, সব আমাদের হবে শিগগির।' কুড়িটে দেশের ভাষায়—জার্মানীর আর ফ্রান্সের, হল্যাণ্ডের আর পোল্যাণ্ডের, ইটালির আর ফিনল্যাণ্ডের, রুমানিয়ার আর হাঙ্গেরির—নির্লজ্জ রেডিও চীৎকার করে ফিরছে আর বিধ্বস্ত ও ভূপতিত ইউরোপের পরিণামে দ্বেষকলুষিত সন্তোষ সম্ভোগ করেছে। কুড়ি কুড়িটে ভাষায় জ্বলেছে মস্কো, টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে মস্কো, মস্কো জার্মানদের হাতে চলে গিয়েছে !

আর আজ এখন, এক বছর পরে, আমরা ভরোবিয়ভি পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়াই, তীরের মতো সোজা খাড়া পাহাড়ে পথ ধরে, শরৎকালের হলদে পাতা মাড়িয়ে, আর দেখি আমাদের মস্কৌকে, আমাদের চোখের সমুখে প্রসারিত। সেদিন যেমন সুন্দর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে, সেদিনকার মতোই মহিমান্বিত। আর পুরোনো প্রাচীরের উপরে সেই গোলাপী প্রভাত আসে, প্রথম সূর্যের আলোতে ব্রোঞ্জের গম্বুজগুলি তেমনি ঝিলকিয়ে ওঠে। পাথুরে বাঁধের মাঝখান দিয়ে মস্কৌর নদী তেমনি নীরবে বয়ে যায়। স্পাসকি টাওয়ারের ঘড়ি তেমনি গভীর-মধুর শব্দে বেজে ওঠে। মস্কৌর লোক, যুদ্ধের কাজে—যেখানেই তোমরা থাক, এই স্পাসকির ঘড়ির ঘণ্টা শুনে তোমাদের ঘড়ি মেলাও, মুহূর্তের জন্যে শোনো তার মন্থর, বিলম্বিত শব্দ। মস্কৌ আজকের মতো এমনি ভাবে তোমার চোখে জেগে থাক অক্ষয় হয়ে—বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ আর দুর্নমনীয়—রাশিয়ানের চরিত্রের যে প্রতিকৃতি, রাশিয়ানের মতোই যা দুর্জয়।

মাল নিয়ে ট্রলি গাড়ি দিনরাত রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। যদি অনেক দিন তুমি বাইরে থাক, তোমার কাছে এ নতুন মনে হবে। সমস্ত শহর জুড়ে তারা জ্বালানি কাঠ বিতরণ করছে। এই শীতে টান পড়বে কাঠের, কিন্তু শহর তার রসদ মজুদ করে রাখবে, বুঝে-সুজে খরচ করবে, শীতে সে জমে যেতে পারেনা। আশি হাজার মস্কৌর অধিবাসী, পুরুষ আর মেয়ে, বেশির ভাগই মেয়ে, মাসের পর মাস মস্কৌর ও ক্লানিনিন্ ও রিজান্-এর চার পাশের জঙ্গলে অবিশ্রান্ত কাজ করছে। তারা গাছ কাটছে, ফাড়ছে, চিরছে—কাঠ বোঝাই করছে আর চালান দিচ্ছে মস্কৌয়ে। গাছ কাটার কৌশল তারা কিছুই জানত না আগে। তাদের হাত এ সব কঠিন কাজে অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু মস্কৌর প্রয়োজন এই কাঠের, তাই তারা সব কাঠুরে হল। মস্কৌ

যদি বলে, তবে এমন কোনো কাজ নেই যা করবে না তার অধিবাসীরা। সকালবেলা মস্কোর ফুটপাতে বাচ আর ফার গাছের কুঁদো টাল হয়ে পড়ে আছে দেখা যায়। চলে যায় তারা বাড়ির উঠোনে, সেইখান থেকে মাটির নিচেকার ঘরে। এই শীতে উত্তপ্ত মস্কোর সমস্ত ঘর থেকে উঠবে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

মস্কোর ভোরের ট্রামে নতুন সব আরোহী দেখা যাচ্ছে। তারা সব পনেরো ষোল বছরের ছেলে। ভোর বেলার কাঁচা বাতাসে তাদের জ্যাকেট আর কোট আঁট করে গায়ে জড়াতে জড়াতে তারা তাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ঢোকে। কলার তুলে দেয় ঘাড়ের উপর, কোণাচে করে টুপি বসায় মাথায়, আর গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে এমন ভাবে সিগারেট ধরায়, যেন কতদিনকার ওস্তাদ একেকজন।

সকালবেলায়, যেমন-কে-তেমন, পরিচ্ছন্ন ও নির্জন এই মস্কো। নতুন পেনির মতোই ঝকঝকে। শান্তির সময় যেমন, তেমনি আজও রাস্তাগুলি ঘসে-মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে। মস্কোর পশ্চিমের পরিখা আর মাটির নিচেকার দুর্গ যেমন জার্মানদের ঠেকিয়ে রাখছে, তেমনি মস্কোর এই সব নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল পথঘাট। মস্কোকে জয় করা যে অসাধ্য তারই প্রমাণ সবখানে। অজেয় থাকবার গূঢ় কারণ শুধু প্রবল সমরসমারোহেই নয়, নয় শুধু বন্দুকের অসংখ্যেয়তায়, তার কারণ অবিচলিত চিত্তবলে, পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাস-নিয়মের সংরক্ষণে। আগের মতো স্বাভাবিক ভাবেই শহর তার নিজের তদবির-তদারক করছে। তার নিজের চেহারা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন, যেমন যুদ্ধের মাঝখানে সৈন্যদের পরিদর্শন করতে সেনানায়ক যখন আসে, পরিচ্ছন্নভাবে দাড়ি কামিয়ে আসে, আসে নিখুঁত পোশাক পরে, ঝকঝকে কোমরবন্ধ এঁটে।

যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি পাও বাড়ি আসবার জন্যে, কারেলিয়া বা উত্তর ককেশাস থেকে, স্ট্যালিনগ্র্যাড বা স্টারায়া রুস্‌সা থেকে, আর

যদি এক ঘণ্টা সময় তোমার হাতে থাকে, ভোরবেলা তোমার শহরের রাস্তা ধরে খানিকক্ষণ ভ্রমণ কোরো। গত বছরের জুলাই, অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে মস্কো ঘুরে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাদল যখন ফিরে এসেছে, মনে কোরো, তাদেরকে তখন কী আগ্রহভরে আমরা বারে-বারে প্রশ্ন করেছি: 'খবর কি ওখানকার, সব ভালো তো?' উত্তর এসেছে: 'সব ভালো।' হ্যাঁ, মস্কোর সব ভালো, সব ঠিকঠাক, আর যেমনটি তুমি তাকে শেষ দেখে গিয়েছিলে তেমনি সে মনোরম।

বোমা ফেটে টিমিজিয়াজেফ্-এর স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে পড়েছিল, আবার তা তার নিজের জায়গায় খাড়া হয়েছে, পিচের গাঢ়তার তারতম্য দেখে শুধু বুঝতে পারবে কোথায়-কোথায় বোমায় চিড় ধরেছিল। হ্যাঁ, মস্কো নিটুট, নিখুঁত।

সম্প্রতি যেসব আক্রমণ ও বোমা-বিদারণ ঘটেছে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় না পেয়েও তুমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পার। অনেকক্ষণ পর-পর তোমার বিস্মিত দৃষ্টি হঠাৎ খানিকটা ফাঁকা জায়গার উপর আকৃষ্ট হবে, হয়তো বালচুগ্-এ বা সাডোভি বুলেভারে, আর তোমার মনে হবে, আগে যেন ঠিক এমনটি ছিল না।

হ্যাঁ, আগে ঐখানে একটা বাড়ি ছিল। বাজ পড়ার শব্দে একটা বোমা সেখানে ভেঙে পড়েছিল, আর অমনি শত-শত হাত লেগে গেল কাজ করতে, দেখতে-দেখতে গহ্বরটা সমতল পিচঢালা একটা পার্ক হয়ে গেল যেখানটায় বাড়ি ছিল দাঁড়িয়ে, আর যেখানে আমরা পরে আরেকটা নতুন বাড়ি তৈরি করব।

নতুন দালানগুলির দিকে তাকিয়ে তোমার কখনোই মনে হবে না যে এদের আশে-পাশে বোমা ফেটেছে, তাদের ছাদে জ্বলেছে আগুনে-বোমা, আর ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা নিজের জীবন বিপন্ন করে মই বেয়ে-বেয়ে উঠে সেই আগুন নিবিয়েছে। চেয়ে দেখ বাড়িগুলির দিকে,

যুদ্ধে যাবার আগে যেমন তুমি ওদের দেখে গিয়েছিলে তেমনি চেহারায়ই দাঁড়িয়ে আছে তারা। জানলার কাচ তেমনি ঝকঝক করছে, জখমি দেয়াল আবার মেরামত হয়েছে, সব চেয়ে উঁচু তলার উপর জেগে উঠেছে আবার ছাদ।

আর এই সব পুনর্গঠনের কাজের কথা ভাবতে গিয়ে বুড়ো এক রাজ-মিস্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। নতুন গঠনসৌষ্ঠবের খোঁজে বহু বেঠিক পথ সে অনুসন্ধান করছিল, পুরোনো রীতির সে মোটেই পক্ষপাতী ছিলনা, সে বলেছিল একদিন তার এক বন্ধুকে : 'তুমি জান, সমস্ত জীবন নতুন কিছু নির্মাণ করব এই ছিল আমার ধ্যান, যা আছে তার চেয়ে আলাদা, তার চেয়ে ভিন্ন জাতের। তারপর আমাকে কাজ দেয়া হল এই পুন-র্গঠনের। আর, আমার এই জীবনে এই প্রথম, এই প্রথম বার আমার আকাঙ্ক্ষা হল, যুদ্ধের আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি করেই আবার বাড়িগুলি তৈরি করি। হ্যাঁ, যা তুমি ভেবেছ, শুধু ঐ জার্মানদেরকে জব্দ করার জন্যে, বিরক্ত করার জন্যে।'

হ্যাঁ, যাই জার্মানরা করুক, বিশটা ভাষায় যাই কেননা চেঁচাক ওদের রেডিও, আমাদের মস্কো ঠিক যুদ্ধের আগের মতোই অটুট রয়েছে।

২

আজ ষোল মাস ধরে যুদ্ধ চলছে, এখন পিছনে তাকিয়ে ভাবা যায় যুদ্ধের প্রথম দিনের কথা।

ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর নভেল 'দি ফল্ অফ্ প্যারিস'-এ ফ্রান্সের প্রথম যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন। পড়ো ঐ পৃষ্ঠাগুলি, সত্যি বলছি, পড়ে দেখ। মনে-মনে ভাব, সে কী গোলমাল প্যারিসে, তার অধিবাসীরা একেবারে ভগ্নোদ্যম, ছুটোছুটি করছে কিছু সাহস সঞ্চয় করতে পারে কিনা; মনে-মনে ভাব সেসব বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ, স্বার্থপরতা আর ভয়ের দৃশ্যগুলি। আর তার পর মনে কর মস্কোয়ে যুদ্ধের প্রথম দিনের

চেহারা। সত্যি, এ যুদ্ধ আমরা চাইনি, তাই প্রথম দিনটা ভারি নির্দয় ও নিরানন্দ ছিল। কিন্তু সমস্ত লোক কেমন স্থির আর দৃঢ় ছিল তাদের চেতনায় আর আকাঙ্ক্ষায়। কী শান্ত ভাবে মস্কৌ নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল আর কত দ্রুত ও কত দৃঢ়তার সঙ্গে সে নিজেকে তৈরি করে নিল বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে, কী বীরত্বের সঙ্গে হল সে যুদ্ধের মুখোমুখি!

আমার মনে পড়ে সেই অন্ধকার বায়েলো-রুশিয়ান স্টেশন, ছোট-ছোট নীল আলো, আর পশ্চিমগামী ট্রেন হাঁপাতে হাঁপাতে একের পর এক এসে দাঁড়াচ্ছে। মনে পড়ে সেই অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম, সব-কিছু নিখুঁতরূপে সুশৃংখল, শান্ত আর ধীর। সবাই বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, কেউ-কেউ বা চিরদিনের জন্যে, কিন্তু কোথাও একফোঁটা চোখের জল পড়ছে না। জানিনা, হয়তো ঘণ্টাখানেক আগে, বাড়িতে কেঁদেছে খুব মেয়েরা, তাদের পুরুষদের প্রকাণ্ড কর্কশ কোট ও চামড়ার শক্ত বেল্ট আঁকড়ে ধরে বলেছে অনেক দুঃখের কথা। কিন্তু সেসব সেখানে, তাদের বাড়ির নিরালায়। এখানে, প্ল্যাটফর্মের উপর, সকলের সামনে মস্কৌবাসীরা তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখাতে চায় না, দেখাতে চায় না তাদের প্রিয়-জনের জন্যে ব্যাকুলতা, তাদের ফিরে না আসার কথা ভেবে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য। তারা কাঁদেনি, শোক করেনি, ফেলেনি চোখের জল।

যুদ্ধের প্রথম কদিন কেটেছে ভয়াবহ মারামারি আর দুঃখবহ পরাজয়ে, বিশেষত পশ্চিম সীমান্তে, মস্কৌর নিকটতম যে সীমান্ত। তখনো একটাও বোমা পড়েনি মস্কৌর উপর। মিন্‌স্ক্ জ্বলছে, পুড়ছে স্মলেনস্ক, আর ডরোগোবুঝ্ অগ্নিশিখার উদ্দপ্ত তাণ্ডবলীলা। কিন্তু সমগ্র যুদ্ধ চলছে মস্কৌর জন্যে, সবাইর উপরে এই মস্কৌ। এই মস্কৌর দিকেই জার্মানদের ট্যাঙ্ক আসছে এগিয়ে, আসছে তাদের মোটর-সাইকেল, তাদের পদাতিক। আর এই মস্কৌর জন্যেই লাল ফৌজ মরেছে স্মলেনস্ক রেল-স্টেশনে, এই মস্কৌর জন্যেই বেরেজিন ক্রসিং-এ গর্জেছে আমাদের

বন্দুক, এই মস্কৌর জন্যেই আমাদের সৈন্যরা শেষ বারুদবিন্দু পর্যন্ত লড়েছে মোগিলেফ্-এ।

এমন কোনো পাহাড়, বন বা মাঠ নেই স্মলেনস্ক-এ, যার জন্যে যুদ্ধ করা হয়নি, কেননা ও সব তো সামান্য স্থান নয়, নয়তো শুধু এত মাইল জমি-জায়গা—ওরা প্রত্যেকে হচ্ছে মস্কৌর পথে মাইলের নির্দেশক—মস্কৌ আর মোটে এত মাইল দূরে! যেমন করেই হোক রাখতে হবে এই বনখণ্ডটুকু, কেননা, যদি জার্মানরা এটা ছিনিয়ে নেয়, ওরা মস্কৌর আরো কাছাকাছি এসে পড়বে। এই সংকীর্ণ উপত্যকায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে রুখতে হবে ওদের, কেননা যদি জার্মানরা এটা অধিকার করে, ওরা মস্কৌর কাছে আরো দুশো মিটার পথ এগিয়ে যাবে। এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িই হবে কেল্লা, কেননা গ্রামের পূব প্রান্তে যে মাইল-পোস্ট আছে তা আগের মাইল-পোস্টের থেকে মস্কৌর পথে আরো এক মাইল নিকটতর।

বিপদের দিনে দেশের কথা একেকজনের মনে একেক চেহারায় এসে দেখা দেয়। কেউ নিজের শহরের কথা মনে করে, নদীর পাশের ঝোপ-ঝাড়, পপলারের সার, বনের মাঝে হারিয়ে-যাওয়া রাস্তা। অন্যরা মনে করে প্রান্তরের সেই বুনো ঘাসের গন্ধ, পাহাড়ের পিছনে দক্ষিনী সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর কেউ বা মনে করে ইয়াকুতির শতাব্দী বৃদ্ধ ফার্ গাছের মাঝে সেই সব চাষাদের গোলাবাড়ি। কিন্তু সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এখন সকলকার মনে মস্কৌর স্মৃতি, সেই মস্কৌ যা কোনোদিন শত্রুর হাতে সঁপে দেওয়া হবে না।

মোগিলেফ্-এর কোনো এক জায়গায় এক বনের ধারে রেডিও শুনছি মনে পড়ে, কে একজন পড়ছে স্টালিনের বক্তৃতা। বলছে: 'বন্ধুগণ—'। অল্প কয়েকজন মোটে আমরা ছিলাম। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম সেই স্বর, যদিও জানি এ শুধু রেডিও-কথকের স্বর, মনে হচ্ছে

যেন স্টালিন নিজে জনে-জনে আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন। অনেক ভয়ংকর পরিণামের কথা তিনি আমাদের বলছিলেন। আহ্বান করছিলেন চরম আত্মোৎসর্গে। বলছিলেন আমাদের দেশ, আমাদের রাশিয়া, আমাদের মস্কৌর ভবিতব্যতার কথা। আর যারা সেদিন মস্কৌয়ে ছিল, তাদের নিজের নিজের কাজে, মনে মনে ভেবেছিল, তারাও সকলে সৈন্য সীমান্তে যারা লড়াই করছে, মস্কৌর জন্যে লড়াই করছে, ঠিক তাদেরই মতো যোদ্ধা।

জনগণের সৈন্য : সেইদিন মস্কো এই মন্ত্রে নিনাদিত হয়ে উঠল। সৈন্য-সংগ্রহ স্টেশনে কী অসম্ভব ভিড়, পোশাকে তখনো সবাই শিষ্টভব্য কিন্তু মনে-মনে সৈন্য, জড়ো হয়ে উঠল সাগ্রহ জনতা। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে সবাই একত্রিত হয়েছে, যখন আগে-আগে শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে সমস্ত রাশিয়া। কিছুই তাদেরকে বিরত করছে না, বয়স পর্যন্ত না। বেশির ভাগই চল্লিশের উপর, কেউ-কেউ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব। তাদের অবস্থা বা মর্যাদার হিসেব পর্যন্ত তাদের গণনার বাইরে। সবাই তারা পশ্চাদনুবর্তী সৈন্য, স্বয়ংসেবক। স্বয়ংসেবক! মহান ঘোষণা! বলদৃপ্ত সাহসী বীর—সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত। যারা বহু বছর ধরে সামরিক কাজের থেকে অবসর পেয়েছিল, যাদের স্বাস্থ্য ভালো নয়, তারা পর্যন্ত যুদ্ধে যাবার জন্যে উৎসুক। তারা দরখাস্ত পাঠিয়েছে, যুদ্ধ তারা ভোলেনি, তেমন অসুস্থ তারা নয়। খুব সরল শাদা কথায় লেখা সে সব দরখাস্ত। একদিন যুদ্ধের ইতিহাস যখন লেখা হবে, সহজ অথচ কঠোর সাহসের প্রমাণ হিসেবে এদেরকে উল্লেখ করা হবে নিশ্চয়। পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্র আর প্রোফেসর, ব্যবসার ম্যানেজার আর ডিরেক্টর, যারা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ডিগ্রি পেয়েছে আর বহু দেশ বেড়িয়েছে—সবাই ভর্তি হতে লাগল সৈন্যদলে, সাধারণ সৈন্য হয়ে। যারা গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, বড়-বড় ডিভিসন ও

রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার ও কমিশার ছিল, তারাও সাধারণ প্রাইভেট-রূপে নাম লেখাল।

'পরে তারা বেছে নেবে দরকার হলে।' এই তাদের কথা : 'এখন দেশ শুধু সৈন্য চায়, আমরা তাই চাই সৈন্য হতে।'

পোশাক-আশাক, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও রণসজ্জা সব কিছুরই অভাব। কতক সামরিক পোশাক, কতক বা সাদাসিধে পোশাক এই চেহারায় অগণন লোক দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার উপর। তারা গাইতে লাগল ইণ্টারনাশিয়োনাল, গাইতে লাগল যুদ্ধের গান, যা লোককে যুদ্ধে উদ্দীপিত করে, স্তিমিত প্রাণ সাহসে উজ্জীবিত করে তোলে। জুলাই-মাসের শেষে প্রথম আমি এই 'জনসৈন্য' দেখি, ইয়েলনায়। সেই সীমান্তে ভয়ংকর রক্তাপ্লুত যুদ্ধ চলছিল। একদল জনসৈন্যের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, সামনে এগিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নিচ্ছে। কারু-কারু চুলে পাক ধরেছে দেখলাম। ভারি রাইফেলে কাঁধ নুয়ে পড়েছে তাদের, ভার বহনে তারা অনভ্যস্ত।

এদের অনেকে বীরের মতো মরেছে স্মলেনস্ক-এর যুদ্ধক্ষেত্রে। কারু-কারু বা ডাক পড়েছে মস্কৌর কাছে। কাউকে বা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে অন্য ফ্রণ্টে। আর, সে সব দিনেও, যদিও তারা সবাই সাধারণ ভদ্রলোক, যদিও তাদের হাতে সেই সবে অস্ত্র দেয়া হয়েছে, তবু তারা মহান সাহসের জ্বলন্ত পরিচয় দিলে, সবাই তারা যুদ্ধে অভ্যস্ত, দৃঢ়ীভূত হবার জন্যে তৈরি, কোনোদিন যেন ফিরে যাবেনা এই যুদ্ধ থেকে। তাদেরই থেকে তৈরি হবে বীর সেনাপতি, কুশলী গোলন্দাজ, নির্ভীক পদাতিক। মস্কৌ তাদের পিছনে, মস্কৌ পাঠাচ্ছে তাদের অস্ত্রসজ্জা, ট্রাঙ্কভর্তি গোলাগুলি আর পোশাক, পাঠাচ্ছে রাত্রি-দিন, তাদের সমস্ত প্রয়োজনের রসদ জোগাচ্ছে। আর তারা প্রতিদানে, প্রতিজ্ঞা করেছে মস্কৌকে কোনোদিন শত্রুর পদানত হতে দেবে না।

৩

মস্কৌর উপর প্রথম বিমাণ-আক্রমণ স্বুরু হল জুলাই মাসের শেষে। মস্কৌবাসীরা, যারা তাদের সব চেয়ে ভালো ছেলেদের পাঠিয়েছে যুদ্ধে, শহরের মধ্যে শক্রর সঙ্গে লড়াই স্বুরু করল। প্রত্যেক রাত্রে শত-শত সার্চলাইট অন্ধকার আকাশকে খোঁচিয়ে ফিরছে। বিমান-প্রতিরোধক গুলি-গোলা শহর বেষ্টন করে বিদীর্ণ হচ্ছে। ফেটে পড়া বোমার গর্জনে মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে আগুন। ফ্রণ্টে যেমন যুদ্ধ হচ্ছে, এও তেমনি যুদ্ধ, মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ, তাদের নিজের শহরের জন্যে যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ যে করেই হোক জিততে হবে।

শহরের মাঝখানে, যেখানে আগে বাগান বা পার্ক ছিল, যেখানে খেলত ছেলেরা আর নিভৃত কোণ দেখে বসত প্রেমিক-প্রেমিকা, সেখানে য়্যাণ্টি-এয়ারক্রাফট কামান তার হিংস্র নাক তুলে দাঁড়িয়েছে উদ্ধত হয়ে। প্রথম কয়েকদিন জার্মান বিমান একেবারে শহরের মধ্যস্থলে চলে এসেছে আর ফেলেছে ফাটা-বোমা আর আগুনে বোমা—বোমার ধারাবৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যেই গুলি দাগতে স্বুরু করেছে য়্যাণ্টি-এয়ার ক্রাফটের গোলন্দাজ। রাতের পরে রাত, দিনের পরে দিন তারা ঘুমুচ্ছেনা, বিনিদ্র তপ্ত চক্ষু তাদের স্থির হয়ে আছে আকাশে। আগুন কোথায় সত্যি লেগেছে তা ঠিক করে নিভিয়ে ফেলছে ফায়ার-ব্রিগেড—শহরের দিকে-দিকে ধূমায়িত আগুন।

যে দালানে মস্কৌর খাদ্যশস্য মজুত করা ছিল তার উপরে জার্মানরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বোমা ফেলেছে। একটা এলিভেটরে আগুন লেগে গেল। পাভলফ একদল ফায়ারম্যান নিয়ে ছুটে গেল সন্ধানে। জার্মানরা তখনো সেখানে সমানে বোমা ফেলছে। নিচু হয়ে এমন ভাবে বোমা ফেলছে যেন ফায়ারম্যানরা আগুন নেভাতে এগোতো না পারে, চারদিকে চালাচ্ছে মেশিন গান। এলিভেটরটা একটা জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এত গরম হয়ে গিয়েছে চারদিক যে মনে হচ্ছে চারদিকের গুদামগুলি সব একসঙ্গে জ্বলে উঠবে দপ করে। এলিভেটরের উপরে যে প্রকাণ্ড চিমনি তাতে ঝাপটা উঠছে প্রবল বাতাসের। গরমে চারদিকের লোকেদের পোশাকে আগুন ধরে যাচ্ছে। জলের নল নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু জল দেবার আগেই নলে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু যে করে হোক নেভাতেই হবে আগুন। লোকেরা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে আগুনের মধ্যে, গুটানো নলের কুণ্ডলী আস্তে-আস্তে খুলতে খুলতে, আস্তে-আস্তে জল ভরে-ভরে। সামনের লোকের গায়ে আগুন ধরে যাচ্ছে আর পিছনের লোক নেভাচ্ছে সে আগুন—একের পর এক। এমনি করে ঢুকছে সবাই সে অগ্নিকুণ্ডে।

এলিভেটরের আগুন নেবানো শেষ হতে না হতেই আগুন লেগে গেল রেলগাড়িতে। বারুদ-ভর্তি বোতলে বোঝাই ট্রাকে আগুন ধরেছে। জীবন বিপন্ন না করে সে আগুন নেভানো সম্ভব নয়। ভুল করে জলের ঝাপটা লাগায় সে তরল আগুন সামনের লোকের গায়ে পড়ছে ছিটিয়ে। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে সে আগুন নিবিয়ে ফেলল তারা। গোলাগুলি ভর্তি ট্রেন রয়েছে কাছে দাঁড়িয়ে। যে করে হোক নিবিয়ে ফেলতে হবে আগুন। আগুন নিবিয়ে ফেলা হল।

ফায়ারম্যানদের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মস্কো কাজ করছে। এ সব সত্যিকারের সামরিক কাণ্ড। যে সব লোক এ-আর-পি ক্লাশ করেছে, তারা এখন প্রকাণ্ড বীর হয়ে দাঁড়াল—ঘরের গিন্নি আর ঝি, বুড়ো আর ছেলে-মেয়েরা।

সে-সব বোমার এতটুকু আভাসও আর মস্কৌতে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তার জন্যে দোষ দেবার নেই জার্মানদের। মস্কৌকে ধ্বংস করবার জন্যে, ভস্মসাৎ করবার জন্যে যথাসাধ্য তারা করেছে। সাধ্যের অতীত তারা করেছে। কিন্তু ধ্বংস হবেনা মস্কো। রয়েছে তার য়্যান্টি-এয়ারক্রাফটের

গোলন্দাজ, রয়েছে তার পাইলট, মস্কো থেকে অনেক দূরেই তারা ঠেকিয়ে দিচ্ছে। আর মস্কোবাসীরা মস্কোকেই যদি একটা ফ্রন্ট বলে মনে না করত, সৈন্যের মতো না যুদ্ধ করত নির্ভয়ে, তবে অর্ধেক মস্কোকে আজ ভস্মস্তূপ দেখতাম।

যুদ্ধে নতুন-নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। মস্কোর বিমান-আক্রমণের পর এমনি একটা কাজ চালু হল। কয়েকবার বোমা বর্ষণের পর ক্যাপটেন পেদাইয়েফ্-এর অধীনে একটা বাহিনী তৈরি হল, যার কাজ হল না-ফাটা বোমাগুলোকে ঘায়েল করা।

সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ এ, চাই বুদ্ধি চাই স্থৈর্য, এক-একটা এমনিতর বোমার ওজন প্রায় এক টনেরও বেশি। এমনি একটা পড়েছিল ন্যাশনাল হোটেলের কাছে, টুকেরস্কিয়ার উপরে, আর না ফেটে ঢুকে গিয়েছে তিরিশ ফিট নিচে। একটুখানি অসাবধানে, একটুখানি খোঁচাখুঁচিতেই ফেটে যাবে বোমা, আর শুধু বাহিনীর লোকদেরকেই মারবে না, মারবে আশেপাশের সমস্ত অধিবাসীদের। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়লে পাছে হঠাৎ বোমার গায়ে লেগে যায় তাই সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙুলের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়িয়েছে।

যারা মস্কো ছেড়ে যায়নি তারা এমনি করে যুদ্ধ করেছে মস্কোর জন্যে। আর যারা বাইরে গেছে, মস্কোর জন্যে তাদেরও সেই যুদ্ধ।

৪

অক্টোবরে জার্মানরা সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল মস্কোকে। রাজধানীর কাছে ক্রমশই পেছিয়ে আসছে ফ্রন্ট—দুশো, দেড়শো, একশো কুড়ি, নব্বুই কিলোমিটার দূরে দূরে যুদ্ধ হচ্ছে।

কল-কারখানা, আফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সব মস্কো থেকে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের এত কাছে থেকে সেই বিরাট শাসনযন্ত্র চলতে পারে না। কিন্তু মস্কোর জন্যে যারা যুদ্ধ করছে, তারা একমুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি যে

তারা মস্কৌকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে যাবে। যারা সব পিছনে থাকবে, ফ্যাক্টরির কর্মী বা আফিসের কর্মচারী তারা চলে যাচ্ছে পূবে—আর যারা যুদ্ধ করবে মস্কৌকে রক্ষা করবার জন্য, তারা জমায়েৎ হচ্ছে পশ্চিমে।

আবার লোক ডাকা সুরু হল মস্কৌর সংরক্ষণে। দুশো লোক ডাকলে তিনশো এসে জড়ো হয়, পাঁচশো ডাকলে হাজার। সব কমিউনিস্ট পার্টির যুবক, রাজধানীর সেরা-সেরা ফুল —ডিট্যাচমেণ্ট থেকে ব্যাটালিয়ন, ব্যাটালিয়ন থেকে রেজিমেণ্ট আর রেজিমেণ্ট থেকে ডিভিশনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সমস্ত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের প্রথমদিকে জার্মানরা দিনে-দিনে এগিয়ে আসছে মস্কৌর দিকে। মস্কৌর কাছে তাদের প্রথম পরাভব হল ৫ই ডিসেম্বর, আর ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর মস্কৌতে স্টালিন যখন বক্তৃতা দিলেন তখন আর সন্দেহ রইল না আমাদের জয় নির্ধারিত।

সেই সময়ে মস্কৌর দুয়ারে জার্মানরা পৌঁছে গেছে। কোনো-কোনো জায়গায় তারা ষাট-সত্তর কিলোমিটার থেকে দূরে নয়। বিপদ ভয়ংকর। আর সেই সময়েই শোনা গেল স্টালিনের বক্তৃতা—তাতে জয়ের প্রতি কি প্রবল বিশ্বাস, কি শান্ত সাহসের বাণী সে বক্তৃতায়। সামনে হোক, পিছনে হোক, যে সোভিয়েট নাগরিক শুনেছে সে বক্তৃতা, হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করেছে মস্কৌ বশীকৃত হবে না, সর্বশেষ জয় তার সুনিশ্চয়।

নভেম্বরের ৮ই, ৯ই, ১০ই আর ১৫ই জার্মানরা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে মস্কৌর অভিমুখে, আর আপ্রাণ যুদ্ধ করতে করতে হটে আসছে আমাদের সৈন্যরা। কিন্তু একে পালানো বলতে পারনা। সব সময়েই সবাইর ধারণা যে মস্কৌ মারাত্মক বল সংগ্রহ করছে, পিষে গুঁড়ো করে দেবে শত্রুকে। সে গুটিয়ে ঘন হচ্ছে এই চরম মুহূর্তে তাকে পিষে ফেলার জন্যে।

সাত-দিন ধরে চলছে বিমান-আক্রমণ। প্রতি দিন জার্মানরা নতুন গ্রাম অধিকার করছে। এখান-ওখান থেকে শোনা যাচ্ছে ট্যাঙ্কের গর্জন। হাজার-হাজার মস্কৌর মেয়ে মস্কৌর সীমানা ধরে কাটছে গড়খাই, ট্যাঙ্ক ঠেকাবার গর্ত, দুর্গ, দেয়াল। ঠাণ্ডায়, বরফে আর কাদায় তারা অবিশ্রান্ত কাজ করছে। বাড়ি থেকে যে পোশাক পরে তারা বেরিয়েছিল সেই পোশাক তারা খশায়নি গা থেকে, কেননা, তাদের কাজের জন্যে নতুন পোশাক কিছুই তৈরি নেই।

সমস্ত মস্কৌ ঠাণ্ডা, ক্লেশময়, গরম করবার জন্যে জ্বালানি কাঠ নেই— দূর থেকে যত ট্রেন আসছে কেবল আনছে অস্ত্র আর অস্ত্র। মস্কৌর লোকসংখ্যা তখন কমে গেছে। কিন্তু যারা আছে তারা একজন তিন জনের, কখনো-কখনো বা চারজনের কাজ করছে। সমস্ত শহর যেন বদলে গিয়েছে যুদ্ধশিবিরে। ফ্যাক্টরির মধ্যে ঘুমুচ্ছে সবাই, দিনে তিন ঘণ্টার বেশি কেউ ঘুমুচ্ছে না।

ফ্রণ্ট তখন এত কাছে সরে এসেছে যে সামনের যুদ্ধক্ষেত্রের টাটকা খবর নিয়ে দিনে দু'দুবার কাগজ বেরুচ্ছে শহরে।

বড় বড় সমস্ত অস্ত্র-কারখানা পিছনে চলে গিয়েছে, কিন্তু মস্কৌর ভিতরে যুদ্ধ করবার জন্যে নিত্যি নতুন অস্ত্র চাই। তাই শহরের মধ্যে যত-যত ছোট-ছোট কারখানা ছিল সব মস্কৌরক্ষীদের জন্যে অস্ত্র তৈরি করতে আরম্ভ করল। যেখানে আগে প্রাইমাস স্টোভ তৈরি হত সেখানে তৈরি হতে লাগল হাত-বোমা, যেখানে আগে গৃহস্থালীর বাসন তৈরি হত, সেখানে তৈরি হতে লাগল ফিউজ আর বিস্ফোরক।

ভালো-ভালো কারিগররা সব পিছনে চলে গিয়েছে; কিন্তু শহরের কাজ করে দেয় কে? আছে গৃহিণীরা, স্বামী যাদের যুদ্ধ করতে গেছে, আছে মেয়েরা, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

১৯৪১-৪২ সালের মস্কৌর ছেলে-মেয়ে! একদিন এদের সম্বন্ধে এক

আশ্চর্য বই লেখা হবে। সবখানেই তারা ; ফ্যাক্টরিতে বাপের জায়গায় তারা। তারাই রাইফেল বানাচ্ছে, বানাচ্ছে হাত বোমা, গুলি-গোলা, বানাচ্ছে মাইন। হাসপাতালে নার্সের বদলে তারা। বিমান আক্রমণের সময় এ-আর-পি-পোস্টে তারা। তাদের স্কুলের কারখানায় তারা, ব্যাগ তৈরি করছে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের উপহার দেবার জন্যে, তৈরি করছে টিনের মগ, সেলাই করছে দস্তানা। তাদের দাদা, দিদি ও বাপের মতো তারাও মস্কোকে বাঁচাতে যুদ্ধ করছে। যদি মস্কোর কোনো পার্কে মস্কো-রক্ষীদের কোনো মূর্তি স্থাপিত হয়, হাতে তার অটোম্যাটিক রাইফেল, তবে তার পাশে মূর্তি তৈরি করতে হবে তার পনেরো বছরের ছেলের, যে ছেলে ১৯৪১এর শরতে বাপের জন্যে তৈরি করেছিল ঐ রাইফেল।

সে সব দিনে মস্কো কি শান্ত ও গম্ভীর ছিল। ডিসেম্বরের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা যতই এগিয়ে আসছে, মস্কোবাসীদের ততই ভয় পাবার কথা। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে শহরের ব্যবধান যতই কমে আসছে ততই হিংস্রভাবে সামনের যুদ্ধ চলছে, ততই তীব্র ভাবে চলছে ভিতরের কাজ। মহান জাতির বিপুল রাজধানী মহান সাহসের উদাহরণ দিচ্ছে।

পিছনে দেয়াল, আর হটে যাবার মতো জায়গা নেই, এমনি ভাবে যুদ্ধ করছে মস্কোর রক্ষীরা। জার্মানরা যদি কখনো একটা গ্রাম নিচ্ছে বা নিচ্ছে আর কোনো জায়গা, বুঝতে হচ্ছে সেখানে আর একটি রক্ষীও জীবিত নেই।

যতই বাধা পাচ্ছে ততই বর্বর হচ্ছে হিটলারের সৈন্যরা, আর এদিকে পূব থেকে দলে-দলে চলে আসছে—লালফৌজ, পরনে শীতের গরম পোশাক, রণসজ্জায় উজ্জ্বলন্ত—আসছে দশ-পনেরো মিনিট অন্তর-অন্তর নতুন ট্যাঙ্ক লাইনের ওপর দিয়ে।

কোথায় যে যাচ্ছে এরা কেউ জানেনা। অগণিত লোক, বন্দুক আর ট্যাঙ্কের বাহিনী। সমস্ত নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস ধরে তারা আসা

যাওয়া করছে। কেউ ফ্রণ্টে যাচ্ছে না। ফ্রণ্টের লোকেরা শুধু অনুভব করছে এদের উপস্থিতির উত্তাপ। আর তাতেই তাদের শক্তি দশগুণ বাড়ছে।

মস্কৌর চারিদিকে যে অরণ্য, সেই অরণ্যে তারা জমায়েৎ হচ্ছে, ফ্রণ্টের কাছাকাছি জায়গায়। মস্কৌর গরম বাড়িতে সৈন্যেরা আবার কবে থাকবে জার্মানদের সেই সুখস্বপ্নে ব্যাঘাত পড়ছে—স্টালিনের হাতে ঝুলছে এখন ঘাতকের তলোয়ার।

৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে ইস্পাতের স্প্রিংকে তার শেষ সীমা পর্যন্ত চেপে গুটিয়ে নেয়া হল, আর ৫ই ডিসেম্বর ছেড়ে দেয়া হল সেই চাপ। সৈন্য আর সমরোপকরণ যা যেখানে সাজানো হয়েছিল সব একত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়া হল জার্মানের উপর। নিশ্বাস বন্ধ করে সমস্ত দেশ যার জন্যে অপেক্ষা করছিল শোনা গেল সেই 'আক্রমণের' ঘোষণা। মস্কৌর সম্মুখের সৈন্যরা প্রতিরোধ ছেড়ে আক্রমণ করেছে। মস্কৌর আশে-পাশের সমস্ত গ্রামের নাম আবার খবরের কাগজে উঠতে সুরু করল, এবার উলটো দিক থেকে। বরফ আর বৃষ্টি, কুয়াশা আর ঝড়, তার ভিতর দিয় এগিয়ে চলল আমাদের সৈন্য। সুরু হল জার্মানদের শীত-বিনাশ।

মস্কৌ! শীত আবার আসন্ন। মোটরের ঢাকা হেড লাইটের শাদা আলোয় বরফের কুচি চিকচিক করছে। পরিত্যক্ত পার্কের মধ্য দিয়ে ঘোড়সওয়ার ঘোড়া চড়ে চলেছে খুরের শব্দ তুলে। অন্ধকার নভেম্বর আকাশে অস্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে ক্রেমলিনের চূড়া।

মস্কৌ! তোমার স্বপ্ন দেখছে লক্ষ-লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য, তুষারাচ্ছন্ন ককেশাসের শৃঙ্গে, বারেণ্টস্ সমুদ্রের তরঙ্গে। তাদের কাছে তোমার মূর্তি, গর্বের আর অপরাজয়ের। লৌহবর্মাবৃত বিদেশী দস্যুকে তুমি প্রত্যাখ্যান

করবে।

মস্কো! রাশিয়ার লোকের কাছে তুমি তাদের জন্মভূমির প্রতিভূ, তাদের জীবনের প্রতীক। এখন থেকে তুমি তাদের জয়েরও নিদর্শন, জয় আপনা থেকেই আসে না, জয় জয় করতে হয়, যেমন আগে-আগে তোমার প্রাচীন দুর্গ-প্রাকারে তুমি তা জয় করেছ।

এফ্ পানফেরফ

কমিশার লেফ্‌চেন্‌কো

কমিশার লেফ্‌চেন্‌কো মাঠ পেরিয়ে হালকা পায়ে চলল জুনিয়র লেফটেনেণ্ট য়ারট্‌সেফ্-এর ডাগ-আউটে। যে দিনটে ভালো যায় সেদিন সে এমনি হালকা পায়ে হাঁটে। আজ তেমনি একটি ভালো দিন, জার্মানদের হটিয়ে দেয়া হয়েছে পাহাড়ের গা থেকে, তাদের সব পরিখা ও ডাগ-আউট এখন য়ারট্‌সেফ্-এর দলের হাতে। লেফ্‌চেন্‌কো আর য়ারট্‌সেফ্-এর মধ্যে যেন একটা গোপন বোঝাপড়া আছে যে তারা কেউ তাদের জয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করবে না, শুধু একে অন্যের দিকে তাকাবে স্নিগ্ধ বন্ধুতায়।

ডাগ-আউটে নেমে লেফ্‌চেন্‌কো অবাক হয়ে গেল। ভেবেছিল য়ারট্‌সেফ্‌কে একা দেখতে পাবে, দেখল বহু লোক তাকে ঘিরে বসে আছে। কি একটা আলোচনা হচ্ছে। সবাই তাতে তন্ময়। সাশা ক্রাইনফ—যে একডিয়ন বাজায়, সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলছিল যে জগতে বন্ধুতা সুদুর্লভ, প্রায়ই বিপদের প্রথম আবির্ভাবেই বন্ধুতা ভেঙে পড়ে। চতুর্দিক থেকে সে আক্রান্ত হচ্ছিল। শুধু য়ারট্‌সেফ্ ছিল চুপ করে। কোণে বসে সে যেন ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ সে জেগে উঠে চিবুকে হাত বুলিয়ে বললে, 'যুদ্ধে, দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধের পরেই আমাদের হাতে রঙের তাস হচ্ছে এই বন্ধুতা।' 'রঙের তাস' কথাটা যেন তার মনের ভাবটা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারেনি, তবু সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনছে বলে নিজেকে সে বেশ সহজ মনে করলে, বললে,

'আমাদের রেজিমেণ্টে একজন লোক আছে—আমার উচ্চতম কর্মচারী সে, সব সময়ে তার আদেশ আমি পালন করি—তার যদি কোনো বিপদ হয় আমি সাধ্যাতীত হলেও তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য।'

'যদি তাতে মৃত্যু হয়, তা হ'লেও?' সাশা ক্রাইনফ চেঁচিয়ে উঠল।

'সে কথা আমার মনেই আসবে না, কেননা আমি জানি আমার বন্ধুকে আমি যদি বাঁচাবার চেষ্টা না করি তবে আমার আত্মসম্মানের হানি হবে।'

'আমি জানি তুমি কার কথা বলছ।' সাশা ক্রাইনফ বললে তিক্ততর স্বরে, 'কমিশার লেফ্‌চেন্‌কো।'

লেফ্‌চেন্‌কো কখন চলে গেল অদৃশ্য হয়ে।

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় পরিখার লাইন কোথায় সান্ত্রীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে লেফ্‌চেন্‌কো চলে গেল, সঙ্গে অডারলি পর্যন্ত নিলে না। না নেওয়াটা তার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। বেশিক্ষণ নয়, পথ হারিয়ে ফেললে সে, ভুলে ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে, আর সেইখানে একটা বাঁক নিতেই জার্মানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। রিভলভার বের করবার আগেই তার দু'বাহু বেঁধে ফেলল তারা।

শত বিপদেও লেফ্‌চেন্‌কো মাথা ঠাণ্ডা রাখে, কিন্তু তখন তার বুক কেঁপে উঠল, গলা গেল শুকিয়ে। তবু, সহজে সে ছেড়ে দেবেনা। গেল সে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে।

জার্মানরা তার মাথার উপর দিয়ে একটা ছালা দিল গলিয়ে আর তাকে নিয়ে চলল তুলে। কয়েকঘণ্টা পরে তাকে পাঠিয়ে দিলে একটা ঘরের মধ্যে। সে-ঘরে ঝুলছে কতগুলো কম্বল, আর জানলাগুলির খড়খড়ি টানা। ছোট-ছোট করে চুল-ছাঁটা একজন জার্মান বসে আছে একটা টেবিল নিয়ে। হেসে সে উঠে দাঁড়াল, একটা চেয়ারের দিকে লক্ষ্য করে

রাশিয়ান ভাষায় বললে, 'বোস, কমিশার লেফ্‌চেন্‌কো। আমাদের আগের থেকেই চেনাশোনা। সত্যি, তোমার সম্বন্ধে আমার যতটা ঔৎসুক্য আছে, আমার সম্বন্ধে তোমার ততটা নেই। সেটা তোমার পক্ষে নিন্দনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু যাই হোক, বোস চেয়ারে। আমার নাম হচ্ছে য়োহান মিলার। মনে পড়ে নামটা? পড়ে না? একটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা করা দরকার। মনে কর না দরকার বলে? সে কি? বসবেনা তুমি? তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাও, আমার সামনে? প্রবল জার্মানীর প্রতিনিধির সামনে?'

লেফ্‌চেন্‌কো বসল।

মিলারের চোখের নিচেকার কুঞ্চনগুলি ফুটে উঠল। কিন্তু, আবার সে হাসল, জানলার একটা পাখি একটু নেড়ে সে বললে, 'দেখতে চাও, নতুন সৈন্যদের কি করে আমরা ট্রেনিং দিই?'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল লেফ্‌চেন্‌কো। দেখতে পেল গ্রামের খানিকটা রাস্তা আর তার প্রান্তে একটা বাঁশ টাঙানো। বাঁশের সঙ্গে একটা উলঙ্গ মানুষ বাঁধা, তার দু'হাত প্রসারিত।

'ও তোমাদেরই একজন সৈন্য।' বললে মিলার, 'নতুন সৈন্যদের গুলি ছোঁড়া শেখার ও জীবন্ত টার্গেট।'

আর, সত্যি সত্যি, কতগুলি যুবক বেরিয়ে এল একটা কুঁড়েঘর থেকে। পোশাক দেখে চিনতে পারল, ওরা সব সোভিয়েট টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র। সকলের শেষে বেরুলো এক জার্মান। ছেলেদের কাছে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে কি বলল আর বারে-বারে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল সেই বাঁশে-বাঁধা লাল সৈন্যকে।

'ও ওদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে', বললে মিলার, 'সৈন্যটার শরীরের কোন-কোন জায়গা সাংঘাতিক। বুঝতে পারছ? মাথা, হার্ট, পেট। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, পেটের দিকে তাক করাটাই আমি ভালো

মনে করি। ঠিক পেট সই করে মারো, গুলি খেয়েও লোকটা ভাববে সে বেঁচে আছে, কিন্তু আসলে অক্কা পেয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আর আমাদের ডক্টর ফ্রেডরিক ঠিক জানেন তা।'

যাকে মিলার ফ্রেডরিক বলে আখ্যাত করল সে সেই উলঙ্গ লাল সৈন্যের দিক থেকে চলে এল একটি ছেলের কাছে, তার হাতে রাইফেল দিলে আর অর্ডার দিলে: 'ফায়ার!' ছেলেটা যেন হঠাৎ কুঁকড়ে গেল, এক জনের থেকে চাইতে লাগল আরেক জনের মুখের দিকে। সহসা রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটির উপর, আর ডাঙায়-ওঠা মাছের মতো ছটফট করতে লাগল। ফ্রেডরিক কাছে এসে একটু ঝুঁকে পড়ে ছেলেটাকে দেখলে আর তার মাথার পিছন দিক থেকে সোজা গুলি চালিয়ে দিলে।

'চমৎকার! সাবাস!' চেঁচিয়ে উঠল মিলার, লেফ্‌চেন্‌কোর দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বললে, 'এমনিই হওয়া উচিত এ-সব। তুমি কি বল? যখন হুকুম হবে, গুলি কর, তখন গুলি তো করতেই হবে। তা নয় তো দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো কাঁদাকাটা করবে নাকি? আমরা ওদেরকে ধরে এনেছি, মানুষ করতে চেষ্টা করছি ওদেরকে, যদি ওদের মাঝে খানিকটা মেরুদণ্ড এনে দিতে পারি। তাছাড়া ওদের উপায় কি? দেখলে তো, হিটলারাইটরা কেমন গুলি ছোঁড়ে!'

ছ'জন দৃঢ় মেরুদণ্ড সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ছুটে এল সেই আঙিনায়। এক লাইনে দাঁড়াল আর ফ্রেডরিকের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সেই উলঙ্গ লাল সৈন্যের দেহে একসঙ্গে গুলিবৃষ্টি করলে আর তক্ষুনি ছুটে দেখতে গেল তার শরীরের 'সাংঘাতিক জায়গাগুলি'।

লেফ্‌চেন্‌কোর চোখে মিলার দেখতে পেল ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ। জানলার খড়খড়ি ছেড়ে দিয়ে বললে ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'তুমি ভাবছ তোমাদের ছেলেরা লাল সৈন্যকে গুলি করবে না। করবে, নিশ্চয়ই করবে।

করবে না? তা হলে কি হবে ভাবতে পার? ওদেরকে আমরা গুলি করব। একশোর ভিতর থেকে একটাকে ধরে নিয়ে আসব। তারপর
পাশের ঘরে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। য়োহান মিলার বদলে গেল নিমেষে, চোখে জ্বলে উঠল বিষাক্ত দৃষ্টি আর সমস্ত কপট বিনয় বিসর্জন দিয়ে লেফ্‌চেন্‌কোর কাছে এসে তার নাক ম'লে দিয়ে বললে, 'ঢের হয়েছে! এই বোকা সাজা। শোন, আমি তোমার কাছে বেশি কিছু চাইনা, শুধু চাই আমাদের লোকদের তোমাদের লাইনের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাও। শুধু এইটুকু। কি, রাজি?' এই বলে সে টেবিলের উপর একটা পিস্তল রাখল।
'ইচ্ছে করলেই আমাকে ও মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমি আগেই ওর চোয়ালের উপর ঘুসি বসিয়ে দেব।' মনের মধ্যে এই চিন্তাটা জ্বলে উঠতে-না-উঠতেই লেফ্‌চেন্‌কো ঝাঁপিয়ে পড়ল মিলারের উপর।
মুহূর্তে দরজা গেল খুলে আর তিন জোড়া হাত লেভশেংকোর কাঁধ আঁকড়ে ধরল।
'আ—' মিলার উল্লসিত হয়ে বললে, 'দাও ওকে দোলনায় চড়িয়ে। পনেরো মিনিট। না, দশ মিনিটেই হবে। আজকে আমার মেজাজ খুব ভালো আছে।'

শব্দ করে দরজা খুলে গেল আর লেফ্‌চেন্‌কোকে ঠেলে দেওয়া হল একটা অর্ধ-অন্ধকার ঘরের মধ্যে। সে বুঝতে পারল না তার স্থানের জ্যামিতিটা। উপরে কোথাও তুমুল বাজনা চলছে, তাই থেকে সিদ্ধান্ত করল একই দালানে কোনো একটা নিচের তলায় সে আছে। কয়েক মিনিট পরে তার দৃষ্টি অভ্যস্ত হল সেই অন্ধকারে আর বুঝতে পারল সে কোথায়!
ঘরটা বেশি বড় নয়, অনেকগুলি জানলা আছে, একটা ছাড়া আর সব

বন্ধ। যেটা আছে সেটা লোহার গরাদে দেওয়া। এটা কোনো ফাঁদ নিশ্চয়ই হবে, তাই ভেবে লেফ্‌চেন্‌কো সাবধানে এগুলো সেই খোলা জানলার দিকে। লোহার শিকগুলি ধরে খুব জোরে টেনে টেনে দেখল দেয়ালের মধ্যে তাদের গভীর গাঁথুনি।

'হ্যাঁ, এখান থেকে আর বাইরে বেরুবার উপায় নেই।' অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে। হঠাৎ মনে হল, দু'হাত কিরকম চটচট করছে। তাকাল সে করতলের দিকে, তাকিয়ে নিশ্চল পাথর হয়ে গেল তার দু'হাতে রক্ত মাখা। তাকাল জানলার শিকের দিকে, গোবরাটের দিকে, মেঝে, দেয়াল, সিলিঙের দিকে—সমস্তখানে রক্ত। 'এ কি সত্যি মানুষের রক্ত হতে পারে?' আতঙ্কে ভাবল সে নিস্পন্দ হয়ে। তারপর যন্ত্রচালিতের মত দু' আঙুল দিয়ে জানলার তলা থেকে ধরল খানিকটা জমানো রক্তের তাল, একখণ্ড জেলির মতো তলতল করছে। সে কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গে, ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে, দাঁতে দাঁত লেগে গেল। 'ককখনো এ মানুষের রক্ত নয়।' ছুটে চলে গেল সে কোণের অন্ধকারে। আর সেখান থেকে, সেই অন্ধকার কোণ থেকে সে দেখল, দরজার পাশেই একটা মানুষের হাতের চিহ্ন, রক্তাক্ত হাত। স্পষ্ট সে দেখতে পেল মনশ্চক্ষে, একটা লোকের শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে আর সে অন্ধের মত দরজার উপর এসে আছড়ে পড়েছে, দিকভ্রষ্ট হয়ে হাত দরজার উপর না প'ড়ে পড়েছে দেয়ালে।...আর, লেফ্‌চেন্‌কো বুঝতে পেল, এই ঘরে কাপুরুষরা নয়, বীরেরা অত্যাচারিত হয়েছে, যারা ভালোবেসেছে তাদের দেশকে, সবল চরিত্র ও সবল সাধুতার যারা অধিকারী।

দরজা খুলে গেল আর য়োহান মিলার দু'জন সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করল।

'ও! তুমি?...ক্ষমা করো, অনধিকার প্রবেশ করছি তোমার ঘরে। তুমি এখনো কথা কইবে না? কি অদ্ভুত লোক তুমি বল তো!' হাসল

মিলার, 'ওপরতলায় তোমার সঙ্গে যদি কোনো দুর্ব্যবহার করে থাকি তো ক্ষমা কোরো। সত্যি-সত্যিই যে অন্তরের সঙ্গে বলছি তা প্রমাণ করবার জন্যে তোমাকে দোলনা আমি দশ মিনিট দেবনা, দেব আট মিনিট। কেবল আট মিনিট। যাক, তুমি এই বদমাস দুটোর দিকে একটু চোখ রেখ।' সঙ্গের সৈন্য দুটোকে লক্ষ্য করে বললে, 'দেখো, ওরা যেন তোমাকে বেশিক্ষণ রাখেনা। ঠিক আট মিনিট।' তারপর সৈন্য দুটোকে কি বুঝিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তখুনি ফিরে এসে চারদিকে তাকিয়ে, দেয়াল সিলিং আর জানলার গোবরাটের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'বলশেভিক রক্ত। বুঝছ? এখনো যদি তুমি দেখতে বিবেচনা ক'রে! তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, তুমি এখনো যুবক আছ, হয়তো তোমার প্রিয়া আছে, মা আছে। ভাবো একবার তোমার সে-প্রিয়ার, বিশেষ করে তোমার মার কি অবস্থা হবে যখন তুমি, যখন তুমি…' সে হাত দিয়ে নিজের গলার উপর একটা ইঙ্গিত করলে আর বুড়ো হাঁসের মতো উঠল অদ্ভুত শব্দ করে। 'তোমার কাছ থেকে বেশি কিছু চাইনা—শুধু তোমাদের লাইনের পিছনে আমাদের লোকগুলোকে নিয়ে চলো। আমাকে বিশ্বাস করো তুমি, কেউ জানতে পারবে না এ-কথা। তুমি অনায়াসে বলতে পারবে, তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলে, কিম্বা তৈরি করে নেবে অন্য কোন ওজর।' মিলার তাকাল লেফ্‌চেন্‌কোর চোখের দিকে, তার পর ঘুরে গিয়ে বললে, 'ওরকম চোখ উপড়ে তুলে ফেলা উচিত।' চলে গেল সে, দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিলে শব্দ করে।

সৈন্য দুটো লেফ্‌চেন্‌কোর সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে উলঙ্গ করলে। তারপর তার জিনিসপত্র নিয়ে সুরু করল ভাগাভাগি।

'মরে যাবার আগেই আমার জিনিসপত্র এরা ভাগাভাগি করছে। তার মানেই এখান থেকে আমি আর জীবন্ত বেরুতে পারবনা।'

লেফ্‌চেন্‌কো মন স্থির করে ফেললে, 'কিছুই যখন আর করবার নেই তখন যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকব, ওদের শান্তি পেতে দেবনা।'

সিলিঙ থেকে ঝুলছিল একটা আংটা, তার সঙ্গে সৈন্যদুটো দুটো তোয়ালে বাঁধলে, দুটো ফাঁস তৈরি করে লেফ্‌চেন্‌কোর দু'বগলের তলা দিয়ে চালান করে দিলে। টেনে তাকে তুলে ফেললে শূন্যে। তখনো লেফ্‌চেন্‌কো হাসছে। ভাবছে, এ কি মস্করা হচ্ছে তার সঙ্গে! কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই তার মাথাটা ফুলে উঠতে লাগল, কোটর থেকে চক্ষু দুটো বাইরে বেরিয়ে এল ঠেলে, আর সমস্ত শরীরে সে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। ঠিক চার মিনিটের পর লেফ্‌চেন্‌কো অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে তখন নামিয়ে ফেলল ওরা, নুনের জল দিল সারা দেহে ছড়িয়ে, আর ছুঁড়ে ফেলে দিলে এক কোণে। যখন তার জ্ঞান হল তখন সে দেখল হাত-পা সে নাড়তে পারছেনা একচুল, মাথাটা ভারি এক তাল শিসে।

য়োহান মিলার আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। দর্পিত ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে বললে, 'কেমন লাগল আমাদের দোলনা? মনে হচ্ছে আট মিনিট থাকবার মতো তুমি শক্ত নও। সত্যি বলতে কি, কেউ পারেনি অতক্ষণ থাকতে। বড় জোর চার মিনিট। তোমার আরো চার মিনিট আছে।'

লেফ্‌চেন্‌কো তাকাল সেই তোয়ালে দুটোর দিকে। চার মিনিট! চার-চারটে যন্ত্রণা-তীক্ষ্ণ মিনিট। মনে হচ্ছে দোলনাটা তত ভয়ংকর নয়, যত হচ্ছে এই প্রতীক্ষার আতঙ্ক—আবার তোমার বগলের তলা দিয়ে ফাঁস জড়াবে, আবার ঝুলবে তুমি, তোমার মাথা ফুলবে, চোখ বেরিয়ে আসবে, সমস্ত দেহের তন্তুতে-তন্তুতে ছুটবে তপ্ত অগ্নিস্রোত।

'আমি বুঝছি তোমার মনের কথা,' মিলার বললে দাম্ভিক ভঙ্গীতে, 'এভাবে ঝোলাটা খুব আরামের নয়। সেই ক্ষেত্রে সব চেয়ে সোজা হচ্ছে এই আমার লোকদের তোমাদের লাইনের পিছনে নিয়ে যাওয়া।

সঙ্গে-সঙ্গেই তোমার সমস্ত কষ্টের অবসান। তারপর, তোমরা ম্যুজিকরা যেমন বল, সবাই তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আর কেউ জানতেই পারবেনা যে তুমি এখানে একদিন ছিলে। মন ঠিক করে ফেল।' বলেই সে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

লেফ্‌চেন্‌কোর উপর সুরু হল ফের উৎপীড়ন। তাকে ঝোলানো হল শূন্যে, আর কে একজন তার কাঁধের উপরে মাংসের মধ্যে জুতো-সেলাই করার স্থঁচ ফুটিয়ে দিলে আর ফুটিয়ে দিয়েই একটানে তুলে ফেললে তখুনি। রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে সিলিঙ পর্যন্ত স্পর্শ করলে। তার হাত মুচড়ে দিতে লাগল, নোখগুলি ফেললে উপড়ে-উপড়ে। তবু সে কথা কইবে না। রবারের ছোট-ছোট লাঠি দিয়ে তাকে মারতে লাগল। মারতে লাগল পিঠে, তলপেটে। তবু কথা কইবে না লেফ্‌চেন্‌কো। দুই দাঁতের পাটি দৃঢ়বদ্ধ করে সে তার চোখ একজায়গায় নিবদ্ধ করে রেখেছে—তার রক্তাক্ত পায়ের আঙুলের দিকে। একবার তার মনে পড়ল তার বন্ধু জুনিয়র লেফটেনেণ্ট য়াবুট্‌সেক্‌-এর কথা, মুখের উপর দিয়ে ক্ষণিক একটি হাসি গেল খেলে, আবার দুই দাঁতের পাটি দৃঢ় নিবদ্ধ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে রক্তাক্ত পায়ের আঙুলের দিকে।

পরদিন য়োহান মিলার রাগে অন্ধ হয়ে গেল যখন দেখলে, লেফ্‌চেন্‌কো তখনো কোনো কথা কয়নি। 'যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে সে না বলে, তাকে চাঁদমারি বানাও।' হুকুম দিয়ে চলে গেল সে বাইরে।

লেফ্‌চেন্‌কোকে বাইরে নিয়ে আসা হল। আগের দিন যে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল লাল সৈন্যটাকে, সেই বাঁশের সঙ্গে তাকে বাঁধলে।

আর তখুনি একদল লোক পাশের রাস্তা থেকে ছুটে এল কাতার দিয়ে। পরনে তাদের চাষার পোশাক, হাতে রাইফেল আর হাত-বোমা। সবশুদ্ধু চৌদ্দজন, ছড়িয়ে পড়ল বিস্তৃত হয়ে। পাশের দালানে, যেখান থেকে তখনো বাজনার আওয়াজ আসছে, সেখানে ছুঁড়ে মারতে লাগল

হাত-বোমা। আর সেখান থেকে, সেই ভয়ংকর ঘর থেকে জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল জার্মানরা, আর বেরিয়ে এসেই সঙিনের খোঁচায় ঘায়েল হতে লাগল।

সেই চৌদ্দ জনের মধ্যে একজনকে লেফ্‌চেন্‌কো চিনতে পারল। সে জুনিয়র-লেফটেনেণ্ট য়ারট্‌সেফ্।

মিখাইল শোলোখফ

ঘৃণা

'শত্রুকে কেউই হারাতে পারে না তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে না শিখে।'

যুদ্ধে, মানুষের মতো, গাছেরও নিয়তি আছে। আগুনে-গুলিতে একটা প্রকাণ্ড বনখণ্ড সাফ হয়ে যেতে দেখলাম। এখানে সম্প্রতি জার্মানরা আস্তানা গেড়ে বসেছিল, অনেক দিন থাকবে এমন আশা ক'রে, কিন্তু মৃত্যু গাছের সঙ্গে-সঙ্গে ওদেরকেও ভূমিসাৎ করে দিলে। পাইন গাছের গুঁড়ির নিচে মৃত জার্মান, ফার্ন আর ব্র্যাকেনের জীবন্ত সবুজের মধ্যে তাদের বিধ্বস্ত শরীরের মাংসস্তূপ, আর দগ্ধ বারুদের গন্ধ কিছুতেই তাদের পচ-ধরা দেহের দুর্গন্ধ দূর করতে পারছেনা। মাটি থেকে পর্যন্ত উঠছে এই কবরের গন্ধ।...

শুধু একটা কৃশ রুপালি বার্চ গাছ কি ক'রে বেঁচে গেছে, তার তরুণ উজ্জ্বল পাতাগুলি দোলাচ্ছে এখন হাওয়ায়।

ফাঁকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। তরুণ সিগন্যালার যাচ্ছিল আমার আগে-আগে, গাছটাকে স্পর্শ করে আন্তরিক ও সস্নেহ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে, 'কি করে বেঁচে রইলে, বন্ধু?'

নাম-না-জানা এক নদীর ধারে ছিল এক প্রাচীন ওক-গাছ, তার গুঁড়িতে লেগেছিল জার্মান গোলা। সেই প্রকাণ্ড ক্ষত অর্ধেক গাছের প্রাণ শুষে নিয়েছিল, কিন্তু বাকি অর্ধেক নতুন বসন্তের স্পর্শে অদ্ভুত ভাবে বেঁচে গিয়েছিল, ফেটে পড়েছিল অজস্র ও উচ্ছ্বসিত পত্রপুঞ্জে। আজও পর্যন্ত সেই বিধ্বস্ত গাছের তলার দিকটা জলের মধ্যে ডুবে

আছে, কিন্তু উপরের শাখা প্রাণদীপ্ত পত্রভার নিয়ে সূর্যের দিকে প্রসারিত।

ডাগ-আউটের মুখে লেফটেনেণ্ট গেরাসিমফ বসে, লম্বা, একটু-বা ঝুঁকে পড়েছে, চওড়া কুঁজো মতন কাঁধে উড়ন্ত চিলের একটা ভাব আছে, বলছিল আজকের যুদ্ধের বিবরণ।

তার শীর্ণ মুখে শান্তি, প্রায় ঔদাস্য শ্রান্তিতে চোখ দুটো শুধু জ্বলছে। গম্ভীর, কর্কশ গলায় সে বলছে, আর থেকে-থেকে এক হাতের আঙুলের ফাঁকে আরেক হাতের আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিচ্ছে: আর এই ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছে কী নিঃশব্দ দুঃখ আর কী নিবিড় ভাবনায় সে পীড়িত হচ্ছে। তার বলিষ্ঠ দেহ আর পৌরুষব্যঞ্জক মুখের সঙ্গে এ বেদনাবোধের যেন সঙ্গতি নেই।

হঠাৎ তার কথা বন্ধ হয়ে গেল আর সমস্ত মুখের ভাব গেল বদলে। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, গালের হাড়ের নিচেকার গর্তে ছোট-ছোট মাংসের ডেলাগুলো কুঁচকে উঠল আর তীক্ষ্ণ চোখে জ্বলে উঠল হিংস্র ও অনির্বাণ ঘৃণা। ওর দৃষ্টি ধরে তাকালাম সামনে। তিনজন জার্মান বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের লাল সেনা। হলদে কাদা-মাখা বুট পরে চলেছে শ্রান্ত-মন্থর গতিতে। লাল সেনার হাতে ধারালো সঙিন, ঝিলিক দিচ্ছে রোদ্দুরে। চলেছে আস্তে-আস্তে।

প্রথম জার্মানটা—বয়েস হয়েছে, কোটরগত গালে কাঁটা কাঁটা বাদামী দাড়ি—নেকড়ে বাঘের মতো তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল তখুনি, বেল্টের সঙ্গে বাঁধা হেলমেটটা বসাল ঠিক করে। গেরাসিমফ লাফিয়ে উঠল, বললে চেঁচিয়ে, লাল সেনাকে লক্ষ্য করে, 'কি? ওদেরকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি? যাও, যাও শিগগির ওদেরকে নিয়ে যাও সমুখ থেকে।' বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার চোখে বিস্মিত জিগগাসা দেখে আমাদের রাজনীতি শিক্ষক নিচু গলায় বললে, 'উপায় নেই। ওকে একবার জার্মানরা বন্দী করেছিল —জান না তোমরা? ওকে একবার জিগগেস করে দেখো। কি ভয়ংকর দিন গিয়েছে ওর, আর তারি জন্যেই জীবন্ত কোনো জার্মানের চেহারা ও সহ্য করতে পারে না চোখ মেলে—হ্যাঁ, জীবন্ত কোনো জার্মান। মরা জার্মানদের দিকে চেয়ে থাকতে ওর আপত্তি নেই, বরং আমি বলব তাতে ও ভীষণ তৃপ্তিই লাভ করবে, কিন্তু একবার চোখে পড়ুক ওর কোনো জার্মানবন্দী, হয় সে চোখ বুজে আঁট হয়ে বসে থাকবে, মৃত্যুর মতো ম্লান হয়ে, নয় তো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।'

রাজনীতি-শিক্ষকের গলা আরো অস্ফুট হয়ে এল: 'দুবার আমি ওর সঙ্গে যুদ্ধে ছিলাম। ওর ঘোড়ার মতো শক্তি, তোমাদের স্বচক্ষে দেখা উচিত। আমাদের সময়ে দু'একজনকে আমরা দেখেছি, কিন্তু ওর মতন সঙিন আর বন্দুকের কুঁদো নিয়ে এমন এলোপাতাড়ি ঘা মারতে কখনো দেখিনি—সত্যিই ভয়ংকর।'

সেই রাত্রে জার্মানরা ঘোরতর গুলি বর্ষণ করছিল। কতক্ষণ পরে-পরেই দূর থেকে গুরুগম্ভীর শব্দ, কয়েক সেকেণ্ড পরেই নক্ষত্রাকীর্ণ আকাশে দুরন্ত একটা অগ্নিপিণ্ডের গুঞ্জন ক্রমশ আর্তনাদে প্রসারিত হয়ে চলে গেল কোথায়, আমাদের পিছনে, রাজপথের অভিমুখে, যেখানে সারা দিন ধরে লরি আসছে গুলি-গোলা বোঝাই হয়ে—কতক্ষণ পরেই হঠাৎ একটা হলদে আলোর বিচ্ছুরণ—আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্র-বিদারণের আওয়াজ।

বিদারণের মাঝে-মাঝে শুনতে পাওয়া যায় আবার বনস্থলীর নীরবতা, মশার ক্ষীণ প্যানপ্যানানি আর কাছের জলভূমিতে বিরক্ত ব্যাঙের ডাক।

একটা হেজেলের ঝোপের নিচে আমরা শুয়ে আছি আর লেফটেনেণ্ট গেরাসিমফ গাছের একটা ডাল দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে তার গল্প বলছে। যতদূর মনে পড়ে বলছি সেই গল্প।

"যুদ্ধের আগে আমি পশ্চিম সাইবেরিয়ার কারখানায় একজন কারিগর ছিলাম। গত বছর সবে আমার ডাক পড়েছে—ঠিক করে বলতে, নয়ুই জুলাই। আমার পরিবার আছে, স্ত্রী, দু'টি সন্তান, আর আছে আমার বিকলাঙ্গ বাপ। আমাকে বিদায় দেবার সময় স্বভাবতই আমার স্ত্রী কেঁদেছিল, কিন্তু শেষে এই কথাই বলে আমাকে অনুপ্রাণিত করলে, 'তোমার দেশ ও পরিবারকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করো। যদি দরকার হয় প্রাণ দিও, কিন্তু যেমন করেই হোক, জিততে আমাদের হবেই।' মনে আছে হেসেছিলাম, বলেছিলাম, 'তুমি কে, আমার স্ত্রী, না পরিবারের প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট? আমার মনে হয় আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি কি কাজে যাচ্ছি আমি, আর জয়ের কথা যদি বলো, আমরা তা ফ্যাসিস্টের কণ্ঠনালী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব, ভেবনা তুমি।'

"আমার বাবা অবিশ্যি অনেক শক্ত। কিন্তু আমাকে যাবার আগে উপদেশ না দিয়ে ছাড়লেন না। বললেন, 'ভিক্টর, মনে রেখ গেরাসিমফ বংশ সামান্য নয়। শ্রমিক-কারিগরের বংশধর তুমি, শত-শত বছর ধরে তোমার বংশের লোক দেশের লোহা তৈরি করছে—এই যুদ্ধে তোমাকেও হতে হবে লোহার মতো। এই গভর্নমেণ্ট আমাদের নিজের তৈরি, যুদ্ধ লাগবার আগে থেকেই এ তোমাকে কমাণ্ডার করেছে, আর তার নির্বাচনের ফল বুঝতে দিও তোমার শত্রুদের।'

" 'নিশ্চয়ই দেব।'

"স্টেশনে যাবার পথে গেলাম ডিস্ট্রিক্ট পার্টি কমিটির আস্তানায়। আমাদের সেক্রেটারি যিনি, নীরস কাঠখোট্টা ধরনের লোক—সেও যে বক্তৃতা

দিতে বসবে, তা কে জানত। বললে, 'বোস, কোথাও যাবার আগে কয়েক মিনিট বসে গল্প করে যাওয়ার নিয়ম ছিল আগের দিনে।'

"কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা। পরে সে উঠে দাঁড়াল, লক্ষ্য করলাম যে তার চশমা ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভাবলাম, কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটছে আজকে—'কিছুই বিশেষ বলবার নেই। পায়োনিয়রের লাল-রুমাল-পরা সেদিনের সেই এতটুকু ছোট ছেলে তোমাকে দেখে-ছিলাম—সেই কথা আজ মনে পড়ছে। তার পর ছিলে কমসোমল এর মেম্বর, তার পর আজ দশ বছর তুমি পার্টির লোক। জার্মান হারামজাদাকে কোনো দয়া, কোনো মমতা দেখিও না। পার্টি তোমার ওপর নির্ভর করে।' জীবনে এই প্রথম প্রাচীন রুশীয় পদ্ধতিতে আমরা পরস্পরকে চুম্বন করলাম—আর কি ক'রে কে জানে সেক্রে-টারিকে শুকনো কাঠ বলে আর মনে হল না। সুখী ও উত্তেজিত বোধ করলাম।

"আমার স্ত্রীও আমার মনে আনল তরল প্রসন্নতা। স্বামীকে যুদ্ধে পাঠানো কোনো স্ত্রীর পক্ষেই খুব প্রীতিকর ব্যাপার নয়। আমার স্ত্রীও প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল, দরকারি কি যেন বলতে চাইছিল অথচ মনে করতে পারছিল না। ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে আর সে ছুটছে সঙ্গে-সঙ্গে কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছেনা আমার হাত, আর অনবরত বলে যাচ্ছে, 'শরীরের যত্ন নিও, দেখো যেন ঠাণ্ডা না লাগে।'

" 'কি বলছ তুমি, নাদিয়া? আমাকে ভাবছ কি তুমি? ঠাণ্ডা লাগার কোনো ভয় নেই সেখানে, ওসব দেশের স্বাস্থ্য বেশ ভালো, না-ঠাণ্ডা, না-গরম।' বিষাদে মন ভরে যাচ্ছিল, ছেড়ে যাচ্ছি ওকে, ও কি বলছে না বলছে তাই ভেবে মনকে প্রফুল্ল রাখছি। হঠাৎ জার্মানদের প্রতি একটা ঠাণ্ডা রাগ আমাকে পেয়ে বসল। বেইমান প্রতিবেশী, যেহেতু তোমরা আগে আরম্ভ করেছ—দেখবে কি হয় তোমাদের!

জন্মের মতো মার খাবে তোমরা।”

কতক্ষণ চুপ করে থেকে শুনল দু'পাশের সম্মুখ লাইনের মেশিন-গানের শব্দ। যেই একটু থামল অমনি বলতে সুরু করল :

“যুদ্ধের আগে জার্মানি থেকে আমাদের কলকব্জা আসত। যখন তা জড়ো করতাম, মনে আছে, প্রত্যেকটি অংশ পাঁচ-ছ'বার করে দেখতাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, কোনো কুশলী হাত গড়েছে এই কলকব্জা। জার্মান লেখকদের বই প'ড়েছি, কি ক'রে কে জানে জার্মানদের আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম। সত্যি, একেক সময় মনে হত এমন গুণী যে জাত, এমন যে পরিশ্রমী সে ঘৃণ্য হিটলারের শাসন মেনে নিচ্ছে, এ লজ্জা রাখবার আর জায়গা নেই।···কিন্তু সে যাক, সে তাদের ঘরোয়া বিষয়।···শেষে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধল···

“যখন যাত্রা করলাম ফ্রন্টের দিকে, না ভেবে পারলাম না, ওদের সৈন্য খুব মজবুত, ওদের শিল্পনৈপুণ্য নিখুঁত। একথা যখন একবার তুমি বিশ্বাস কর, তখনই তোমার স্ফুর্তি হয় সে-শত্রুর সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করবে, তাকে তুমি ধ্বংস করবে। ১৯৪১ সনে আমরা আর বোকা নই। আমার মনে কোনোই মোহ ছিল না যে শত্রুর বিবেক বলে কিছু থাকবে—ফ্যাসিজম সম্বন্ধে থাকতে পারে না সে-মোহ—তবু বলব কি, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে জার্মানরা এমন বর্বর এমন নীতিশূন্য হতে পারে। কিন্তু সে কথা পরে আসছে···

“জুলাই মাসের শেষে আমরা ফ্রন্টে এসে পৌছুলাম। ২৭শে তারিখের সকাল বেলা আরম্ভ করলাম যুদ্ধ। প্রথম-প্রথম নতুন বলে একটু ভয় হচ্ছিল—বিকেলের মধ্যেই বুঝে নিলাম ব্যাপারটা। ওদেরকে হটিয়ে দিলাম একটা গ্রামের থেকে। ধরে আনলাম পনেরোটাকে। যেন সেদিনের ঘটনা, এমনি স্পষ্ট মনে আছে। ভীত, বিশীর্ণ—ওদেরকে নিয়ে আসা হল। আমার দলের লোকেরা ততক্ষণে জুড়িয়ে গেছে, প্রত্যেকেই

তারা কিছু-না-কিছু দিতে লাগল বন্দীদের, কেউ কিছু তামাক বা সিগারেট, কেউ বা চা। আর ওরা তাদের পিঠ চাপড়ে বললে, 'ক্যামেরাড—কিসের জন্য যুদ্ধ করছ ক্যামেরাড?' এই জাতীয় হিজিবিজি।

"আমাদের ভিতরে একজন লক্ষ্য করছিল এই প্রাণস্পর্শী দৃশ্য, বললে, 'রাখ ও সব ভাবুনেপণা। এখানে ওরা নিজেদের ক্যামেরাড বলছে, কিন্তু দেখ গিয়ে ওদের লাইনের পিছনে কী করছে ওরা, আমাদের আহত সৈন্য ও বেসামরিক লোকদের প্রতি কি-রকম ব্যবহার করছে।' ওর কথা শুনে আমাদের তেমনি অবস্থা হল যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল আমাদের উপর কে ফেলে দিলে। বলেই চলে গেল ও।

"এর কিছু পরেই আমাদের সৈন্যেরা আক্রমণ করল, আর আমরা দেখতে পেলাম সত্যি কি করছে ওরা।···গ্রাম পুড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে, শত-শত মেয়ে, শিশু আর বৃদ্ধকে গুলি করে মেরে রেখেছে, দেখতে পেলাম বিকৃত-বিষণ্ণ লাল-সৈন্যদের মৃতদেহ, ধর্ষিত স্ত্রী আর মেয়ে, ধর্ষিত মেয়েদের মৃতদেহ।

"'একটা দৃশ্য বিশেষ করে আমার মনে এখনো লেগে আছে। মেয়েটির বয়েস মোটে এগারো। জার্মানেরা যখন ওকে ধরে তখন নিশ্চয়ই ও স্কুলে যাচ্ছিল। ধরে ওকে নিয়ে গেল ক্ষেতের মধ্যে, বলাৎকার করলে, তারপর বধ করলে। শুয়ে আছে সে দলিত আলুর শাকের উপর, একটু-খানি একরত্তি মেয়ে। চার-পাশে ছড়িয়ে আছে তার বইগুলি, রক্তের দাগ লাগা।···তার মুখে তলোয়ারের কাটার চিহ্ন, বীভৎস দেখাচ্ছে। তবু আঁট করে ধরে আছে তার বইয়ের ব্যাগ, যদিও মুখ খুলে গিয়ে ছিটকিয়ে পড়েছে বইগুলি! একটা কোট দিয়ে ওর দেহটাকে ঢেকে দিলাম, দু'মিনিট দাঁড়ালাম সেখানে স্তব্ধ হয়ে। আর সবাই চলে গেল, আমি ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম আশে-পাশে, একটা মূর্ছার মধ্যে

থেকে বারে-বারে আওড়াতে লাগলাম মনে-মনে বারখফ আর পলোরিনকিন। প্রাকৃতিক ভূগোল—উচ্চতর স্কুলের জন্য। ঘাসের উপর পড়ে আছে ওর একখানা বই। আগে দেখেছি ঐ বই। কেননা আমার ছোট মেয়েও অমনি ঐ ফিফথ ফর্মেরই ছাত্রী।

"এ ঘটেছিল রুজিন্-এর কাছে। সৃক্‌ভিরিতে বন্দী লাল-ফৌজকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে একটা গুহার মধ্যে। কসাইয়ের দোকান দেখেছ : তা হলে বুঝতে পারবে কতকটা।

"গাছের ডালের সঙ্গে ঝোলানো আছে মৃতদেহগুলি, রক্তাক্ত মৃতদেহ। হাত আর পাগুলি কুপিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে, তুলে ফেলা হয়েছে অর্ধেক চামড়া।

"...আরো আটটা শব স্তূপীকৃত হয়ে আছে এক পাশে। ও সব কাটা হাত-পা কোন দেহের সঙ্গে খাপ খাবে কেউ বলতে পারবে না। শুধু কতগুলি তাল-তাল কাটা মাংস একত্র করে রাখা হয়েছে। আর তাদের উপর প্লেটের মতো সাজানো, একটার পর একটা, আটটা টুপি, আমাদের সৈন্যদেরই টুপি।

"যা নিজের চোখে দেখেছি তা কি কথায় ফোটাতে পারি? অসম্ভব। তা বর্ণনা করবার মত ভাষা তৈরি হয়নি। তোমাকে তা দেখতে হবে নিজের চোখে। যাক, অন্য কথা কিছু বলো।"

লেফটেনেণ্ট গেরাসিমফ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

"সিগারেট খেতে পারি?" জিগগেস করলাম।

"পারো, কিন্তু দেখো যেন আলো দেখা না যায়।" নিজে একটা ধরিয়ে বলতে সুরু করল লেফটেনেণ্ট, "সহজেই বুঝতে পার জার্মানদের ঐ সব কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছি। যা উচিত ছিল তাই হয়েছি আমরা। সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি, আমরা মানুষের সঙ্গে কারবার করছি না, করছি কতগুলি রক্তলোভী বর্বরের

সঙ্গে। যে আশ্চর্য নিপুণতায় জার্মানরা যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে, সেই আশ্চর্য নিপুণতায়ই ওরা খুন করছে, ধ্বংস করছে, বর্ষণ করছে।

"আমার দলের বেশির ভাগ লোকই সাইবেরিয়ার, তবু ইউক্রেনের মাটির প্রত্যেকটি ইঞ্চির জন্যে আমরা নিষ্ঠুর যুদ্ধ করতে লাগলাম। আমাদের অনেকে মরল বটে, কিন্তু জার্মানরা মরল ঢের বেশি। হটছিলাম বটে কিন্তু হটার চোট ওদের কম পোয়াতে হয়নি।"

সিগারেটে দুটো টান দিয়ে আবার সে বলতে সুরু করল, এবার অন্য স্বরে: "চমৎকার দেশ এই ইউক্রেন, কি চমৎকার দৃশ্য! প্রত্যেকটি গ্রাম আমাদের আপনার। যখন একেকটা গ্রাম ছেড়ে-ছেড়ে আসছিলাম, বুক ভেঙে যাচ্ছিল, সহ্য হচ্ছিল না। সে যে কি দুঃখ, কি যন্ত্রণা, কি বলব! ছেড়ে যাচ্ছি গ্রাম, একে অন্যের চোখের দিকে তাকাতে পাচ্ছিনা পর্যন্ত।

"তখন বুঝতেই পারিনি জার্মানদের হাতে আমি ধরা পড়ব। তাই হল কিন্তু এক দিন। সেপ্টেম্বরে আমি আহত হলাম, তবু থেকে গেলাম দলের সঙ্গে। একুশে তারিখে আবার আহত হলাম ডেনিসক্কার যুদ্ধে, আর ওরা আমাকে বন্দী করলে।

"সেদিন বিশ্রী গুমোট ছিল। আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, সূর্য এমন জ্বলছে যে মনে হচ্ছে নিশ্বাস নিতে পাচ্ছিনা। অবিশ্রান্ত গোলা এসে পড়ছে আর আমরা পিপাসায় এমন হয়ে গেছি, সবাইর ঠোঁট ফুলে কালো হয়ে গেছে, আর আমার গলার স্বর এমন বিগড়ে গিয়েছে যে নিজের আওয়াজ নিজেই চিনতে পারছিনা। আমরা একটা বনপথ পার হচ্ছিলাম, একটা গোলা এসে ফাটল আমার সামনে। অস্পষ্ট মনে পড়ে, যেন দেখলাম, মাটি আর ধুলোর একটা কালো স্তম্ভ উঠল আকাশে—ব্যস্, এই পর্যন্ত। আমি পড়ে গেলাম।

"কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম মনে নেই, কতগুলি পদধ্বনি শুনতেই হুঁস

হল। মাথা তুলে তাকালাম, দেখলাম যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম সেখানে আমি নেই। আমার জামা নেই, কাঁধের কাছে যা-তা করে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হেলমেট নেই, মাথায়ও বাঁধা একটা ব্যাণ্ডেজ। ভালো করে বাঁধা হয়নি, একটা ধার ঝুলছে আমার বুকের উপর। চকিতে মনে পড়ল আমার দলের লোকেরা আমাকে খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে পথের মধ্যেই ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিল, আর আমি ওদেরকেই দেখতে পাব ভেবে কষ্টে মাথা তুলেছিলাম তখন। কিন্তু আমার দিকে যারা ছুটে এল তারা আমার দলের লোক নয়—জার্মানরা। ওদেরই পায়ের শব্দে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সিনেমায় পর্দায় ছবির মতন ওদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার চারপাশে হাতড়াতে লাগলাম, একটা রিভলবার বা রাইফেল বা হাত-বোমা কিছুই পেলাম না নাগালের মধ্যে। আমার দলেরই কেউ হয়তো আমার অস্ত্র আর থলে নিয়ে গিয়েছে।

“এই তবে শেষ। ভাবলাম মনে-মনে। আর কি ভাবতে পারি আমি সেই মুহূর্তে? সত্যি কথা বলতে, কিছুই ভাববার তখন আমার সময় ছিল না। জার্মানরা কাছে এসে পড়েছে, আর শুয়ে-শুয়ে মরতে আমার প্রবৃত্তি নেই। না, মরব না শুয়ে-শুয়ে। তাই প্রাণপন চেষ্টা করে মাটিতে দু'হাতের ভর রেখে হাঁটু গেড়ে উঠে পড়লাম।

“ওরা এসে পড়াতেই দু'পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাতালের মতো টলছি, যে কোনো মুহূর্তেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব আর জার্মানরা সঙিনের খোঁচায় আমাকে শেষ করে ফেলবে। ওদের একটা মুখও এখন আমার মনে পড়ে না। ওরা আমাকে ছেঁকে ধরল, চেঁচাতে লাগল, হাসতে লাগল। 'মার আমাকে, আর নিজেও মর—আমার মরবার আগে।' ওদের একজন মারল আমাকে রাইফেল দিয়ে—কিন্তু ফের উঠে দাঁড়ালাম। ওরা হাসিতে ফেটে পড়ল, একজন হাত নেড়ে বললে, 'চল।' আমি

চলতে লাগলাম।

"মাথার রক্তে আমার মুখ ভেসে যাচ্ছে, গরম, আঠার মতো রক্ত। কাঁধে দারুন ব্যথা, ডান হাত তুলতে পাচ্ছিলাম না। আমার মনে পড়ে, আমার সমস্ত শরীর চাইছিল সেখানে শুয়ে পড়ে, আর না হাঁটে—তবু আমি হাঁটতে লাগলাম।

"না, মরতে আমার এতটুকু ইচ্ছা ছিলনা, তার চেয়ে আরো ইচ্ছা ছিলনা ওদের হাতে থাকি বন্দী হয়ে। দুর্ধর্ষ চেষ্টা করে, সমস্ত শ্রান্তি আর দৌর্বল্য দাবিয়ে রেখে চলতে লাগলাম। তবু, এখনো আমার মধ্যে প্রাণ আছে, আমি এখনো কিছু করতে পারি। কিন্তু, হায় কি তেষ্টা পেয়েছে! আমার মুখের ভিতরটা শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেছে; যদিও আমার পা চলছে, চোখের সামনে দেখছি শুধু একটা কুয়াশার পর্দা। এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব বোধহয়, তবু চলেছি, আর মনে মনে আঁচ করছি, জল একবার একটু খেতে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

"আমরা যারা ধরা পড়েছি সবাইকে একত্র করা হল জঙ্গলের ধারে, লাইন বেঁধে। প্রায় সবাই আহত। আমার রেজিমেণ্টের দু'জনকে শুধু চিনতে পারলাম।

"একজন জার্মান লেফটেনেণ্ট ভাঙা-ভাঙা রুশ ভাষায় প্রশ্ন করলে, আমাদের মধ্যে কেউ সেনাপতি আছে কিনা। কেউ উত্তর দিলনা। পরে সে চেঁচিয়ে উঠল: 'সেনাপতিরা দু'কদম এগিয়ে এস।' কেউ সর'ল না এক চুল।

"ইহুদীর মতো দেখতে এমন পনেরো-ষোল জনকে বাছল লেফটেনেণ্ট। 'জুড?'—প্রত্যেককে সে জিগগেস করলে, আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই হুকুম করলে বেরিয়ে আসতে। তার মধ্যে সবাই ইহুদী ছিল না, আর্মেনিয়ন ছিল, কালো চুল মাথায় কালো চামড়ার রাশিয়ানও ছিল। কতদূরে ওদেরকে নিয়ে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে ওদেরকে

একের পর এক মেরে ফেলা হল—আমাদের চোখের সামনে। তারপর স্থরু হল আমাদের গা-তল্লাসী, যা কিছু ছিল পকেটে, নিয়ে গেল নির্বিশেষে পকেট বুক পর্যন্ত। আমার পার্টি-কার্ড আমি কখনো পকেট-বুকের মধ্যে রাখতাম না, আমার প্যাণ্টের ভিতর দিকের পকেটে তা ছিল, তাই ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে। বড় অদ্ভুত জীব এই মানুষ। জানতাম, ক্ষীণ সুতোর আগায় ঝুলছে আমার জীবন। যদি পালাবার চেষ্টা করার সময়ও ওরা আমাকে না মারে, এত রক্ত আমার ক্ষয় হয়েছে যে রাস্তায় হাটতে গিয়ে আমি মরে যাব। তবু গা-তল্লাসী যখন হয়ে গেল আর যখন দেখলাম আমার পার্টি-কার্ড আমার কাছেই আছে তখন এত আনন্দ হল যে পিপাসার কথা মনেই রইল না।

"আমাদেরকে সার বেঁধে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পশ্চিমের দিকে। রাস্তার দু'পাশে রক্ষীরা চলেছে, পিছনে মোটর-সাইকেলে প্রায় বারো জন জার্মান। বড় তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আর আমি ক্রমশই নিঝুম হয়ে আসছিলাম। দু'বার পড়ে গেলাম, দু'বারই টলতে-টলতে উঠে পড়লাম, এক মুহূর্ত বেশি পড়ে থাকলেই পিছনের দল বেরিয়ে যেত, আর তক্ষুনি মারত আমাকে গুলি করে, ঐ রাস্তার উপরেই। এমনি করেই মরেছে একজন সার্জেণ্ট, ঠিক আমার সামনে। তার পায়ে জখম হয়েছিল, নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে পাচ্ছিল না। ভীষণ গোঙাচ্ছিল, যন্ত্রণায় উঠছিল চীৎকার করে। এক কিলোমিটার হয়তো গেছি, চেঁচিয়ে উঠল : 'ওঃ, আর পাচ্ছি না সহ্য করতে। বিদায়, বন্ধুরা।' এই বলে বসে পড়ল রাস্তার মধ্যে।

"আর-আর সবাই হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে চাচ্ছিল তাকে, কিন্তু সে বারে-বারেই খসে-খসে পড়ে যাচ্ছিল পিছলে। ওকে আমার এখন স্বপ্নে-দেখা বলে মনে হচ্ছে—সেই শীর্ণ, ম্লান অথচ কচি মুখ, কুঞ্চিত ভুরু, যন্ত্রণার অশ্রুজলে দুই চোখ টলটল করছে। চলে গেল বাহিনী।

ও পড়ে রইল পিছে। পিছন ফিরে তাকালাম একবার, দেখলাম মোটর-সাইকেলে চড়ে কে একজন এল তার কাছে এগিয়ে, আর সাইকেল থেকে না নেমেই তার পিস্তল তুলে নিয়ে সার্জেণ্টের কানের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে গুলি করলে। নদীতে এসে পৌঁছুবার আগে আরো এমনি মরেছে আমাদের লাল-সৈন্য।

"নদী চোখে পড়লো। দেখলাম ভাঙা সেতু, একটা লরি ক্রসিং-এর ধারে আটকে আছে। আর ঠিক সেইখানেই আমি পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়লাম কি? না, অজ্ঞান হইনি। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম, সমস্ত মুখে ধুলো, দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলাম, তবু উঠতে পারলাম না। আমার কমরেডরা চলে যাচ্ছে আমার পাশ দিয়ে। 'শিগগির উঠে পড়।' যেতে যেতে একজন বললে গলা নামিয়ে, 'নইলে ওরা তোমাকে সাবাড় করে ফেলবে।' আঙুল দিয়ে টেনে টেনে নিজের মুখ ছিঁড়ে ফেলতে চাইলাম, চোখের ডেলা দুটোকে এমন জোরে চাপতে লাগলাম যেন সেই যন্ত্রণা আমাকে আমার পায়ের উপর ফের দাঁড় করিয়ে দেয়।

"বাহিনী চলে গেল সমুখ দিয়ে, আর শুনতে পেলাম এগিয়ে-আসা মোটর-বাইকের শব্দ। কি ক'রে কে জানে, উঠে দাঁড়ালাম পায়ের উপর। মোটর-বাইকে কে আসছে তার দিকে না তাকিয়ে, মাতালের মতো টলতে-টলতে, ধরলাম গিয়ে বাহিনীকে, জায়গা নিলাম পিছনের লাইনে। অনেক ট্যাঙ্ক আর লরি চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে, ফেনিয়ে ঘনিয়ে তুলেছে কাদা, তবু সেই জল আমরা তৃপ্তি করে খেলাম—সেই গরম বাদামী ঘোলা জল—মনে হল ঝর্নার স্বচ্ছ জলের চেয়েও এ মিষ্টি। আমার মাথা আর কাঁধ ভিজিয়ে নিলাম সেই জলে। অনেক চাঙ্গা বোধ করলাম, আমার শক্তি যেন আবার ফিরে এল। এখন আমি হাঁটতে পারি—আর হয়তো আমি পড়বো না মুখ থুবড়ে, একা পড়ে থাকব না রাস্তায়।

"নদী বেশিক্ষণ পেরিয়ে আসিনি, কতগুলি মাঝারি আকারের জার্মান ট্যাঙ্ক দেখতে পেলাম সামনে। আমাদের বন্দী দেখে প্রথম ট্যাঙ্কের ড্রাইভারটা একেবারে আমাদের উপর দিয়ে তার ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিলে। আমাদের দলে প্রথম লাইনে যারা ছিল তারা ছিন্নভিন্ন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মোটর-সাইকেল-চালকের দল আর বাকি সব রক্ষীরা সবাই বিকট শব্দে হেসে উঠল, ট্যাঙ্কের ক্রু-দের বললে কি চেঁচিয়ে, ওরা ওদের মাথাটা একটু বাড়িয়ে হাত নাড়লে। যারা-যারা বাকি ছিলাম তারা আবার লাইন বেঁধে চলতে লাগলাম। সত্য, কি বিভৎস রসিকতা এই জার্মানদের।

"সেই সন্ধ্যায় ও রাতে আমি পালাবার কোনো চেষ্টা করলাম না, কেননা পারব না পালাতে—রক্তক্ষয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া, কড়া পাহারা রাখা হয়েছে আমাদের উপর, পালানোর চেষ্টা মানেই সর্বনাশ। কিন্তু পরে আমি ভীষণ আপশোষ করেছি, তখন আমি পালাবার চেষ্টা করিনি কেন।...

"সন্ধ্যায় আমরা পৌছুলাম এসে যুদ্ধ-বন্দীর আস্তানায়। চারদিকে কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা, যুদ্ধের যান-বাহন রাখার জায়গা সেটা। বন্দীদের গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ঠেকিয়ে। ক্যাম্প-গার্ডরা বন্দুকের বাঁটের গুঁতো দিয়ে-দিয়ে আমাদের ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। একে যদি ক্যাম্প বল, তবে নরককেও বলতে হবে, কিছু না। প্রথমত, ভালো পাইখানা নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানেই পাইখানা করতে হবে আর বসে বা শুয়ে থাকতে হবে সেই ময়লা ও দুর্গন্ধের মধ্যে। আমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা একেবারে উঠতেই পারত না। দিনে একবার শুধু খাবার ও জল দেওয়া হত—এক মগ জল আর একমুটো কাঁচা জোয়ার। আর কিছু না। এক-একদিন ভুল হয়ে যেত, কিছুই দিত না।

"দু'দিন পরে প্রবল বৃষ্টি সুরু হল। আমাদের হাঁটু পর্যন্ত কাদা আর জল—বৃষ্টির আর থামবার নাম নেই। প্রতি রাত্রে মরতে লাগল সৈন্যরা—ডজনে-ডজনে। খেতে না পেয়ে দিনে-দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম সবাই। আর আমার ঘায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল।

"দু'দিনের দিন মনে হল আমার মাথা আর কাঁধের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ঘা-গুলোতে পুঁজ জমেছে, দুর্গন্ধ হচ্ছে। গুরুতরভাবে যারা আহত তারা ক্যাম্পের পাশে আস্তাবলে শুয়ে ছিল। সকালবেলা গার্ডকে বললাম, 'আমাকে অনুমতি দাও, ডাক্তারকে একবার দেখাই আমার ঘা-গুলো।' শুনেছিলাম ডাক্তার আহতদের মধ্যে আছেন। জার্মানটা রাশিয়ান বেশ ভালো বলে, বললে, 'তোমাদের নিজেদের ডাক্তারের কাছে যাও। সে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে।'

"তখন বুঝতে পারিনি তার শ্লেষ, বরং আমি খুশি হয়েই গেলাম সেই আস্তাবলে।

"লাল সৈন্যের ডাক্তারের সঙ্গে আমার দেখা হল দরজার গোড়ায়। দেখেই বুঝতে পারলাম, মরতে আর তার বেশি দেরি নেই। কঙ্কালের মতো শীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত। কী গেছে তার উপর দিয়ে সেই কথা মনে করে সে এখন অর্ধ-উন্মাদ। আহতরা চারপাশে পড়ে আছে, দুর্গন্ধে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। অধিকাংশেরই ঘায়ে পোকা পড়েছে, আর যারা পারছে তারা সে-সব পোকা তাদের নখ দিয়ে বা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বার করছে।··· পাশে পড়ে আছে মৃতদেহের স্তূপ—সরিয়ে নেবার কারুর সময় হচ্ছে না।

"'দেখছ এ সব?' ডাক্তার বললে, 'কী তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি? আমার কাছে একটাও ব্যাণ্ডেজ বা ওষুধ নেই। চলে যাও এখান থেকে। ও-সব ময়লা ব্যাণ্ডেজগুলো নিয়ে যাও খুলে, আর ওদের ঘায়ের উপর ছাই ছড়িয়ে দাও। দরজার গোড়ায় কিছু টাটকা ছাই

পড়ে আছে।’

“তাই করলাম। সেই জার্মানটার সঙ্গে আমার দরজার কাছে ফের দেখা হল। হাস্যবিস্তৃত মুখে সে বললে, ‘কেমন হল তোমার? তোমাদের সৈন্যরা চমৎকার ডাক্তার পেয়েছে। সে কিছু সাহায্য করল তোমাকে?’ কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম পাশ কাটিয়ে, সে আমার মুখের উপর এক ঘুসি মারলে, বললে, ‘আমার কথার জবাব দেবে না, শুয়োরের বাচ্চা?’—পড়ে গেলাম আর সে আমাকে লাথি মারতে লাগল, বুকে আর মাথায়, আর যতক্ষণ না নিজে শ্রান্ত হল ততক্ষণ চালাল এই লাথি। যত দিন বেঁচে থাকব ভুলব না সেই জার্মানটাকে, না, কখনো না। তার পর আরো অনেকবার সে আমাকে মেরেছে। কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে যখনই দেখতে পেয়েছে আমাকে, হুকুম করেছে আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে, আর তারপর মার চালিয়েছে আমার উপর, অত্যন্ত নীরবে, এককভাবে...

“নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছ, কি ভাবে সহ্য করলাম অত? যুদ্ধের আগে, কারিগর হবার আগে, কামা নদীর ঘাটে আমি কুলি ছিলাম, দু’দুটো এক হন্দরি নুনের বস্তা পিঠে বইতে পারতাম আমি। হ্যাঁ, বলবান ছিলাম, দুর্জয় ছিল আমার স্বাস্থ্য। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই, আমি মরতে চাইনি—এমন দুর্বার ছিল আমার প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। যে করে হোক ফিরে যেতে হবে আমাকে আমার সৈন্যদলে, যারা লড়াই করছে তাদের দেশের জন্যে—আর শেষ পর্যন্ত আমি ফিরে গেলাম, ফিরে গেলাম শত্রুর উপর শোধ তুলতে।

“সেই ক্যাম্প থেকে আরেকটা ক্যাম্পে আমাকে বদলি করা হল। কোনোই তফাৎ নেই, মাথার উপরে নেই ছাদের অবশেষ—একেবারে ফাঁকা। একই রকম খাওয়া, শুধু মাঝে-মাঝে কাঁচা জোয়ারের বদলে এক মগ আঠা-আঠা ঝোল—কখনো বা টেনে নিয়ে আসত

ঘোড়ার মৃতদেহ, বন্দীদের বলত সেই মরা মাংস ভাগাভাগি করে নিতে। তাই খেতাম আমরা, পাছে অনাহারে না মরে যাই, কিন্তু তবু শয়ে-শয়ে লোক মরতে লাগল আমাদের।...তারপর, ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে উঠল শীত প'ড়ে, অক্টোবরে নামল বিরামহীন বৃষ্টি, আর সকালবেলায় কুয়াশা। সাংঘাতিক কষ্ট হতে লাগল আমাদের, এক মরা সৈন্যের গা থেকে কোট খুলে নিয়ে পরলাম আমি, তবু কিছুতেই শীত মানছিল না।

"যারা আমাদের পাহারা দিচ্ছে তাদের সবাইর পেট-ভরা চোরাই খাদ্যে হৃষ্টপুষ্ট। একই গোয়ালের গরু সবাই। ওদের ফুর্তির নমুনাটা একবার দেখ। সকালবেলা কর্পোরেল তারের বেড়ায় ওদিক থেকে ঘোষণা করে: 'এবার রেশন দেয়া হবে। সুরু হবে বাঁ দিক থেকে।'

"চলে যায় কর্পোরেল। যারা উঠে দাঁড়াতে পারে দাঁড়ায় বাঁ থেকে। অমনি দাঁড়িয়ে আছি এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা—কখনো-কখনো তিন ঘণ্টা। শত-শত কম্পমান জীবন্ত কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছি সেই তীব্র শীতের বাতাসে। দাঁড়িয়ে আছি, প্রতীক্ষা করে আছি।

"হঠাৎ কতগুলো জার্মান এসে দাঁড়ায় ওপারে। বেড়া টপকে কতগুলি ঘোড়ার মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে। ক্ষুধার্ত জনতা সেই সব মাংসখণ্ডের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একে অন্যেকে চেপে পিষে ফেলে। কাদায় ফেলা ঘোড়ার মাংসের জন্যে সুরু হয় উন্মত্ত কাড়াকাড়ি।

"জার্মানরা উচ্চশব্দে হাসে। তারপর হঠাৎ সুরু হয় মেশিনগানে উদ্দাম গুলিবর্ষণ, সুরু হয় আর্তনাদ। বন্দীরা ছুটোছুটি সুরু করে, আহত আর মৃতদের রেখে দাঁড়ায় গিয়ে আবার বাঁ দিকে।...তারপর ক্যাম্পের সুপারইণ্টেণ্ডেণ্ট আসে। হাসি থামাতে পারছে না, তবু বলছে, 'শুনতে পেলাম রেশন বিলি হবার সময় কেলেঙ্কারি করছে রাশিয়ানরা। এমনি

যদি আর হয় কখনো প্রত্যেককে গুলি করা হবে। সরিয়ে নিয়ে যাও জখমি আর মরা লোকগুলোকে।' জার্মান সৈন্যরা হাসে পাঁজরা কাঁপিয়ে। ওই তাদের রসিকতা।

"নিঃশব্দে মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে গেলাম পর্বতের নালায়, গোর দিলাম।

"সেই ক্যাম্পে প্রায়ই আমাদের ওরা প্রহার করত, ঘুসি আর লাঠি আর বাঁট। কখনো-কখনো স্রেফ মজা পাবার জন্যে মারত, এমনিতে তাদের ভালো লাগছেনা বলে মারত। আমার ঘাগুলো শুকিয়ে আসছিল, মার খেয়ে আবার খুলে যাচ্ছিল ঘায়ের মুখ। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু বেঁচে থাকলাম এক আশায়, পালাব এখান থেকে। ওরা আমাদের এক কুটো খড়ও দেবে না। শুতাম কাদার উপর, পরস্পরের গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, কেবল তিক্ত যন্ত্রণা।

"দুঃস্বপ্নের মতো দিন যাচ্ছে আর প্রতিদিন দুর্বলতর হচ্ছি। একটা শিশু পর্যন্ত আমাকে ঠেলা মেরে ফেলে দিতে পারে। নিজের অস্থিসার বাহুর দিকে চেয়ে ভয় পেতাম। কি করে যাব এর বাইরে ? নিজেকে ধিক্কার দিতাম কেন প্রথম দিকেই পালাবার চেষ্টা করিনি। যদি ওরা আমাকে মেরে ফেলত, তবে এমন বীভৎস যন্ত্রণা আর পেতে হত না।

"শীত এল। বরফের কুচো সরিয়ে আমাদের ঘুমোতে হত ঠাণ্ডা মাটির উপর। ক্রমশই আমাদের সংখ্যা কমে আসছে। শেষে একদিন বলা হল, আমাদেরকে শিগগিরই কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। সকলেরই মনে সুদূর ও ক্ষীণ একটি আশা হল, পালাতে পারব এবার।

"সে-রাত ভারি স্তব্ধ ও ঠাণ্ডা ছিল। ভোর হবার আগেই শুনতে পেলাম গুলিবর্ষণের আওয়াজ। আমার চারপাশের লোকের দেহে যেন প্রাণ-সঞ্চার হল। আর বন্দুকের শব্দ যখন এল আরো কাছাকাছি, কে একজন

চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড—এ আমাদের সৈন্য—আক্রমণ করেছে।'

"তারপর কি যে হল, আয়ত্ত করতে পারছি না। সমস্ত ক্যাম্প খাড়া হয়ে উঠল পায়ে পায়ে—এমন কি যারা উঠে দাঁড়াতে পারত না, তারাও। চার দিকে শুনতে পাচ্ছি উত্তেজিত ফিসফসানি, রুদ্ধ কণ্ঠের কান্না।...কেউ কাঁদছে আমার কাছাকাছি, একেবারে স্ত্রীলোকের মতো...আর আমিও...আমিও..."

গেরাসিমফ-এর গলা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ থেমে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে সে শান্ত স্বরে, "আমারও গাল বেয়ে গড়াতে লাগল অশ্রুর ধারা, শুকিয়ে যেতে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়ায়।...দুর্বল কণ্ঠে কেউ-কেউ গাইতে সুরু করল ইণ্টারনাশিয়োনাল্—ধুয়ো ধরল আরো অনেকে। সান্ত্রীরা গুলি চালাতে লাগল আমাদের উপর। শুয়ে পড়ো—কে হুকুম দিয়ে উঠল। আমি শুয়ে পড়লাম বরফের উপর আমার বুক চেপে ধরে, কাঁদতে লাগলাম শিশুর মতো। সে অশ্রু গর্বের আর আনন্দের, আমাদের দেশবাসীর জন্যে গর্ব। নিরস্ত্র ও নির্বল আমাদেরকে মারতে পারে জার্মানরা, কিন্তু আমাদের আত্মাকে বশীভূত করতে পারে না, ককখনো না। সোজাসুজি বলছি, তারা ভুল লোকদের ধরে রেখেছে।"

লেফটেনেণ্ট গেরাসিমফের গল্পের শেষটুকু সেরাত্রে আর শোনা হয়নি। হেডকোয়ার্টার থেকে হঠাৎ তার জরুরি ডাক এসেছিল। আরো কিছু দিন পর আবার আমাদের দেখা হল। সে বসে আছে একটা বেঞ্চির উপর, হাঁটু ঘিরে দুইবাহু, প্রকাণ্ড হাড়ের কব্জি, আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। তারদিকে চেয়ে আমার মনে হল বন্দী-শিবিরে থেকে তার ঐ অভ্যাস হয়েছে, অমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকা, আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়িয়ে, বিমর্ষ, নিষ্ফল চিন্তার ভার বুকে চেপে...

"শুনতে চাও, পালালাম কি করে? শোন। বন্দুকের আওয়াজ শোনবার পর, আমাদেরকে লাগানো হল সংরক্ষণের কাজে। বৃষ্টি পড়ছিল। ক্যাম্প থেকে উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। আবার ঘটতে লাগল সেই আগেকার ঘটনা, শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছিল কেউ-কেউ, আবার তেমনি গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছিল তাদের, পড়ে থাকছিল তারা তেমনি রাস্তার পাশে।

"একজন রাস্তা থেকে পচা একটা আলু কুড়িয়ে নিয়েছিল বলে একজন জার্মান অফিসার তাকে গুলি করলে। আমরা একটা আলুর খেত পার হচ্ছিলাম। আমাদের সেই লোক—নাম গৌচার, ইউক্রেনের একজন সার্জেণ্ট। তুলে নিয়েছিল একটা আলু, চাইছিল লুকিয়ে ফেলতে। জার্মান অফিসার তা দেখে ফেললে। কোনো কথা না বলে সে এগিয়ে গেল গৌচার-এর কাছে, পেছন থেকে তার মাথার খুলিতে গুলি মারলে। 'এ সমস্ত জার্মান সম্পত্তি। অনুমতি না নিয়ে কেউ ছোঁবে তোমরা এ সব, গুলি খাবে সোজাসুজি।'

"পথে পড়ল একটা গ্রাম। মেয়েরা আমাদের দেখেই জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল রুটির টুকরো, সেদ্ধ আলু। কেউ-কেউ কুড়িয়ে নিতে পারল, কেউ পারল না। রক্ষীরা জানলা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল, আমাদের বললে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে। কিন্তু ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে তারা কিছুতেই মানবেনা কোনো ভয়। রাস্তায় এসে আমাদের অনেক সামনে রুটি রেখে দিতে লাগল, না থেমেই আমরা তা কুড়িয়ে নিতে পারলাম। আমি পেলাম একটা বড় সেদ্ধ আলু, আমার পাশে যে লোক ছিল তার সঙ্গে খেলাম তা ভাগ করে। খোসাটাও বাদ দিলাম না, জীবনে অমন অপূর্ব জিনিস আর খাইনি কোনো দিন।

"সংরক্ষণের কাজ দেওয়া হয়েছিল আমাদের জঙ্গলের মধ্যে। পাহারা

আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোদাল পেলাম আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের জন্য কিছু তৈরি করার আমার ইচ্ছে ছিল না, আমার ইচ্ছে ছিল ওদের তৈরি-জিনিস ধ্বংস করা।

"সন্ধ্যায় আমি মন স্থির করে ফেললাম। বাঁ হাতে কোদাল নিয়ে এগোলাম গার্ডের দিকে। আর-আর জার্মানরা তখন দূরে ছিল, সেই গার্ড ছাড়া আর কেউ ছিলনা ধারে-কাছে।

" 'দেখ, আমার কোদালটা ভেঙে গিঁয়েছে।'—বললাম তার কাছে গিয়ে। মনে হল, সমস্ত সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করে প্রথম ঘায়েই যদি ওকে সাবাড় করতে না পারি, তা হলে আমার আর রক্ষা নেই। জার্মানটা আমার মুখে কি যেন দেখতে পেল, তাই সে তার কাঁধ থেকে টমি-গানটা খুলে নেবার জন্যে কাঁধের একটা দ্রুত ভঙ্গী করলে। আর তক্ষুনিই তার মুখের উপর মারলাম আমি কোদালের ঘা। সে হেলমেট প'রে ছিল বলে তার মাথার নাগাল পাইনি। তবু, হাতে আমার যেটুকু শক্তি ছিল তাতেই সে পড়ল মাটির উপরে, একটাও শব্দ না ক'রে···

"তারপর পেলাম একটা অটোম্যাটিক আর তিনটে কার্তুজের সেট। ছুটতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম ছোটবার শক্তি নেই। থামি, দম নিই, আবার ছুটি। পাহাড়ের ওদিকে জঙ্গল অনেক ঘন, তাই ছুটছি সেই জঙ্গলের দিকে। ক'বার পড়েছি, ক'বার উঠেছি তা কে জানে।···তবু ছুটছি, প্রতি মুহূর্তেই দূরে সরে আসছি ওদের থেকে।

"ঢুকে পড়েছি জঙ্গলের মধ্যে। এখন আমাকে ধরা আর ওদের সহজ হবেনা।

"এখুনি সন্ধ্যা আসবে ঘনিয়ে। কিন্তু যদি জার্মানরা আমার সন্ধান পায়, চলে আসে আমাকে ধরতে, আমার শেষ গুলি আমার নিজের জন্যে থাকবে। এই চিন্তাই আমার পায়ে চলার শক্তি এনে দিচ্ছে, আর তাই

অতি সাবধানে ও অতি আস্তে-আস্তে আমি হাঁটছি।

"সেই রাত আমার জঙ্গলেই কাটল। সামনেই একটা গ্রাম, কিন্তু এগুতে সাহস হলনা, পাছে জার্মানদের চোখে পড়ে যাই।

"পরদিন কয়েকজন গেরিলা আমাকে তুলে নিলে। ওদের ডাগ-আউটে হপ্তা দুই থেকে চাঙ্গা হয়ে নিলাম খানিকটা। প্রথম-প্রথম ওদের সন্দেহ ছিল, আমার পার্টি-কার্ড দেখান সত্ত্বেও। আমার কোটের লাইনিংএর সঙ্গে তা সেলাই করে রেখেছিলাম। কিন্তু পরে ওদের সঙ্গে যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যোগ দিলাম, তখনই ওদের মন খাঁটি হল। তখন থেকেই আমি হিসাব রাখতে লাগলাম, কতগুলি জার্মান আমি নিজে মেরেছি—যোগ করে দেখছি, প্রায় একশোর কাছে।

"জানুয়ারিতে গেরিলারা আমাকে যুদ্ধের সীমানার বাইরে চালান দিল। একমাস হাসপাতালে থাকলাম। আমার কাঁধ থেকে খুলে নেয়া হল বোমার কুচি—আর যা সব আমার ব্যাধি, যেমন বাত, যা আমি নিয়ে এসেছি ক্যাম্প থেকে, তাকে যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। হাসপাতাল থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল বাড়িতে, সেরে ওঠবার জন্যে। বাড়িতে এক সপ্তাহ ছিলাম। কিন্তু সেখানে মন টিকছিল না, যুদ্ধে যাবার জন্যে মন অস্থির হয়ে উঠছিল। এখানে, এই যুদ্ধক্ষেত্রেই আমার স্থান—মৃত্যু পর্যন্ত।"

পরিখার মুখে তাকে বিদায় দিলাম। রৌদ্রদীপ্ত বনের দিকে চেয়ে লেফটেনেণ্ট জেরাসিমফ বললে, "আমরা শিখেছি যুদ্ধের কৌশল—এক-দিকে প্রেম, অন্যদিকে ঘৃণা। যুদ্ধ হচ্ছে শান-পাথর, যেখানে ধার পায় আমাদের অনুভূতিগুলো। প্রেম আর ঘৃণা একসঙ্গে থাকতে পারেনা ভেবেছ? খুব পারে—শত্রুর প্রতি ঘৃণা আর আমার দেশের প্রতি প্রেম। সেই জন্যেই তো এত ভয়ংকর যুদ্ধ করছি, সেই জন্যেই তো জয়

আমাদের। আমার হৃদয়ে প্রেম, সঙিনের মুখে ঘৃণা।" জেরাসিমফ হাসল, জীবনে এই প্রথম তার হাসি দেখলাম, শিশুর নির্মল হাসি। আর এই প্রথম লক্ষ্য করলাম বত্রিশ বছর বয়সে কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা বহন করছে তার মুখ, আর যদিও তার শরীর ওক্-এর মতো বলিষ্ঠ তবু তার কানের পাশে চুল পেকে উঠেছে, রুপোলি আভায় জ্বলজ্বল করছে। তার দুঃখভোগের পবিত্রতার চিহ্ন সেই শুভ্রতা। যদিও জানি তার টুপির সঙ্গে মাকড়সার একটা সূক্ষ্ম উর্ণা জড়িয়ে আছে তার কানের পাশের চুলে, যত তীক্ষ্ণ চোখেই তাকাই না কেন, দেখতে পাচ্ছিনা সেই জালতন্তু।

এক্ পানশেরফ

খুকি টোনি

সবাই তাকে তাই বলে ডাকে—খুকি টোনি, যদিও আসলে তার বয়েস চব্বিশ, ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে। আর লম্বায়ও সে যেমনটি হবার তেমনি। কিন্তু কেন কে জানে, সবাই, কমিশার থেকে নগণ্য সৈন্য পর্যন্ত, আমরা পর্যন্ত—আমরা যারা নতুন এসেছি ফ্রণ্টে—ওকে ডাকি খুকি টোনি বলে। হয়তো ওর হাত দুখানি ছোট ও নম্র ব'লে—আর তার হাসি, সে তো শিশুর হাসি। কিম্বা, হয়তো সে খুব সরল, নিরাকাঙ্ক্ষ ভাবে ভালোবাসে সবাইকে, যেমন বড়দের ভালোবাসে শিশুরা। কেন যে ওর ডাক-নামটা লেগে আছে, কেউ বলতে পারে না। অথচ সে নিজে এমন কিছু খুকির মতো অসহায় নয়। যখন সে ফ্রণ্টে আসে তখন ততটুকুই তার জানা ছিল যতটুকু শিখে এসেছে সে মেডিক্যাল স্কুল থেকে। কিন্তু এখানে এসেই সে শিগগির লেকচারার হয়ে দাঁড়াল, সৈন্যদের কাছে সহজবোধ্য বক্তৃতা দিত, খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনাত, শেষে শিখল মোটর চালাতে। যা সে করত, নিপুণভাবে করত। কেন কে জানে, একটা জিনিস সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেনি, তা হচ্ছে, কি করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। মেজর শিলফ তাকে চামড়ার খাপে করে একটা ব্রাউনিং উপহার দিয়েছিল। "খুকি, তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও, সঙ্গে রেখো এটা সব সময়। বিপদে-আপদে কাজ দেবে।" চামড়ার খাপে সেই ব্রাউনিং তেমনি ঝুলছে দেয়ালে, তার বিছানার শিয়রে। প্রথম দিন ওটা সে খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে

পরীক্ষা করে দেখলে, এমন কি জিগগেসও করল কি করে ছুঁড়তে হয়, কিন্তু যেমন তাকে বলা হল, বাইরে গিয়ে ছোঁড়ো তো, তখন সে চোখ কুঁচকে বললে, "এখন না। অন্য সময়। বেমক্কা কাউকে মেরে ফেলব হয়তো।"

"মেরে ফেলবে? রাত্রে? বাইরে? কোনো বাদুড়-টাদুড় হয়তো।" সিনিয়র সার্জন। ইনোকেন্‌টি গাভ্‌রিলোভিচ বললে বিক্রমের স্বরে।

"হ্যাঁ, বাদুড়ই হল! আর সবাইর মতো ও-ও বাঁচতে চায়।"

"তুমি বোকা বনে যাচ্ছ। তুমি ফ্রণ্টে এসেছ আর একটা বাদুড় মারতে ভয় পাচ্ছ?"

"আমি তো বোকাই!" মাথা এক পাশে হেলিয়ে চোখ তেরছা করে ঠোঁট বেঁকিয়ে টোনি বললে, "আর তুমি? হেলমেট মাথায় দিয়ে যে খেতে বস, তুমি বোকা নও?"

"সাবধান থাকাতে ক্ষতি নেই।" রাগান্বিত হয়ে উত্তর করলে গাভ্‌রিলোভিচ। এ তার এক দুর্বলতা, কখনো সে হেলমেট ছাড়া থাকবে না। খাবার সময়, রাস্তায়, হাসপাতালে—সব সময়ে সেটা তার মাথায়, এমন কি, শোবার সময়ও তা আছে তার বালিশের পাশে।

"সাবধান থাকাতে ক্ষতি নেই।" সে বললে, দু'হাতে মুখ আড়াল করে, তার হাসি লুকোবার চেষ্টায়, "আমাকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছো। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি একদিন শোধ তুলতে পারব।"

আজকে গাভ্‌রিলোভিচ ঠিক করেছে সে দৃঢ় হবে।

গত পরশু জার্মানরা পাহাড়ের উপর থেকে রেড-ক্রশের কর্মচারীদের বাড়ি-ঘরের উপর বোমা ফেলেছে। দালানের ছাদের উপর প্রকাণ্ড একটা রেড-ক্রশ টাঙানো ছিল, দূর থেকে দেখা যায় অনায়াসে। জার্মানরা অবিশ্যি ইচ্ছে করেই ঐ দালান লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়েছে। কর্মচারীদের কয়েকজন মরেছে, কেউ-কেউ আহত হয়েছে। আজকে

ঠিক করা হয়েছে জার্মানদের তাড়িয়ে দিতে হবে সেই পাহাড়ের উপর থেকে।

"তার মানে হচ্ছে এই, খুকি টোনি ফ্রণ্টে যাবার জন্যে বায়না ধরবে। যে করে হোক থামাতে হবে তাকে। বরং আমি যাব, ও যেন না যায়। যাই হোক, আমি সিনিয়র সার্জন, আমি ওকে হুকুম করতে পারি থেকে যাবার জন্যে।" বলতে-বলতে গাবরিলোভিচ ঢুকল ব্যাণ্ডেজের ঘরে, আর সেখানেই খুকি টোনির কোয়ার্টার্স।

কোণে বসে কি করছে টোনি আর গুনগুনিয়ে গান গাইছে।

গাভ্রিলোভিচ কাশল। একবার মনে হল হেলমেটটা নামিয়ে নেয়, পরে কি ভেবে নামাল না। বরং না-নামানো থেকেই বেশি জোর দিয়ে বোঝানো হবে আজকের ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরালো, হয়তো বা বিপজ্জনক।

টোনি তাকাল তার কোণ থেকে।

"তুমি ইনোকেন্‌টি গাভ্রিলোভিচ!" চেঁচিয়ে উঠল সে, "খুলে ফেল। খুলে ফেল তোমার হেলমেট। যাই বল, এখন আর আমাদের উপর বোমা পড়ছে না।" বলেই সে এগিয়ে গেল, তার পরনে পুরো কিট্, কাঁধের উপর থেকে তার ফার্স্ট-এডএর ব্যাগ ঝোলান।

"ওকে যেতে বাধা দিতে এসে হয়তো ভালো করছিনা।" ভাবল গাভ্রিলোভিচ।

তার আগেই টোনি এগিয়ে গেল দরজার দিকে, যেন এখুনি সে বেরিয়ে পড়বে বাইরে।

"তোমার পিস্তল কোথায়?" গাভ্রিলোভিচ ধমকে উঠল, "না, তা হবে না। তোমার বেল্‌টের সঙ্গে বেঁধে নাও। বলছি, বেঁধে নাও।"

নিজেই সে বেঁধে দিল রিভলবার, বললে উদ্বিগ্ন স্বরে, "কাল কতগুলো আমাদের এম্বুলেন্সের লোক মারা গেছে জানো? বাড়ির মধ্যে যারা

মরেছে, শুধু তাদের কথা বলছিনা, বলছি ফ্রন্ট লাইনে যারা আছে, তাদের কথা। একবার ভেবে দেখতে চেষ্টা কর ঐ ঠগেরা শুধু মারবার জন্যে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাবতে পার তুমি? এরকম আর কোনো যুদ্ধে হয়নি। যুদ্ধ তো নয়, কে কত লোক মারতে পারে। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?"

"খুব বুঝতে পারছি। কিন্তু তবু আমায় যেতে হবে। আহতরা নিজেরা নিজেদের সরাবে এ কখনোই হতে দিতে পারিনা।"

গাভ্রিলোভিচ রুক্ষ স্বরে বললে, "তুমি না আজ তোমার মাকে চিঠি লিখছিলে? সাবধানে থাক আজ। নয়তো ঐ চিঠি তোমার আর শেষ হবেনা।" বলেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

গাভ্রিলোভিচ চলে যাবার পর টোনি একটা বইর থেকে তার মাকে-লেখা অর্ধ-সমাপ্ত একখানা চিঠি বার করলে।

"মা, এখানে সবাই আমাকে ভালোবাসে। আর তোমাকে বলছি···" আর সে লেখেনি। তখন, এক মুহূর্তের জন্যে, চিঠির উপর ঝুঁকে পড়ে সে তার বুড়ো মাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সবাই তাকে ডাকে মাসি গ্রুনিয়া বলে। মার ফটোগ্রাফ বার করে তার চুলের উপর কড়ে আঙুল বুলোতে বুলোতে সে বললে, নিজের মনে: "ডার্লিং! কানের পাশে তোমার চুলগুলি কেমন পেকে উঠেছে। আর কে জানে···না···না···" মন থেকে কুচিন্তা তখুনি সে বিতাড়িত করলে, আর মা তাকে কি ভাবে বিদায় দিয়েছে এই কথা মনে করে হাসল মনে-মনে। একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি সে, বরং গাড়িতে মেয়ে কি ভাবে আরামে যাবে তারই তদারক করেছে, আর থেকে থেকে টোনির মাথায় লাল ফিতেটা বসিয়ে দিয়েছে ঠিক করে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেই তার চোখে হু-হু করে জল এসেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ল টোনির। 'ডার্লিং মা।'

ফোটোগ্রাফটা লুকিয়ে ফেলে বেরিয়ে গেল সে।

পিচের মতো অন্ধকার, কালো, ঘন রাত, শিসের মতো ভারি। ফ্রন্ট-লাইনের পরিখা থেকে শোনা যায় বন্দুকের শব্দ। টৌনির কানের কাছ দিয়ে, মাথার উপর দিয়ে, ছুটে যায় গুলি-গোলা। যে কোনো মুহূর্তেই তার গায়ে লেগে যেতে পারে একটা। আগুন জ্বলে ওঠে থেকে-থেকে। সুবিস্তীর্ণ শূন্য আলোকিত হয়ে ওঠে। দ্রুত নীল বিদ্যুতে আকাশ প্রদ্দত, ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। তবু সেই মৃত্যুর সান্নিধ্যেও রাত্রিকালীন এই হাউই-বাজি দেখে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। পরিচিত রাস্তা ধরে সে পৌঁছুলো এসে মেজর শিলফের ডাগ-আউটে।

টেলিফোনে শিলফ তখন অনবরত হুকুম জারি করছে, খেয়ালই করতে পারেনি টৌনির আবির্ভাব। "ও তুমি, খুকি? ভালো। ঠিক সময়ে এসেছ।" তাকাল সে ঘড়ির দিকে। "কয়েক মিনিটের মধ্যেই আক্রমণ সুরু হবে। তুমি ওখানে যাও। একা যেওনা। একটা অডার্লি, য়াশাকে সঙ্গে নাও। ও আছে পরের ডাগ-আউটে। যাও, পালাও।"

য়াশা টৌনির চেয়েও ছোট।

দুজনে মিলে গেল যুনিয়ার-লেফটেনেণ্ট-য়ারট্‌সেফ-এর দলে। য়ারট্‌সেফ এমনিতে বেশি কথা বলে না, যখন বলে, কাঠখোট্টার মতো বলে, সবাইর কাছে রাষ্ট্র করে দিল, "খুকি টৌনি এসেছে।" সবাই উজ্জীবিত হয়ে উঠল, যেন পেল প্রফুল্ল প্রাণোচ্ছ্বাস। খুকি টৌনিকে কে না চেনে! কতবার সে তাদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছে, পড়ে শুনিয়েছে খবরের কাগজ।

ফ্ল্যাশ-ল্যাম্পে য়ারট্‌সেফ দেখল একবার তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। ঠিক বারোটা বেজেছে। টৌনিকে বললে মৃদুস্বরে, "এখানে থাকো। নাৎসি পরিখার ওখানে গিয়ে তোমার নাক দেখিও না। এখুনি আরম্ভ করবার হুকুম দেব।" তার পূর্ণ দীর্ঘতায় সে উঠে দাঁড়াল, উঠল চীৎকার করে: "আমাদের দেশের জন্যে, কমরেডরা, এগিয়ে যাও, ঝাঁপিয়ে পড়।"

সব্বাইর আগে সেই উঠে এসেছে পাহাড়ের উপরে, জার্মান ট্রেঞ্চের উদ্দেশে।

তীরের মতো ছুটে গেল পিছনকার লোক, একলক্ষ্য হয়ে। আগুনের আলোতে ঝকমকিয়ে উঠছে তাদের হাতের স্থির-সঙিন, আর তাদের জয়-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। গর্ত আর ঢিবি সমস্ত একাকার করে বিদ্যুন্ময় ঝড়ের প্রাবল্যে সৈন্যদল জার্মান পরিখার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সামনে যা পেল উড়িয়ে, পুড়িয়ে নিয়ে গেল সব।

যেখানে ছিল সেইখানেই খুকি টোনি দাঁড়িয়ে রইল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, দুই হাতে বুক চেপে ধরে।

"জখম হয়েছি।" য়াশা উঠল চেঁচিয়ে।

টোনি ছুটে গেল য়াশার কাছে। য়াশা তখন এক আহত লাল-সৈন্যের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আর বলছে আস্তে-আস্তে, "গর্ত-খোদল থেকে জার্মানদের যে ভাবে তোমরা তাড়িয়ে দিচ্ছ, সত্যিই খুব আশ্চর্য ব্যাপার। ভয়ঙ্কর আশ্চর্য।"

টোনি বাড়িয়ে দিল তার সেবার হাত। ছোট অথচ দৃঢ়, দ্রুত অথচ নিপুণ আর নম্র দুখানি হাতে পরিয়ে দিতে লাগল ব্যাণ্ডেজ।

প্রথম লাইনের গেরিলা ও ডাগ-আউট থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দিল য়ারটসেফ-এর বাহিনী, তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় লাইন।

সৈন্যদের হর্ষধ্বনি এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কেননা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে তারা। দলের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে টোনি আর য়াশা। তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত তারা, লক্ষ্যও করেনি কখন বনের প্রান্তে প্রভাতের পদার্পণ হয়েছে।

একটা ডাগ-আউটের সামনে একটা জার্মান মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

"ওকে ব্যাণ্ডেজ করে দাও।" টোনি বললে য়াশাকে। আর নিজে গেল

আহত এক লাল-সৈন্যের অভিমুখে। যন্ত্রণায় সেও আর্তনাদ করছে। বিচ্ছিন্ন গুলির আঘাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে কাছাকাছি কোনো পরিখার আশায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সে। খোলা জায়গায় যারা আহত হয় তারা এমনি ভাবে বাঁচবার চেষ্টা দেখে। টৌনি তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তার পা বেঁধে দিতে লাগল, গুলি ভেদ করে গিয়েছে তার পা। দম ফুরিয়ে আসছে এমনি দ্রুত কণ্ঠে বললে সেই সৈন্য, "আমার পা আমাকে ছেড়ে দাও, কমরেড ডাক্তার। পা না থাকলে আমি গেছি চিরকালের জন্যে। তোমার আর যা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু আমার পা নিয়ে যেও না। বুঝছ ?"

"খুব সোজা। বুঝছি বৈকি। সত্যি কথাই তো, পা না থাকলেই তো তুমি যাবে।" টৌনি উত্তর দিল। আর, উত্তর দিল কথায় তেমনি প্রাদেশিক টান রেখে।

তার নিজের প্রদেশের লোক, ভলগার কাছাকাছি! আনন্দে বিহ্বল হল সৈন্য, সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি, কথা বললে যেন কোন বহু-পরিচিতের সঙ্গে কথা বলছে, "তাই, তুমি আমাদের আপনার লোক। তুমি কথা বলছ, যেন আমার বোন মারুশিয়া কথা বলছে। সত্যি, আমাদের আপনার লোক তুমি।"

"সত্যি, তোমাদের ও-অঞ্চলেই আমার বাড়ি। যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন নিশ্চয়ই তোমাদের গ্রামে যাব বেড়াতে।"

সৈন্য তার মাথা দোলাল, তার শুভাগমনের আশায়।

আর ঠিক সেই সময়ে ঘটল যা কেউ আশা করেনি সেই মুহূর্তে। কাছেই একটা গর্ত থেকে বেরুল একটা জার্মান সৈন্য। গর্তটা গাছগাছালি দিয়ে ঢাকা, কেউই বোঝেনি সেটাকে লুকোনো গর্ত বলে। ছেঁড়া, ময়লা পোশাক পরনে, ঝাঁকড়া চুল, জার্মানটাকে প্রথম মনে হয়েছিল পাগল ব'লে। পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারলে সে একটা হাতবোমা।

ছুঁড়ে মারলে য়াশাকে লক্ষ্য ক'রে—যে য়াশা তখন আহত জার্মানের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। তারপর যা ঘটল টোনির মনে তা আগুনের রেখায় দাগা রয়েছে। য়াশার একটা বাহু উড়ে চলে গেল নিমেষে, যেন তা খড়ের তৈরি, খড় দিয়ে বাঁধা ছিল এতদিন। আহত জার্মানটা উত্থিত হল শূন্যে, আর পরের জার্মানটা আরেকটা হাত-বোমা ছুঁড়ে মারল টোনির অভিমুখে।

টোনি এগিয়ে এল লোকটার দিকে। সৈনিকের ভাষায় তীব্র গালি দিয়ে উঠল। টোনি দেখল জার্মানটা হঠাৎ দু'হাত তুলে মুখ ঢাকছে, হয়তো ধুলোর থেকে রেহাই পাবার জন্যে, আর তক্ষুনি পড়ে গেল মাটিতে। কোত্থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে এক লাল-সৈন্য, টোনির পিছন থেকে গুলি মেরেছে জার্মানটাকে।

"আ! মরে গেছে।" টোনির মনে আনন্দের বিদ্যুৎ জ্বলে উঠতে-না-উঠতেই কি-একটা হঠাৎ তার মাথার উপর এসে লাগল, আর একটা চড়ুই পাখির মতো চকিতে পড়ে গেল সে মাটির উপর। মনের গহন স্তর হতে ছবি ফুটে উঠল, "আমার বুড়ো মা, রূঢ় অথচ দয়ালু। ইনোকেন্‌টি গাভ্‌রিলোভিচ, আহত লাল-সৈন্য, অলিখিত চিঠি, বর্বর জার্মান..." তারপর সব অস্পষ্ট হয়ে এল আস্তে-আস্তে, আস্তে-আস্তে সে যেতে লাগল তলিয়ে।

মেজর শিলফ আর্তনাদ করে উঠল যখন দেখল খুকি টোনি পড়ে গেছে ছিটকে। ছুটে গিয়ে তাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলে আর যুদ্ধের মাঠ থেকে নিয়ে গেল দূরে।

"আহা বেচারা!" বললে সে মৃদুকণ্ঠে, "খুকু টোনি।"

কয়েকদিন পরে খুকি টোনির জ্ঞান ফিরে এল, আর আরো কিছুদিন পর ফিরে এল তার কথা কইবার ক্ষমতা। আজ সে হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে, যে-ওয়ার্ডে বহুবার সে আনাগোনা করেছে ডাক্তার হিসেবে,

তার মাকে লিখেছে চিঠি। জানলার কাছে সে শুয়েছিল। শীত এসে গেছে। বরফের প্রথম নরম কুচি পড়েছে মাটির উপর। বারে-বারে সেই বরফের দিকে তাকিয়ে সে লিখছে: "মা, এখানে সবাই আমাকে ভালোবাসে। প্রথম বরফ পড়েছে এখানে। সৈন্যরা ফ্রণ্ট থেকে ফুলের বদলে পাইন গাছের কয়েকটা ছোট-ছোট ডাল এনে দিয়েছে আমাকে। মা, কি সুন্দর ওদের গন্ধ···"

কাটা-কাটা কথায় ভরা চিঠি, কিন্তু সব ক'টি কথা সহজ, সরল, উষ্ণ হৃদয় থেকে উত্থিত—যেমন খুকি টৌনি নিজে।

ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেস্কা

শিশুরা

কার কথা লিখব? রোজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বীরত্বের কাহিনী লেখা হচ্ছে। খ্যাতির অগ্নিদীপ্ত পাখায় চড়ে প্রতিদিন বহু সামান্য সাধারণ লোক প্রাধান্যের চূড়ায় এসে উঠছে। বামন হয়ে উঠছে দৈত্য, বৃদ্ধা চাষানী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বীরাঙ্গনা। দেশে আর আমাদের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না চিত্তের মহত্ত্ব, বীরত্বের ও শৌর্যের পরিচয়। দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে সে সব কীর্তিকথা, কাগজে, রেডিয়োতে। কিন্তু এমন অনেক কাহিনী আছে যা রক্ত ও আগুনের অক্ষরে লেখা না হলেও, তাতে হাউইয়ের দীপ্তি না থাকলেও, তাতে আছে একই সেই সাহস আর আত্মত্যাগ, সেই গভীর দেশপ্রেম। দেশের সামান্য ধূলিকণার চেয়েও নিজের প্রাণ তুচ্ছ—আছে এই অনুভূতি।

বীরকাহিনীর ইতিহাস একটি পরিচ্ছেদ শিশুদের নিয়ে লেখা হবে।

এই বারো বছরের ছেলেটির নামের কোনো দরকার নেই। আর-আর অনেকের মতোই এ একজন। কিন্তু বিশেষ করে এই ছেলেটির কথা আমি লিখছি, কেননা এ একেবারে একজনের নিজের চোখে দেখা—একটি সরল ও মন-ভুলানো আখ্যান।

রাস্তার উপরে শোনা যাচ্ছে জার্মান ট্যাঙ্কের শব্দ। গ্রামের সীমান্তে যে কোনো মুহূর্তেই দেখা দেবে সেই ইস্পাত-দৈত্য। কাছেই বন, তার ঘন আবরণের অন্তরালে থেকে শত্রুদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করতে পারা যায় ইচ্ছা করলে।

পুরুষেরা ঢুকছে সেই বনে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, চলেছে ধুলোর মেঘ তুলে। আর তাদের পিছে-পিছে ছুটছে, ধুলোর মেঘের মধ্য থেকে অস্পষ্ট দেখা যায়, একটি বার বছরের ছেলে। সেও ঢুকছে সেই বনে, যেখানে দুঃসহ কষ্ট, যেখানে প্রতি বাঁকে মৃত্যু রয়েছে ওৎ পেতে, সেখানে থেকেও সে যুদ্ধ করবে, বয়স্কদের মতো আছে যেন তার সেই শক্তি, সেই সহিষ্ণুতা !

সে গেরিলা হবার উপযুক্ত নয়, ক্ষমতা নেই তার অস্ত্র বহন করবার—এই তিরস্কারে ছেলেটা কাঁদছে, আহত হয়েছে তার অহংকার। কিন্তু সে মনে-প্রাণে অনুভব করছে সে উপযুক্ত, আর-সবাইর পাশে দাঁড়িয়ে সেও অস্ত্র ধরতে পারে। আর-সবাইর মতোই সে হতে চায়। ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়া হয়। খালি পায়ে সেই ধুলোর রাস্তায় সে আর ছুটতে পারে না ঘোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে। তার স্বরে হতাশার ভাষা ফুটে ওঠে।

লোকটার দয়া হল শেষ পর্যন্ত। জিন থেকে নিচু হয়ে কি-একটা দিলে সেই ছেলের হাতে।

"নাও এই হাত-বোমাটা। গ্রামে ফিরে গিয়ে আঁট হয়ে বসে থাক। কিছু বিশেষ লক্ষ্য করলেই খবর দেবে আমাদের। চোখ-কান খাড়া রাখবে। যদি বিপদ বোঝ, ওদের পাইয়ে দিও এটার স্বাদ।"

ছেলেটার চোখের জল থেমে গেল তক্ষুনি। হাত-বোমার উপর তার কচি আঙুলকটি এঁটে বসল। হ্যাঁ, এখন সব ঠিক, তার মনের মতো হয়েছে। গেরিলাদের মতো তারও হাতে হাত-বোমা। আর, ওরা তাকে একটা কাজ দিয়েছে—যেমন কাজ করছে বড়রা।

সে তার জামার নিচে রেখে দেয় সেই হাত-বোমা, ফিরে যায় তার গাঁয়ের দিকে। আর তাকে যেমন বলা হয়েছে, সব কিছু সে হুঁসিয়ারের মতো লক্ষ্য করে। জার্মানরা এখনও সমস্ত ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝে

উঠতে পারেনি। সাবধানীর মতো গ্রামের প্রান্তেই থেমে আছে।

ছেলেটা তাকায় চারপাশে: রাস্তার পাশেই একটা কুঁড়ে ঘরে ষ্টাফ হেডকোয়ার্টার, দরজায় সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে, কতগুলি জার্মান কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তার বুকের মধ্যে বোমার ঠাণ্ডা ধাতব-স্পর্শটা সে অনুভব করে। তবু ছোট্ট হাত দিয়ে সে একটু ধরে দেখে, ওটা ওখানে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হারিয়ে যায়নি, আছে তার জামার নিচে। আর কুঁড়ে ঘরে, গ্রামের প্রান্তে, জার্মানদের স্টাফ হেডকোয়ার্টার, সেখানে ঘোরাঘুরি করছে জার্মান কর্মচারীরা।

মনে-মনে ঠিক করে, সিধে ঢুকে পড়বে কুঁড়ের মধ্যে, আগে থেকেই, যাতে ওরা না গ্রামে স্বুরু করতে পারে লুট, গৃহদাহ বা স্ত্রী-শিশুবধ। যাতে ওরা না স্বুরু করতে পারে পৃথিবীর উপরে নরকের কদর্যতা। তারপর যখন সে কর্কশ কণ্ঠে সান্ত্রীকে আহ্বান করে, তার গলা একটুও কাঁপেনা, চোখের পাতা চঞ্চল হয়না এতটুকু। হাতের ভঙ্গী করে বোঝায় যে হেডকোয়ার্টাসে সে একটা জরুরি খবর দিতে এসেছে, কর্মচারীদের সঙ্গে তার এখুনি দেখা হওয়া দরকার।

বেরিয়ে আসে একজন কর্মচারী। ভাঙা-ভাঙা ইউক্রেনিয়ান ভাষায় জিগগেস করে কি চায় সে। বালকের গলা কাঁপেনা একটুও। কর্মচারীর চোখের দিকে সোজা সে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, তাই, সে খবর দিতে এসেছে কোথায় লুকিয়ে আছে গেরিলারা।

তাকে ঢুকতে দেয়া হয় ভিতরে। টেবিলের চারদিকে ছ'জন কর্মচারী বসে আছে, মাথা ঝুঁকিয়ে বসে কি একটা মানচিত্র দেখছে আর আলোচনা করছে। মানচিত্রের থেকে চোখ তুলে তারা তাকায় বালকের দিকে।

হ্যাঁ, সে কিছু খবর নিয়ে এসেছে যা তাদের কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষণ সে সাবধানে দেখে নিচ্ছে চারদিক, ঘরের অবস্থাটা

পর্যবেক্ষণ করছে। ছ'জন কর্মচারী, কাঁধের উপর তাদের সামরিক মর্যাদার নিদর্শন। সন্দেহ নেই, তারা সব উঁচু দরের কর্মচারী।

তার জামার নিচে সে অনুভব করতে পারছে হাত-বোমার সেই ঠাণ্ডা স্পর্শ, আর তার চোখেও সেই শীতলতা। মনে-মনে সে হিসেব করে, কোথায় দাঁড়ানোটা ঠিক হবে, কি ভাবে করলে ব্যাপারটা সফল হবে পুরোপুরি। আস্তে-আস্তে নিরুত্তেজ কণ্ঠে বুদ্ধিমানের মতো সে জবাব দেয়। হ্যাঁ, অমুক আর তমুক—ওরা সব গ্রাম ছেড়ে গেরিলার দলে এসে যোগ দিয়েছে।

রুক্ষ স্বরে, অস্থির হয়ে কর্মচারীরা তাকে আরো প্রশ্ন করে। সে শান্ত, নিরাকুল কণ্ঠে উত্তর দেয়। তার চাষাড়ে ভঙ্গীতে সে একটা গল্প বানায়, খুঁটিনাটি বর্ণনা করে আর অমনি করে সময় নেয়, অবকাশ খোঁজে। বেশিক্ষণ সময় নেয়, যাতে ঘুণাক্ষরেও ওদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত না হয়।

শেষকালে প্রধান কর্মচারী—যে মাঝখানে বসে আছে—হাত নেড়ে বোঝায়, এতেই হবে। সে জানে, জেনেছে এতদিনে, যে তারা সব গেরিলা হয়েছে এবং কি ভাবে হয়েছে, কিন্তু আসল কথাটাই জানতে বাকি : কোথায় তারা?

বালক এগিয়ে আসে এক পা। এখন সে একেবারে টেবিলের কাছে—ছ' জনের মুখোমুখি। শান্ত অথচ বালক-অসুলভ কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে : "গেরিলারা সবখানে।"

বলেই বিদ্যুৎগতিতে সে তার জামার তলা থেকে হাত-বোমাটা বার করে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। লাফিয়ে খাড়া হয়ে ওঠবার আগেই, আর্তনাদ করে ওঠবার আগেই, কি ঘটছে তা উপলব্ধি করবার আগেই—ওরা মৃত্যুতে কাটা পড়ে।

আর সেই সঙ্গে বারো বছরের সেই বালক। এক জনের বিনিময়ে

ছ'জন। মৃত্যুতে তার মুখ কাঠিন্যে রেখায়িত হয়ে ওঠে, ঠিক বয়স্ক মুখের মতো। তার ম্লান কপালে বীরত্বের দীপ্তি।

কোনো কবরই তাকে বন্দী করে রাখতে পারবে না। তার আত্মা জ্বলন্ত খড়্গের মতো সোনার শিখায় জ্বলবে ইউক্রেনের গ্রামে-গ্রামে, ডাকবে প্রতিশোধের জন্যে।

তাই এই বালকের নামের কোনো দরকার নেই। মাঠে যখন ও খেলা করত, তখন ওর মা ওকে কি নাম ধরে ডাকত, কি হবে তা শুনে? এমনি তার মতো আছে শত-শত—দুর্দাম, সাহসী শিশু—যারা বয়স্কদের মতোই জানে, বোঝে আর ভালোবাসে, যারা বয়স্কদের মতোই সগৌরবে মরতে পারে।

চন্দ্রালোকিত রাত, আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি, সুগন্ধি, সুকোমল ইউক্রেনিয়ান রাত। একটা মোটর ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। বনের ওপারে দিগন্ত রক্তবর্ণ, আগুনের ছায়া পড়েছে স্বচ্ছ মেঘের উপর। পরিখার মধ্যে পড়ে আছে একটা ভাঙা লরি, আকাশে লাল আলো, দূরে বন্দুকের গর্জন, সব মিলিয়ে মনে হয় এ গন্ধময় গৌরবময় রাত আগেকার পরিচিত রাত নয়, থাক চাঁদ, থাক ফুল, থাক বিহ্বল-মদির প্রকৃতি—এই রাত রক্তের আর আতঙ্কের রাত।

প্রকাণ্ড কালো একটা মোটর ছুটে আসছে রাস্তা দিয়ে। ঘাসের উপর শিশির বিন্দু রূপোর কণার মতো চিকচিক করছে। রাস্তাটা যেন এক পাত জ্বলন্ত রূপো, হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে কালো গহন অরণ্যে।

আর, এইখানে, বনের ধারে, একটা স্বর হঠাৎ ফুটে ওঠে। গড়খাই থেকে লাফিয়ে ওঠে দুজন। তাদের বয়স পনেরোর বেশি নয়, বন্দুক হাতে দুটি গ্রাম্য বালক।

গাড়ি ঢিমিয়ে আসে। সাবধানে, বন্দুক সজুত রেখে ছেলে দুটো এগিয়ে

আসে গাড়ির দিকে। চাঁদের আলোকে দেখতে পাচ্ছি কাঁপছে তাদের হাতের বন্দুক। তবু খুব হুঁসিয়ার হয়ে তারা এগোয়, চরমতম মুহূর্তের জন্যে তারা প্রস্তুত।

ভাবো একবার সেই দৃশ্য—গভীর রাতে, আগুন-লাগা আকাশ, অবিশ্রান্ত একঘেয়ে বন্দুকের গর্জন, দুর্ভেদ্য অন্ধকার বন, জনহীন বিস্তীর্ণ পথ আর সেই পথের উপর প্রকাণ্ড একটা কালো গাড়ি। ভিতরে যে কে ব'সে তারা কিছুই জানে না, বলতে পারে না। হতে পারে এক ডজন সসজ্জ সশস্ত্র শত্রু সেই গাড়ির আরোহী। কে জানে কে আছে গাড়ির মধ্যে। হয়তো শত্রু পক্ষের স্কাউট, শত্রু পক্ষের গুপ্তচর, হয়তো খোদ জার্মান কর্মচারীরা।

কিন্তু এই দুটি বালক তাদের বনের আচ্ছাদন-আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসে অজানার মুখোমুখি হবার জন্যে। তাদের বয়স পনেরো বছরের বেশি নয়।

"থামো!"

গাড়ি থেমে পড়ে। আমরা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিই, চামড়ার থলের মধ্যে রিভলভার পুরে রাখি।

"তোমাদের পাশ দেখাও।"

কচি গলা কঠিন সুরে বেজে ওঠে। আমরা আমাদের পাশ দেখাই। ওদের মধ্যের একজন চাঁদের আলোয় সেটাকে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে, ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। পাশ ফিরিয়ে দেয়, ওদের মুখে আরামের আভাস জাগে। এখন ওরা শান্ত ভাবে কথা বলতে পারছে। আর ওদের হাত কাঁপছে না। হ্যাঁ, তারা পাহারায় আছে। এই বন পার হলেই তাদের গ্রাম। ওদেরকে বলা হয়েছে এই রাস্তা পাহারা দেবার জন্যে। যা কিছু ঘটতে পারে, যে কোনো সময়।

আমরা চলে যাই, আর সেই দুটি পনেরো বছর বয়সের ছেলে সেই

জঙ্গলের ধারে পড়ে থাকে, হাতে তাদের বন্দুক, তারা তাদের গ্রামের রাস্তায় তদারকি করছে। রাস্তার উপর কিছু এসে পড়লেই গড়খাই থেকে লাফিয়ে উঠছে তারা। এই পত্রমর্মরিত মায়াময় জ্যোৎস্না রাতে ঐ দুটি ছোট ছেলে তাকায় লাল আকাশের দিকে, শোনে দূরে বন্দুকের গর্জন আর তাদের কাঁধে বহন করে এই পথরক্ষার, এই পথরোধের দায়িত্ব। তাদের নার্ভ আঁট, তাদের প্রতিজ্ঞা অনমনীয়। ভয় যখন তোমার বুকের কাছে ধুকধুক করছে না তখন বীর সাজা খুব সহজ। কিন্তু এই দুটি বীরপুত্র তাদের শিশুসুলভ ভয় দমন করেছে, রাত্রির ভয়, যুদ্ধের ভয়, অজানা-অচেনার ভয়। আর, যদিও এদের হাত কাঁপে, তবু ওরা বুক পেতে বিপদ বরণ করবার জন্যে এগিয়ে যায়। যখন তারা গড়খাই থেকে লাফিয়ে উঠেছিল তখন তারা নিশ্চয়ই জানত যে সত্যিসত্যি তারা বিপদেরই সম্মুখীন হচ্ছে।

পনেরো বছরের দুটি ছেলে। কত শত তারা—কাল ও আজ, পাহারা দিচ্ছে জঙ্গল, আর রাস্তা, গ্রামের আনাচ-কানাচে। যুদ্ধে যারা গেছে সেই সব বয়স্ক পুরুষের জায়গায় এরা দাঁড়িয়েছে আর "থামো" বলার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি খেয়েছে বুকের মধ্যে। কে আমাকে তাদের নাম বলবে, তাদের সব্বাইর নাম, তাদের গ্রামের নাম, যে সব গ্রামে তারা বাস করত, সে সব গ্রামে তারা আর বড় হতে, যৌবনে উপনীত হতে পাবেনা।

অগণন তাদের নাম। আমাদের ছেলেরা, বীর সোভিয়েট শিশুরা বয়স্কদের সাহস ও বুদ্ধি নিয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করছে। ওদের রক্তও স্বাধীনতার আনন্দে জ্বলছে। ওদের কাছেও দেশ কথাটা একটা স্থাবর পদার্থ নয়, দেশ জীবনের সামিল, তাদের হৃদয়ের স্পন্দন, রণসজ্জা, অসীম অনন্ত প্রেম।

আর যে ভাবে এরা যুদ্ধ করছে এতেই প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের

উদ্দেশ্যের সত্যতা।

নিজের বুকের রক্ত দিয়ে শিশুরা তাদের ঋণ শোধ করছে—যে-দেশ দিয়েছে তাদেরকে জীবনের সূর্যালোক, তাদের আনন্দ শৈশব। আর যে সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ছেলেরা তাদের রক্ত ঢালছে, আমাদের সত্য উদ্দেশ্যের জন্যে, তাতে ইতিহাসের পাল্লা একদিন আমাদের দিকেই ঝুঁকবে।

সমাপ্ত